মহাকাব্যে মহীয়সী

রামায়ণ ও মহাভারতের মহীয়সী নারীচরিত্রসমূহের

অন্তরঙ্গ ও অশ্রুতপূর্ব জীবনকাহিনী

[২ খণ্ড একত্রে]

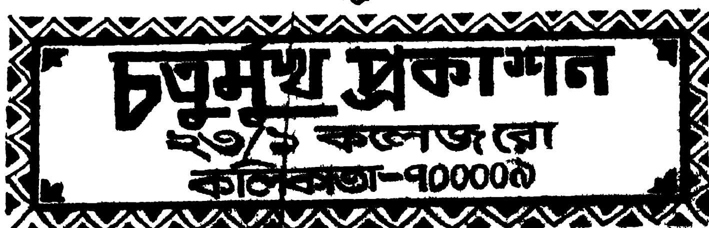
'রামায়ণ' খণ্ডের রূপকার

অধ্যাপক ডঃ মিলন দ

'মহাভারত' খণ্ডের রূপকার

সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী





প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী
চতুর্মুখ প্রকাশন
২৩/১, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী
১৭ই ভাদ্র, ১৩৫৯

প্রচ্ছদ : বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের প্রকাশনের সশ্রদ্ধ নিবেদন 'মহাকাব্যে মহীয়সী' মহাগ্রন্থের প্রকাশ উপলক্ষে গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা ও সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

রামায়ণ ও মহাভারত : 'এই দুই জাতীয় মহাকাব্য ভারতের প্রাণ-সম্পদ। হাজার হাজার বছর ধরে এই দুই মহাকাব্য ভারতের জীবন-ধারাকে ধরে রেখেছে মহান আদর্শের পরিমণ্ডলে। রামায়ণ অসামান্য গার্হস্থ্য জীবন কাব্য যার মধ্যে আছে গার্হস্থ্য জীবনের বিচিত্র বৃত্তি-সমূহ, অনুপম বাৎসল্য, অসামান্য পতিভক্তি, আশ্চর্য ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি। অপর পক্ষে মহাভারত হল বৃহত্তর জীবন পরিবেশের কাব্য যা শিক্ষা দিয়েছে বৃহত্তর জীবনাদর্শ—ত্যাগ, বৈরাগ্য, মুক্তি প্রভৃতি। এই সকল আদর্শ রূপায়িত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের মহীয়সী নারী-সমাজের মাধ্যমে যাদের কথা আমরা তুলে ধরেছি আমাদের গ্রন্থে।

আধুনিক যুগে নারী সমাজের জীবন জটিল সমস্যায় ভারাক্রান্ত। আমরা আশা করি, আমাদের এ গ্রন্থে বর্ণিত নারীবৃন্দের জীবন কাহিনী তাদের কাছে হবে এক নতুন জীবনবেদ। এ যুগের নারী সমাজ এই গ্রন্থেই খুঁজে পাবেন তাদের অভ্রান্ত পথনির্দেশ ও জীবনসমস্যার সমাধান। তারা জানতে পারবেন, রামায়ণ ও মহাভারতের মহীয়সী নারীসমাজ কর্মে, কর্তব্যে, চিন্তায়, মানসিকতায়, প্রেমে, সাহসিকতায়, সহৃদয়তায় ও সংবেদনশীলতায় ছিলেন কতখানি অগ্রগণ্য ও আধুনিক। মুখ্যত এযুগের সমস্যাপীড়িত নারীসমাজের কথা মনে রেখেই আমাদের এই বলিষ্ঠ প্রকাশ।

রামায়ণ ও মহাভারতের শেষ পর্যায়ের কাহিনীগুলি কিছুটা সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হয়েছি গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার কারণে। আমাদের সীমিত সাধ্যে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করবার উপায় ছিল না। এ জন্য সকলের কাছেই আমরা বিনীত মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। পরবর্তী সংস্করণে এ ত্রুটি সংশোধিত হবে আশা রাখি। পাঠক পাঠিকার সন্তোষ ও সমাদর আমাদের কাম্য।

বিনীত
—প্রকাশক

সূচীপত্র

১ম খণ্ড : রামায়ণ

২য় খণ্ড : মহাভারত

অনন্যা জননী অঞ্জনা

—বলো, কি তোমার অভিযোগ ? আমি সাধ্যমত বিচার করব।

—মহারাজ, অভিযোগ করতেই আমি এসেছি। কিন্তু মনে সংশয়, ন্যায়বিচার আমি পাবো কিনা ?

—কি বললে ? রাজা খণ্ডকের মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে, সূর্য-বংশীয় রাজা খণ্ডকের নিকট তুমি ন্যায়বিচার পাওয়া সম্পর্কে সংশয় পোষণ করছ ! তোমার স্পর্ধা তো কম নয়।

—অপরাধ নেবেন না মহারাজ, আমি আপনার দীনতম প্রজা সুভদ্র, আপনার চরণাশ্রিত—বড় মনঃক্ষোভে আপনার নিকট বিচারপ্রার্থী হয়ে এসেছি—আপনার ন্যায়বিচারের খ্যাতি সুবিদিত—তবু—

সুভদ্র কথা শেষ না করে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

—'তবু' কি ? বলো শীঘ্র। রাজা খণ্ডক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলেন।

প্রজা সুভদ্র নীরব। চোখের দৃষ্টিতে অসহায়তা।

মহামন্ত্রী বলেন, সুভদ্র, তুমি নির্ভয়ে তোমার অভিযোগ জানাও।

—কার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ ? খণ্ডক গম্ভীর স্বরে বললেন।

—আপনার পুত্রের বিরুদ্ধে। সুভদ্র ভীত বিনীত কণ্ঠে বলল।

—এইজন্য এতক্ষণ তুমি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলে ! খণ্ডক এবার অট্টহাসি হেসে ওঠেন, যতক্ষণ আমি এই সূর্যবংশের পবিত্র রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট, ততক্ষণ আমার কাছে পুত্রে প্রজায় কোন প্রভেদ নেই। বলো কি তোমার অভিযোগ ?

—মহারাজ, আমার বক্তব্য একান্তে নিবেদন করতে চাই। ভদ্রক করজোড়ে কম্পিতকণ্ঠে বলল, আমার অভিযোগ আমি গোপন রাখতে চাই।

—কোন প্রয়োজন নেই। তুমি এই রাজসভায় সর্বসমক্ষে তোমার অভিযোগ জানাও।

ভদ্রক এবার প্রকৃতই ভীত হল। এই প্রকাশ্য রাজসভায়-চারধারে গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশে রাজপুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো—আর সে অভিযোগও বড় গুরুতর—এর সঙ্গে জড়িত আছে রাজবংশের মান সম্মান—তার থেকে অভিযোগ না জানানোই শ্রেয় —ক্ষতি তার যা হবার তা তো হয়েই গেছে—তাই সে করজোড়ে বলল, মহারাজ, আমি অভিযোগ জ্ঞাপন করব না স্থির করেছি।

—মূর্খ! গর্জন করে উঠলেন রাজা খণ্ডক, অযোধ্যার রাজসভা বাচালতার স্থান নয়। এখানে অভিযোগ জ্ঞাপন করতে এসে অভিযোগ জ্ঞাপন না করে জীবিত ফেরা যায় না।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ এবার বললেন—সুভদ্র তুমি বৃথা কালক্ষেপণ করছো। আমাদের সময়ের মূল্য আছে। তোমার অভিযোগ জ্ঞাপন করো।

সমস্ত রাজসভা নিস্তব্ধ। সবার দৃষ্টি সুভদ্রের পানে।

সুভদ্র কম্পিত কণ্ঠে বলল—মহারাজ, আমার পত্নী মায়াবতী আজ প্রভাতে সরোবর থেকে পানীয় জল নিয়ে গৃহে ফিরে আসছিল। রাজপুত্র দণ্ডক সে সময় রথে নগর পরিভ্রমণ করছিলেন। আমার পত্নীর দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র তাকে রথে তুলে নিয়ে চলে গেছেন। এখন পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাইনি।

—রাজপুত্র দণ্ডকই যে তোমার পত্নীর অপহারক, সে কথা তুমি কিরূপে জানতে পারলে? মহামন্ত্রী এবার জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার পত্নীর সঙ্গে অন্যান্য সহচরী ছিল। তারাই আমাকে এ সংবাদ দিয়েছে।

—তোমার এ অভিযোগের আমি প্রতিকার করবো সুভদ্র, রাজা খণ্ডক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, রাজপুত্র দণ্ডক পাবে কঠোর দণ্ড। তোমার হতভাগিনী পত্নীর আমি সন্ধান করছি।

—সন্ধান করে আর কি হবে মহারাজ? ও পত্নী আমার নিকট মৃত। ধর্ষিতা কুলবধূকে গৃহে ফিরিয়ে নেওয়া সামাজিক অপরাধ।

মহামন্ত্রী বললেন, সুভদ্র, তোমার যে ক্ষতি হয়েছে, তা যথাসাধ্য পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি। তুমি এবার গৃহে ফিরে যাও। রাজসভা সমাপ্তির সময় সমাগত।

রাজা খণ্ডক উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আগামী কল্য এই প্রকাশ্য রাজসভায় সর্বসমক্ষে রাজপুত্র দণ্ডকের বিচার হবে।

ঘোষণা করে রাজা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

অন্যদিন প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশকালে প্রতিহারীদের প্রণামের উত্তরে মৃদু হাসেন। আজ মুখে হাসি নেই। গম্ভীর মুখ, ললাটে কুঞ্চন রেখা।

মহারাণী কক্ষের দ্বারে দাঁড়িয়েছিলেন। রাজার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ দেখে শঙ্কিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে আর্যপুত্র?

রাজা খণ্ডক সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন—রাজপুত্র দণ্ডক কোথায়?

—কি হয়েছে মহারাজ?

—কি হয়নি তাই বলো! খণ্ডক ক্রোধে ফেটে পড়লেন, তোমার পুত্রের নামে নিত্য নানা অভিযোগ, আর সে অভিযোগ সবই নারীহরণ সংক্রান্ত। রাজবংশীয় পুরুষের নারীহরণে দোষ নেই, কিন্তু প্রজার কুলবধূহরণ—এতো ভয়ংকর অপরাধ।

—এ সবই আমার ভাগ্যের নির্বন্ধ মহারাজ। মহারানী ললাটে করাঘাত করেন, না হলে পঞ্চদশ ষোড়শ বছরের বালক এমন নারী-লোভী হবে কেন?

—দণ্ডক যে অপরাধ করে চলেছে, তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

—না—না—তুমি ওকে মৃত্যুদণ্ড দিও না রাজা, মহারানী কেঁদে ফেললেন, পুত্রের মৃত্যুদণ্ড দিলে আমারও সেইসঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দাও!

—অন্ধ মাতৃস্নেহ !

—মাতা তো চিরদিনই স্নেহে অন্ধ মহারাজ ! স্নেহের কাছে কোন যুক্তি নেই, কোন বিচার নেই। তুমি আমারও মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা কর।

মহারানীর চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মহারানীর ক্রন্দনে রাজা খণ্ডক বিচলিত হলেন। তাঁর সামনে এ এক কঠিন সমস্যা ! ন্যায়বিচার করতে হলে পুত্রকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। কিন্তু তারপর রানীও সুনিশ্চিত আত্মঘাতী হবেন।

মহারানীর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে বললেন—মহারানী, তুমি ক্রন্দন করো না। রাজপুত্র দণ্ডকের দণ্ডবিধান আমাকে করতেই হবে। তবে মৃত্যুদণ্ড নয়, তাকে আমি নির্বাসন দণ্ড দেব। আমার রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে যে বিশাল অরণ্য অঞ্চল আছে, সেখানেই তার বাসস্থান নির্দিষ্ট হবে, সঙ্গে তার কিছু অনুচর থাকবে। জীবিত যখন থাকবে, তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনাও থাকবে। আমি আগামীকল্যই দণ্ডকের বিচার করব।

* * *

পরদিন অযোধ্যার রাজসভা জনাকীর্ণ। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ অমাত্যবৃন্দ সাধারণ মানুষের সমাবেশে তিল ধারণের স্থান নেই।

রাজা খণ্ডক রাজদণ্ড হাতে সিংহাসনে বসে আছেন।

তাঁর ইঙ্গিতে প্রতিহারীর দল রাজপুত্র দণ্ডককে সঙ্গে করে রাজসভায় প্রবেশ করল।

পঞ্চদশ ষোড়শ বছরের কিশোর। কিন্তু দেখলে মনে হয়, বিংশ বছর বয়স্ক যুবক। বলিষ্ঠ কান্তিময় আকৃতি। সকল অঙ্গে রাজলক্ষণ। কিন্তু মুখমণ্ডলে রুক্ষতার ও ভোগাচারের কলংক চিহ্ন। রাজ্যের মানুষ রাজপুত্রের অদ্ভুত ভোগাচারের কথা জানে।

রাজা খণ্ডক জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, রাজপুত্র দণ্ডক, আমার প্রজা

সুভদ্র তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছে—তুমি তার পত্নীকে অপহরণ করেছো। এ অভিযোগ সত্য?

—হ্যাঁ, সত্য। দণ্ডক বেপরোয়া ভঙ্গীতে জবাব দিল।

রাজসভার সকল মানুষ রাজপুত্রের এ বেপরোয়া উত্তর শুনে স্তব্ধ।

—সুভদ্রের পত্নী এখন কোথায়?

—ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই তো রীতি মহারাজ।

রাজপুত্রের এ নির্লজ্জ জবাবে রাজসভা শিহরিত।

—শোন দণ্ডক, তুমি যে অপরাধ করেছ, তার জন্য তোমাকে আমি চির নির্বাসন দণ্ড দিলাম। এ রাজ্যের প্রত্যন্তপ্রদেশে সুবিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল আজ থেকে তোমার বাসভূমি।

দণ্ড ঘোষণা করে রাজা সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, তুমি আজই রাজপুত্রকে অরণ্য সকলে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা কর।

* * *

দণ্ডক এখন অরণ্যঅঞ্চলের অধিবাসী। সুবিস্তীর্ণ আরণ্যক ভূমি। দু' পাশ দিয়ে গোদাবরী ও নর্মদা নদী প্রবাহিত। অরণ্যে মুনি ঋষি ও দানব দৈত্য রাক্ষসদের বসবাস।

দণ্ডক করিৎকর্মা যুবক। সম্ভোগে যেরূপ আগ্রহী, কর্মেও সেরূপ উৎসাহী। কিছুকালের মধ্যেই সে অরণ্য অঞ্চলের মধ্যে বন্য অধিবাসীদের রাজপদ অধিকার করে বসল। অরণ্য অঞ্চলে সে হল দণ্ডক রাজা।

তার নামে সে অরণ্য অঞ্চলের নাম হল দণ্ডকারণ্য।

দণ্ডকারণ্যের রাজা দণ্ডক।

দৈত্য দানব রাক্ষসদের সে হত্যা করল। মুনি ঋষিরা খুব সন্তুষ্ট। এই সব দৈত্য দানব রাক্ষসরা তাঁদের যাগযজ্ঞ ধ্বংস করত, সুযোগ পেলেই তপোবনে এসে উৎপাত করত। এখন নির্বিঘ্নে বসবাস করা যাবে। দণ্ডকারণ্যের মুনি ঋষিরা রাজা দণ্ডকের প্রসংশায় পঞ্চমুখ।

দণ্ডকারণ্যের সর্বজনমান্য মহাতেজস্বী মুনি হলেন শুক্র। বিশাল তাঁর

তপোবন। দণ্ডকারণ্যের ঋষিকুলের উপর তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি বহুবিস্তৃত।

মানুষের মতিগতি বোঝা ভার।

রাজা দণ্ডকের কি খেয়াল হল, চলে গেল একদিন শুক্রের তপোবনে।

—মহামুনি শুক্র, আমাকে আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আমি আপনার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে চাই।

—উত্তম প্রস্তাব। শুক্র হেসে বললেন, তুমি আগামী কল্য থেকে নিয়মিতভাবে তপোবনে এসো। তোমাকে আমি শাস্ত্র শিক্ষা দান করব।

* * *

রাজা দণ্ডক পর দিন থেকে নির্দিষ্ট সময়ে তপোবনে এসে শুক্রের কাছে শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে লাগল। কিন্তু কিছুদিনেই হয়ে উঠল ক্লান্ত। চঞ্চলমতি যুবকের নীরস শাস্ত্রালোচনা ভালো লাগবে কেন?

কিছুকাল পরেই সে স্থির করে ফেলল, তপোবনে আর সে আসবে না। শাস্ত্র অধ্যয়নের এখানেই হোক ইতি।

তখন অপরাহ্নের সূর্যের স্নিগ্ধ আলোকধারা ছড়িয়ে পড়েছে তপোবনের গাছ-গাছালির উপর। পাখ-পাখালির কলকাকলি ভেসে আসছে দূর থেকে। দ্রুতপদক্ষেপে একটা বিশাল বটবৃক্ষের তল দিয়ে যাবার সময় দণ্ডক হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; তাকিয়ে রইল অপলক চোখে।

সুশ্রী যুবতী মাটির উপর বসে পরম মমতায় একটা পক্ষীশাবককে জল পান করাচ্ছে হাতের জলপাত্র থেকে। জল ঢেলে দিচ্ছে চঞ্চুর মধ্যে। যুবতীর বেশভূষা ও আকৃতি দেখে মনে হয় মুনিকন্যা।

দণ্ডক সেই সময় আর একটা দৃশ্য থেকে চমৎকৃত। আশপাশ থেকে আরও অনেক পক্ষীশাবক এসে মুনিকন্যার হাতে মাথায় কাঁধে বসছে জল পানের জন্য। মনে হল যেন স্বয়ং অরণ্যদেবী তাঁর সন্তানদের নিয়ে বসে আছেন। দণ্ডক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মুনিকন্যার

পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। কাছ থেকে মুনিকন্যাকে দেখে সে রীতিমতো বিমুগ্ধ। মুনিকন্যার দেহসৌষ্ঠব অপূর্ব। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুগৌর দেহ। যেন সুদক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা সুন্দর প্রতিমা।

মানুষের অস্তিত্বের বোধ হয় একটা গন্ধ থাকে।

দণ্ডক এসে দাঁড়ানো মাত্র যুবতী পিছন পানে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখে বিস্মিত দৃষ্টি। হয়তো বা কিছুটা ভয়ও।

দণ্ডক বুঝতে পেরে একটু পিছিয়ে গেল। ঠোঁটের কোণে মৃদু-হাসির রেখা।

—আমি দণ্ডক। এই অরণ্যের অধিবাসীরা আমাকে দণ্ডকরাজা বলে।

—জানি, যুবতী মৃদুহেসে বলে, আপনি আমার পিতার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন।

—তুমি মহামুনি শুক্রের কন্যা? তোমার নাম কি?

—হ্যাঁ, আমি শুক্রকন্যা অজা।

—তোমাকে তো এতদিন দেখিনি।

—আমাকে আপনি দেখবেন কিরূপে? অজা হেসে বলে, আমি থাকি তপোবনের অন্দরমহলে—সেখানে পুরুষের দৃষ্টি পৌছোতে পারে না। আমি কিন্তু সেখান থেকেই আপনাকে দেখেছি।

—দেখে কি মনে হয়েছে? দণ্ডক হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল।

মনে হয়েছে দণ্ডকারণ্যের দণ্ডক রাজা তপোবনের শাস্ত্রালোচনার আসরে নিতান্ত বেমানান।

—তুমি বুদ্ধিমতী—ঠিকই ধরেছ। শাস্ত্রালোচনায় আমি ইতিমধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আজই এই পর্বে ইতি টেনে দেবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু—

—কিন্তু কি? অজার চোখে বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

—কিন্তু তোমাকে দেখবার পর সে সংকল্পেও ইতি টেনেছি। তোমাকে দেখবার জন্যই আমি তপোবনে আসব।

অজ্জার মুখে লজ্জার রক্তিমা ফুটে উঠল। কয়েকটি পক্ষীশাবক ইতিমধ্যে অধীর হয়ে অজ্জার হাতে মৃদু মৃদু আঘাত করছিল। অজ্জা তাদের একটিকে ধরে দণ্ডকের দিকে তাকিয়ে বলল, এরা পিপাসায় খুব কাতর হয়ে পড়েছে। আমি এদের জল পান করাই।

—আমি ওদের থেকেও বেশী পিপাসিত।

দণ্ডক রাজা হাসতে হাসতে তপোবনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

অজ্জা চকিতে ঘুরে তাকিয়ে রইল দণ্ডকের চলে যাওয়ার পানে। এই বলিষ্ঠ প্রাণচঞ্চল যুবক মুহূর্তের মধ্যে যেন সব এলোমেলো করে দিয়ে গেল। যেন একটা ঝড়ো হাওয়া। পিতার মুখে সে শুনেছে এই যুবকের কিছু কিছু কীর্তিকাহিনী। অযোধ্যার রাজপুত্র, কিন্তু অনাচারের অপরাধে রাজ্য থেকে নির্বাসিত এই অরণ্যে। তাতে কিন্তু কোন ক্ষোভ নেই। নিজের পৌরুষ ও শক্তি দিয়ে গড়ে তুলেছে এই দণ্ডকারণ্য। দৈত্য দানব রাক্ষসকুল নির্মূল করে মুনিঋষিদের তপস্যার পথ সুগম করেছে। একে যেন সভ্যসুন্দর নগরে মানায় না। এ হল অরণ্যভূমির অরণ্যরাজ। অন্দরমহলের গবাক্ষ দিয়ে প্রথম দিন এঁকে দেখার পর থেকেই অজ্জা যেন কিছুটা বিবশ।

* * *

শাস্ত্রালোচনায় ছেদ টেনে দেবার কথা ভেবেছিল দণ্ডক। কিন্তু অজ্জাকে দেখবার পর দ্বিগুণ উৎসাহে সে আবার তপোবনে যাতায়াত শুরু করল। শুক্রমুনির শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনে, কিন্তু তার চোখ আর মন থাকে অন্যত্র। কোথাও যদি অজ্জার দেখা পাওয়া যায়। কোথাও কোন গবাক্ষে চকিত বিদ্যুৎ রেখা!

কিন্তু না। কোথাও অজ্জা নেই। কোন গবাক্ষে একটি সুশ্রী সুন্দর মুখের ছবি ফুটে ওঠে না। অন্দরমহল থেকে ভেসে আসে না কোন মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বর।

দণ্ডক তপোবনের গাছ গাছালির কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। না—এখানেও কেউ নেই। সেই পাখীগুলিও যেন অদৃশ্য।

দু' চারদিনেই দণ্ডক মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ, ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। সে দণ্ডক রাজা। অযোধ্যার রাজপুত্র। এককালে ইচ্ছামাত্র সে ভোগ্য নারীকে লাভ করেছে। নারী ছিল তখন তাঁর কৃপার পাত্রী। দণ্ডকারণ্যে আসবার পর সে নিজেকে অনেক সংযত করেছে। সেদিন অঞ্জাকে দেখবার পর তার চিত্ত চঞ্চল হয়েছে, বটে, কিন্তু সেই চঞ্চলতাকেও সে সংযত করেছে। কিন্তু মুনিকন্যা কি তাকে নিয়ে কৌতুকের খেলায় মেতেছে? সে কি তাকে কৃপাপাত্র ভেবেছে? সামান্য মুনিকন্যার এত সাহস!

ভাবতে ভাবতে রক্ত গরম হয়ে যায় দণ্ডকের। আর সে আসবে না তপোবনে। এবার সে পৌরুষ দিয়ে হরণ করবে অঞ্জাকে।

তপোবনের পাশে এক বিশাল পুষ্পোদ্যান। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় দণ্ডক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই সুঠাম সুন্দর বরবর্ণিনী। গাছ থেকে পুষ্প চয়ন করে পুষ্পপেটিকায় রাখছে।

দণ্ডক ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে মুনিকন্যার পাশে গিয়ে ডাকল, অঞ্জা!

অঞ্জা চকিতে ফিরে তাকাল। দণ্ডককে দেখে তার মুখে একই সঙ্গে লজ্জা ও ভয়ের আলোছায়ার খেলা।

—তোমাকে সেদিনের পর থেকে আর দেখিনি কেন? দণ্ডকের স্বরে অস্থির ক্রোধের ঝিলিক।

—আমাকে দেখবার কি কোন কারণ দেখা দিয়েছিল? অঞ্জার মুখে এক চিলতে হাসির রেখা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছিল। দণ্ডকের স্বরে অসহিষ্ণুতা। তোমার কাছে আমি সেদিন আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছিলাম। তুমি তার সুযোগ নিয়েছ। তুমি আমার সঙ্গে সুন্দর এক চাতুরীর খেলা খেলছো।

—রাজা দণ্ডক, দণ্ডকারণ্যের আরণ্যরাজা, অঞ্জা এবার হেসে বলে,

আমি ক্ষুদ্র মুনিকন্যা, আপনার সঙ্গে চাতুরীর খেলা খেলার দুঃসাহস আমার হবে কি করে? সে খেলবে রাজকন্যারা।

—আমি ও-সব কথার ছলাকলা বুঝি না। দণ্ডক এবার অজার হাত চেপে ধরল, আমি অরণ্যের অরণ্যরাজা, মানুষের ভাষার চেয়ে আমি অরণ্যের ভাষা ভাল বুঝি। অরণ্যের ভাষাতেই আমি কথা বলি।

—আমার হাত ছেড়ে দাও রাজা, অজার স্বরে মিনতি, এ তপোবনে অশিষ্ট আচরণ অশোভন। পিতার সন্ধ্যাপূজার সময় হয়ে যাচ্ছে। পুষ্পচয়নে বিলম্ব হলে তিনি ক্রুদ্ধ হবেন। আমাকে যেতে দাও।

বলতে বলতে অজা কি এক কৌশলে দণ্ডকের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডক তাকে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলল—অরণ্যরাজা মানুষের ক্রোধকে ভয় করে না অজা।

অজা এবার যথার্থ ভীত হল। দণ্ডকের রক্তিম চোখের মধ্যে নিজের সর্বনাশের ছায়া দেখে বলল—তুমি আমাকে ছেড়ে দাও রাজা। পিতার কাছে আমাকে প্রার্থনা কর।

—আমি রাজা, আমি সবার প্রার্থনা পূরণ করি, কারো কাছে কিছু প্রার্থনা করি না। আমি কারো করুণার প্রার্থী নই।

রাজা দণ্ডক উন্মত্তের মতো অজার সুন্দর দেহকে আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করতে লাগল। যেন ক্রুদ্ধ ঝড় এসে বিপর্যস্ত করে দিল একটি পেলব লতাকে। ভয়ে বেদনায় নীল হয়ে গেল অজার মুখ। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা। আকুল কণ্ঠে অনুনয় করে বলল, যথাবিধি বিবাহের পর আমাকে তোমার ভোগ্য কর রাজা—ক্ষণিকের মোহকামনায় সর্বনাশ ডেকে এনো না। আমার সর্বনাশ—তোমারও সর্বনাশ—

—রাজা দণ্ডক সর্বনাশের ভয় করে না।

রাজা দণ্ডক মুহূর্তের মধ্যে সেই কোমল স্নিগ্ধ বরবর্ণিনী পুষ্পপেলব

দেহকে দুহাতে তুলে পুষ্পোদ্যানের মধ্যে নিক্ষেপ করে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কেটে গেল কত মুহূর্ত, কত পল হয়তো বা দণ্ডও।

শুক্রের সন্ধ্যাপূজার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। অজা পুষ্প নিয়ে ঘরে ফিরে এল না। এমন অঘটন তো ঘটে না। তার কি কোন বিপদ হল? শুক্রমুনি তপোবনের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ইতঃস্তত সন্ধান করতে করতে তাঁর চোখ পড়ল পুষ্পোদ্যানের মধ্যে শায়িতা এক নারীশরীরের প্রতি। দ্রুতপায়ে ছুটে গেলেন সেদিকে। নীচু হয়ে দেখলেন। এ তো তারই আত্মজা অজা। নগ্ন নিরব নিঃস্পন্দ দেহ।

—অজা! কন্যা! ব্যাকুল কণ্ঠে মুনি চিৎকার করে উঠলেন, কথা বল অজা।

অজা অচেতন অনড়।

শুক্র অজার হাত তুলে নিয়ে ধমনী পরীক্ষা করলেন। ধমনীর রক্তপ্রবাহ এখনও গতিশীল। কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে দিলেন অজার চোখে মুখে। অজা ধীরে ধীরে চোখ মেলল।

' —পিতা!

—কে তোমার এই সর্বনাশ করেছে কন্যা?

অজা নীরব। তার চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা।

—আমি জানতে চাই কার দুর্মতি হল শুক্রকন্যার সর্বনাশ করবার? শুক্রের কণ্ঠস্বরে যেন অগ্নির লেলিহান শিখা, তোমাকে বলতে হবে কন্যা।

অজা তবু নীরব নিথর।

—উত্তম। তবে আমিই জেনে নিচ্ছি।

শুক্রমুনি সেখানেই কুশাসন পেতে ধ্যানে বসলেন। মুহূর্তে নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ল তাঁর সমগ্র দেহ। ধ্যানের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন সেই দুষ্কৃতিকারীকে। দেখতে দেখতে থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁর দেহ।

ললাটে ফুটে উঠল কুটিল রেখা। আরক্ত চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, দণ্ডক—দণ্ডকই তবে দুষ্কৃতিকারী। দণ্ডক—

—পিতা—পিতা—অজা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

শুক্র ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মাথার জটাজাল খুলে পড়েছে। ধক ধক করে জ্বলছে রক্তিম চক্ষুর্দ্বয়।

কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপুত জল নিক্ষেপ করে গম্ভীর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। তারপর বজ্রকণ্ঠে আহ্বান জানালেন, দণ্ডক-দণ্ডক-দণ্ডক, আমি মহামুনি শুক্র তোমাকে আহ্বান করছি—

শুক্রের সে বজ্রনাদে থরথর করে কেঁপে উঠল আকাশ বাতাস অরণ্য। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, দণ্ডক যেন আচ্ছন্নের মতো টলতে টলতে এগিয়ে আসছে কোন অদৃশ্য শৃঙ্খলের আকর্ষণে। উদভ্রান্ত যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মুখ—চোখের দৃষ্টিতে অসহায়তা—

—দণ্ডক! অরণ্য কম্পিত করে বজ্রগর্জন করলেন শুক্র, আমার অভিসম্পাতে তুমি সবংশে ভস্মীভূত হও।

মুহূর্তের মধ্যে যেন অলৌকিকভাবে দণ্ডকের দেহে জ্বলে উঠল প্রচণ্ড আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল তাঁর সর্বশরীর।

—পিতা—পিতা! অজা আর্তনাদ করে অচেতন হয়ে পড়ল।

—ভস্মে পরিণত হবার পূর্বে জেনে যাও দণ্ডক, তোমার পাপে তোমার পিতামাতা পরিজন—সবারই আজ তোমারই মতো অবস্থা। হা-হা-হা—অট্টহাস্য হেসে উঠলেন শুক্র।

লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলছে দণ্ডকের দেহ। মাংসের পোড়া কটু গন্ধ। ভয়ার্ত পাখিরা ঝাঁক বেঁধে চীৎকার করতে করতে উড়ে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শেষ। একটু আগে দণ্ডক যেখানে দাঁড়িয়েছিল, এখন সেখানে শুধু ভস্মরাশি। শুক্র কমণ্ডলু থেকে সে ভস্মরাশির উপর পবিত্র জল ছিটিয়ে বলেন—ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

অজা এখন পুরোপুরি অন্তঃপুরবাসিনী। সারা দেহে তার মাতৃত্বের চিহ্ন। শরীরের কোষে কোষে বহন করে চলেছে সে অরণ্যের রাজার উত্তরাধিকারীকে।

শুক্র আশ্রমের বর্ষীয়সী তাপসীদের দিয়ে অনেক বুঝিয়েছেন অজাকে গর্ভস্থ সন্তানকে বিনাশ করে ফেলবার জন্য। অজা সম্মত হয়নি। অনমনীয় তার মনোভাব। তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে তাকে লালন পালন করে বড় করে তুলবে।

শুক্র শেষে নিজেই একদিন অজাকে বললেন—কন্যা, তুমি এখনও অনূঢ়া। এই অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তোমার অপযশ হবে।

—আমাকে কি করতে বলছেন পিতা ? অজা মৃদুকণ্ঠে বলে।

—অবাঞ্ছিত ভ্রূণনাশ শাস্ত্রসম্মত কন্যা।

—না—না পিতা ! অজা শিউরে ওঠে, এমন নিষ্ঠুর কাজ কখনও হতে পারে না পিতা। আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে।

—বেশ। ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে না হয় ত্যাগ করো—কোন অপুত্রক দম্পতিকে সন্তান দান করলে তারা আনন্দে তাকে পালন করবে। অনেক রাজবংশ অভিজাত বংশের এরূপ ঘটনা আছে।

—এ তো আরও নিষ্ঠুর কাজ পিতা। দশমাস দশদিন গর্ভে ধরে যে সন্তানকে প্রসব করলাম, যার মুখ দেখে ভুলে গেলাম সকল ব্যথা যন্ত্রণা, সেই সন্তানকে আবার বিসর্জন দেওয়া—এ যে অমানুষিক ব্যাপার।

শুক্র অজার মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর বুক ভেদ করে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। অজার মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন চিরন্তন জননীর ছবি।

বললেন—সবই বুঝলাম কন্যা। কিন্তু আশ্রমিক হলেও আমাদেরও কিছু সামাজিক রীতি নিয়ম মানতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার পিতৃপরিচয়ও তো প্রয়োজনীয়।

—কোন প্রয়োজন নেই পিতৃপরিচয়ের। আমার সন্তানকে আমি শুধু মাতৃপরিচয় দিয়েই পালন করবো। আমার সন্তান হবে শুধুমাত্র আমারই সন্তান।

—তা হয় না কন্যা। শুক্র চিন্তিতভাবে মাথা নাড়েন, কুমারী মাতা সমাজের ঘৃণার ও করুণার পাত্রী। আমি বরং তোমার বিবাহের আয়োজন করি। এমত অবস্থায় কোন ঋষিকুমার করুণাবশে তোমাকে বিবাহ করতে সম্মত হবেন।

—না পিতা, আমি বিবাহ করবো না।

—তবে তুমি কি করতে চাও?

—আমি আমার সন্তানকে নিয়ে বাঁচতে চাই। তপোবনে যদি আমার স্থান না হয়, অরণ্যে নিশ্চয়ই আমার স্থান হবে।

—তোমাকে যে সকলে উপহাস করবে কন্যা!

—করুক। আমি সন্তানের গৌরবে সব কিছু হাসিমুখে সহ্য করবো। আমার কোন লজ্জা কিংবা সংকোচ নেই পিতা। আমার এই অবস্থার জন্যে আমি বা আমার সন্তান কেউই তো অপরাধী নই পিতা। আমার সন্তানকে নিয়ে আমি মাথা উঁচু করে চলবো।

—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুক্রাচার্য উঠে দাঁড়ালেন। অজ্ঞাকে তিনি চেনেন। এ মেয়ে ফুলের মতো কোমল, আবার বজ্রের মতো কঠিন।

* * *

নির্দিষ্ট সময়ে অজ্ঞা প্রসব করল পুত্র সন্তান।

সন্তানের জন্ম মুহূর্তে হল না কোন শঙ্খধ্বনি, নবজাতকের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে গাওয়া হল না কোন মঙ্গলগীত।

নীরবে নির্জনে অজ্ঞার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। অপূর্ব সুন্দর সন্তান। আর সে সন্তানের দিকে তাকিয়ে অবসান হল অজ্ঞার সকল যন্ত্রণার। এই পুত্রই তো তার জীবন—তার গৌরব।

আশ্চর্য প্রাণশক্তি অজ্ঞার। দেহমনের সকল শক্তি উজাড় করে নিঃশেষ করে সে সন্তানকে বড় করে তুলতে লাগল। পুত্র তার ধ্যানজ্ঞান —পুত্র তার দ্বিতীয় সত্তা। প্রতিটি মুহূর্ত তার পুত্রের জন্য উৎসর্গিত। পুত্রের নাম রাখা হল হারীত। অজ্ঞার হরণকারী দণ্ডকের পুত্রের নাম হারীত ছাড়া আর কিই বা হতে পারে।

* * *

হারীত আশ্রমের সবার প্রিয়। তার জন্মের পর তাকে নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞার মাতৃশক্তির একাগ্রতার কাছে সব আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে।

অজ্ঞা জ্যোতির্ময়ী মাতৃরূপে ঘিরে রেখেছে হারীতকে। আহার বিহার আরাম বিলাস কোনদিকে তার লক্ষ্য নেই। পুত্রকে বড় করে তোলাই তার তপস্যা। তার এই তপস্যাপূত জীবনচর্যায় সকলে চমৎকৃত। আশ্রমে হারীতের পরিচয়—অজ্ঞার সন্তান।

অল্পবয়সে সে সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম, এদিকে অস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ।

অজ্ঞা তাকে আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তুলেছে।

* * *

এদিকে অযোধ্যার রাজবংশ শুক্রাচার্যের অভিশাপে নিশ্চিহ্ন। অযোধ্যার রাজসিংহাসন শূন্য। রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ রাজার নামে রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু শাসন ওই নামেই। ব্রাহ্মণকে কেউ শাসক হিসাবে মানে না। রাজ্যের মধ্যে দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতির উপদ্রব ভয়াবহ। বশিষ্ঠের তপস্যাও বিনষ্টপ্রায়। প্রশাসনের বিপর্যয়ে বশিষ্ঠ চিন্তিত। মন্ত্রিমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করে বশিষ্ঠ একদিন পাত্র-মিত্র অমাত্য সেনাপতি সহ বিশাল শোভাযাত্রা করে উপস্থিত হলেন শুক্রাচার্যের তপোবনে।

শুক্রাচার্য শশব্যস্ত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

—আমি আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি মুনিবর।

—মহামুনি বশিষ্ঠ আমার কাছে প্রার্থী ? শুক্রাচার্য মৃদু হাসলেন, তিনি তো শুনেছি অযোধ্যারাজ্যের সর্বময় কর্তা।

—সেই কর্তৃত্বের বোঝা কমানোর জন্যেই আপনার কাছে এলাম মুনিবর। সূর্যবংশের একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী হারীতকে আমি অযোধ্যার রাজসিংহাসনের জন্য বরণ করে নিয়ে যেতে এসেছি।

—উত্তম প্রস্তাব। শুক্র উৎফুল্ল হলেন, হারীত অযোধ্যার রাজসিংহাসনে উপবেশন করবে এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু—শুক্রাচার্যের কণ্ঠস্বর ঈষৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ল।

—কিন্তু কি মুনিবর ? বশিষ্ঠ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার দুখিনী কন্যা অজা—আপনার তো কিছুই অজানা নেই মুনিবর, হারীত তাঁর প্রাণ—

—রাজমাতাকেও আমরা সসম্মানে অযোধ্যায় নিয়ে যাবো শুক্রা-চার্য। রাজপ্রাসাদে তিনি রাজমাতার মর্যাদায় থাকবেন।

—তবে তো আর কোন সমস্যাই রইল না। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি ওদিকে যাত্রার আয়োজন করতে বলি।

* * *

অযোধ্যা নগর আজ উৎসব সাজে সেজেছে। বহুদিন পর আজ নগরী উজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত। প্রতি গৃহে বাতায়নে অলিন্দে সুবেশ নারীর উৎসুক মুখ। রাজপথে শ্রেণীবদ্ধ মানুষ ব্যগ্রভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মোড়ে মোড়ে সুসজ্জিত তোরণ।

আজ অযোধ্যার রাজা আসছেন শূন্য সিংহাসনে বসতে। ধীরে ধীরে বিশাল রাজকীয় শোভাযাত্রা নগরের রাজপথ ধরে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাজকীয় চতুর্দোলায় রাজমাতা অজা ও রাজা হারীত।

সহস্রকণ্ঠে বারবার জয়ধ্বনি উঠছে—জয় ! অযোধ্যার রাজাধিরাজ হারীতের জয় !

রাজপ্রাসাদের সামনে রাজাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য নানাদেশের রাজন্যবৃন্দ দাঁড়িয়ে ছিলেন।

রাজপ্রাসাদের সামনে শোভাযাত্রা থামতে স্বয়ং বশিষ্ঠ হারীতের হাত ধরে রাজসভাগৃহে নিয়ে গেলেন।

রাজসভা গৃহে রাজসিংহাসন সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। রাজসভা বিভিন্ন দেশের রাজা মন্ত্রী ঋষি ও বিশিষ্ট মানুষে পূর্ণ।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ হারীতের হাত ধরে অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি উঠল, জয়! অযোধ্যার রাজাধিরাজ হারীতের জয়!

চারধারে শুধু মানুষ আর মানুষ।

অঞ্জা একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছে। আজ সকলের চোখ তার পুত্রের দিকে। সকলে তার পুত্রকে দেখছে। তার পুত্র আজ অযোধ্যার রাজা। তার সাধনা সফল—তার স্বপ্ন সার্থক।

অনেক দুঃখ অনেক যন্ত্রণার মধ্যে পুত্রকে সে বড় করে তুলেছে—জননীরূপে তার দায়িত্ব সে জীবন দিয়ে পালন করেছে। তার সকল দায়িত্বের এখন অবসান। পুত্র এখন সাবালক—মাতৃছায়ামুক্ত স্বাধীন রাজা। বিশাল রাজ্যের অগণিত মানুষের শাসনকর্তা।

পুত্রের দিকে তাকিয়ে অঞ্জার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা—আনন্দের এবং হয়তো বা কিছুটা বেদনারও।

মনে মনে পুত্রের উদ্দেশে আশীর্বাণী উচ্চারণ করে অঞ্জা সবার অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পথে পা রাখল। তার শেষ আশ্রয় দণ্ডকারণ্য=যেখানে অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে সুখদুঃখের স্মৃতি হয়ে পড়ে আছে তার হৃদয়ের রাজা দণ্ডক।

সর্বংসহা শৈব্যা

—মহারাজ আমি জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তোমার সহগামিনী। তোমার জন্য আমি সুদুঃসহ দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করতে প্রস্তুত।

—সুন্দরী রমনীর মুখে মিথ্যা ভাষণও অতীব সুন্দর। রাজা হরিশ্চন্দ্র হেসে বললেন।

—তুমি আমার বাক্যে বিশ্বাস করছো না? রাজবধূ শৈব্যা আহত-কণ্ঠে বললেন, আমি কিন্তু মিথ্যা বলিনি।

—তুমি মিথ্যা বলনি আমি জানি। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার পেলব সুন্দর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিলেন, তুমি কেন, কোন নারীই স্বামীর কাছে মিথ্যা বলে না। কায়মনোবাক্যে তারা স্বামীর অনুবর্তিনী থাকতে চায়, কিন্তু বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাস্তব যে বড় নিষ্ঠুর শৈব্যা।

—বাস্তব যত নিষ্ঠুরই হোক, আমি সব নিষ্ঠুরতাকে পরাজিত করবো।

—আজকের এই বাসর রাত্রি কি শুধু এই সব কথাতেই কেটে যাবে? হরিশ্চন্দ্র হেসে বললেন, বাতায়ন পথে তাকিয়ে ত্যাখ, আকাশে বাতাসে আজ উৎসবের মাধুর্য। অযোধ্যার রাজার বিবাহে সমগ্র পুরবাসী আজ উৎসবমত্ত। সোমদত্ত রাজার কন্যা শৈব্যা রাজবধূ হয়ে এসেছে অযোধ্যানগরে—অযোধ্যাবাসীর আজ আনন্দের সীমা নেই। তোমাকে পত্নীরূপে পেয়ে আমিও তো আনন্দকে ধরে রাখতে পারছি না শৈব্যা।

—তোমাকে স্বামীরূপে পেয়ে আমার আনন্দ যে তার চেয়েও বেশী। শৈব্যা মুখ নত করে বললেন, আমি তো তোমারই ছায়া।

—ছায়া নও; তুমি আমার কায়া—আমার আনন্দরূপিনী। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে কাছে টেনে নিলেন, এই মুহূর্তে মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে, জীবনে মরণে তুমি আমার সহগামিনী।

শৈব্যা স্বামীর বুকে মুখ রাখলেন।

* * *

অযোধ্যার রাজা হরিশ্চন্দ্র আদর্শ প্রজাপালক রাজা। দেব দ্বিজ মুনি ঋষিতে অচলা ভক্তি। দানধ্যানে অতুলনীয়।

হরিশ্চন্দ্রের শাসনে প্রজারা খুব সুখী। তাদের কোন অভাব নেই অভিযোগ নেই। অভাব দেখা দেবার আগেই রাজার দানে তাদের ভাণ্ডার যায় পূর্ণ হয়ে।

হরিশ্চন্দ্র নিজেও অন্তরে সুখী। দেবীর মতো পত্নী তাঁর। দেবকুমারের মতো পুত্র হয়েছে তাঁর। নাম রেখেছেন রোহিতাশ্ব। পত্নী পুত্র পরিজন ও প্রজাবৃন্দ নিয়ে তারও সুখের সীমা নেই।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেউ বোধহয় ভোগ করতে পারে না। সুখের পুষ্পের প্রাচুর্যের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে দুঃখের কৃষ্ণকীট।

রাজা হরিশ্চন্দ্র একদিন গেছেন মৃগয়া করতে। শিকারের সন্ধানে তিনি অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

অরণ্যের মাঝে অনেকখানি জায়গা জুড়ে তপোবন এলাকা। চারধারে ঘন বৃক্ষরাজি। তপোবনের একদিকে বিশাল পুষ্পোদ্যান। প্রতিটি ঋষির তপোবনে এরূপ বিশাল পুষ্পোদ্যান আছে। হরিশ্চন্দ্র পুষ্পোদ্যানের কাছে একটা দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

একটি মালতী ফুলের গাছের নীচে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী দাঁড়িয়ে। গাছের ডালে হাত দুটো লতা দিয়ে বাঁধা। যুবতীর সমস্ত মুখে গভীর যন্ত্রণার চিহ্ন।

রাজা ধীরে ধীরে কাছে এসে বললেন, তুমি কে? তোমার এরূপ অবস্থা কেন?

যুবতী কি বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হল না। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল জল।

হরিশ্চন্দ্র বুঝতে পারলেন, যুবতীর কথা বলবার শক্তি নেই। তিনি তরবারি তুললেন গাছের ডাল কাটবার জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে যুবতী যেন সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল—কেটো না কেটো না। ঋষি বিশ্বামিত্রের কোপে তোমার সর্বনাশ হবে।

হরিশ্চন্দ্র বললেন—সর্বনাশ হয় হোক। বিপন্ন নারীকে বিপদমুক্ত করা রাজধর্ম।

এই বলে হরিশ্চন্দ্র এক আঘাতে গাছের ডাল কেটে ফেললেন। যুবতী মাটিতে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। তার আগেই রাজা তাকে ধরে সযত্নে গাছের গুঁড়িতে বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে জলপাত্র ছিল। তা থেকে জল ঢেলে তাকে দিলেন। জল পান করে যুবতী একটু সুস্থ হল। তারপর রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে বিপদমুক্ত করে তুমি তোমার নিজের বিপদ ডেকে আনলে কেন রাজা হরিশ্চন্দ্র ?

হরিশ্চন্দ্র বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আমি রাজা হরিশ্চন্দ্র, তা তুমি জানলে কি করে ?

—আমি জানি। রাজা হরিশ্চন্দ্র ছাড়া অন্য কেউ আমাকে বিপদ মুক্ত করতে পারেন না। ঋষি বিশ্বামিত্রের কোপকে তিনিই একমাত্র ভয় করেন না।

—কিন্তু ঋষি বিশ্বামিত্র তোমার উপর কুপিত হয়েছিলেন কেন ?

—শোন রাজা, আমি স্বর্গের অপ্সরা। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যকালে আমার তালভঙ্গ হলে দেবরাজ আমাকে মর্ত্যলোকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। আমি শাপমুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা করায় দেবরাজ বলেছিলেন, ঋষি বিশ্বামিত্র তোমাকে বন্দী করবেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র এসে তোমাকে মুক্ত করলে তোমার শাপমুক্তি হবে। আমি ঋষি

বিশ্বামিত্রের পুষ্পোদ্যানের পুষ্প চয়ন করায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বৃক্ষশাখায় বন্দী করে রেখেছিলেন।

—এবার তো তুমি মুক্ত।

—হ্যাঁ, আমি মুক্ত। আমাকে এবার যেতে হবে। যুবতী উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তুমি আর এক বন্ধনে আমাকে বদ্ধ করলে রাজা।

—এবার স্বস্থানে গিয়ে তুমি সুখী হও ভদ্রে।

—তাই হয়তো হতাম। কিন্তু তোমার চিন্তায় সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন থাকবে আমার হৃদয়। ঋষি বিশ্বামিত্রের কোপন স্বভাব ভুবন বিদিত।

—আমার চিন্তায় তুমি নিজেকে আছন্ন করে রেখো না। হরিশ্চন্দ্র মৃদু হাসলেন, সর্ব পরিস্থিতিতে সংগ্রামের মানসিকতা আমার আছে।

—তোমার জয় হোক রাজা। যুবতী মৃদুকণ্ঠে বলল, চিরদিন তুমি আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

বলতে বলতে নিজের চারধারে অদ্ভুত এক ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করে যুবতী তার মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

হরিশ্চন্দ্র ফিরে গেলেন নিজের রাজধানীতে।

* * *

পরদিন রাজা হরিশ্চন্দ্র বসেছেন রাজ-দরবারে।

বিশ্বামিত্র এসে উপস্থিত। ক্রোধে সমস্ত মুখমণ্ডল আরক্ত। মাথার জটাজাল বিশৃঙ্খল।

হরিশ্চন্দ্র শশব্যস্তে উঠে পাদ্যঅর্ঘ্য দান করে বললেন—আমার পরম সৌভাগ্য ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের পদধূলি পড়েছে আমার রাজসভায়। আসন গ্রহণ করুন ব্রহ্মর্ষি।

—আমি আসন গ্রহণ করতে আসিনি, বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আমি জানতে এসেছি আমার তপোবনের বন্দিনী কন্যাকে মুক্ত করবার দুঃসাহস তোমার হল কিরূপে?

—দুঃসাহস নয় ব্রহ্মর্ষি, হরিশ্চন্দ্র বিনীতকণ্ঠে বললেন, এ আমার ধর্ম। রাজা হিসাবে আমি রাজধর্ম পালন করেছি মাত্র।

—ওঃ। রাজধর্ম! বিশ্বামিত্র ব্যঙ্গভরে হেসে উঠলেন, সুন্দরী যুবতীকে মুক্ত করাই শুধু রাজধর্ম?

—তা কেন হবে? প্রজাপালন, দেবদ্বিজে ভক্তি, দানধ্যান—সবই তো আমার রাজধর্মের অন্তর্গত।

—দানধ্যানের অহংকার করছ? বিশ্বমিত্র অট্টহাসি হেসে উঠলেন, কি দানধ্যান তুমি করতে পার? আমাকে কিছু দান করার শক্তি তোমার আছে? দেবে আমাকে কিছু দান?

—আপনাকে দান দিতে পারা তো মহা সৌভাগ্যের বিষয়। হরিশ্চন্দ্র হেসে বললেন, আপনি কি চান অনুগ্রহ করে বলুন?

—শপথ কর, যা চাইব দেবে?

—শপথ করছি।

—বেশ, সসাগরা পৃথিবী তোমার অধীন। এই পৃথিবী তুমি আমাকে দান কর।

—যথাবিধি দান করছি।

হরিশ্চন্দ্র শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী মাটি হাতে নিয়ে দানমন্ত্র উচ্চারণ করে বিশ্বামিত্রকে পৃথিবী দান করলেন।

—এবার দক্ষিণা দাও। আমার সপ্তকোটি স্বর্ণমাষা দক্ষিণা চাই।

—একটু অপেক্ষা করুন। আমি কোষাধ্যক্ষকে বলে এক্ষুণি তার ব্যবস্থা করছি।

—মূর্খ! হা হা করে হেসে উঠলেন বিশ্বামিত্র, রাজ্য দান করবার সাথে সাথে কোষাগারের কর্তৃত্বও তুমি আমায় দান করেছ। তুমি এখন সর্বরিক্ত ভিক্ষুকমাত্র। এই পৃথিবীতে তোমার দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত নেই।

—আছে, হরিশ্চন্দ্র দৃঢ়স্বরে বললেন, বারাণসী দেবাদিদেব শিবের

রাজ্য, শুনেছি এই পৃথিবীর সঙ্গে বারাণসী সংযোগ বিচ্ছিন্ন, আমার স্থান সেখানে, আমি সেখানেই চলে যাব।

—কিন্তু যাবার আগে আমার দক্ষিণা দিয়ে যাও। তুমি মহান দাতা। দান তোমার রাজধর্ম! আমার দক্ষিণা না দিলে তোমার নিষ্কৃতি নেই।

—আমাকে সাতদিন সময় দিন। আমি এর মধ্যে যেভাবে হোক আপনার প্রার্থিত দক্ষিণা সংগ্রহ করব।

—বেশ দিলাম তোমাকে সাতদিন সময়। এর মধ্যে আমাকে দক্ষিণা দিয়ে তুমি রাজ্যত্যাগ করবে।

বিশ্বামিত্র সক্রোধে রাজসভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

হরিশ্চন্দ্র ভারাক্রান্ত মনে প্রবেশ করলেন অন্দরমহলে। ভারাক্রান্ত মনে বসে রইলেন আপন কক্ষের পালঙ্কে।

রাজরানী শৈব্যা এসে স্বামীর অঙ্গ থেকে রাজকীয় পোষাক খুলতে খুলতে বললেন, তুমি এত বিষণ্ণ হয়ে বসে আছো কেন রাজা?

হরিশ্চন্দ্র বললেন—আমি তোমাদের সর্বনাশ করেছি প্রিয়ে।

শৈব্যা কোনরূপ বিচলিত না হয়ে আপন কাজ করতে করতে বললেন—সর্বমঙ্গল যে করে, সর্বনাশ করবার অধিকারও তার আছে।

—তুমি জান না আমি কি করেছি, রাজা বিচলিত কণ্ঠে বললেন, হঠকারিতা বশে আমি ঋষি বিশ্বামিত্রকে নিজ রাজ্য দান করে দিয়েছি।

—উত্তম করেছো, দান ধ্যানই তো তোমার ধর্ম।

—রাজ্য দান করে আমি এখন সর্বরিক্ত ভিক্ষুকমাত্র। কিন্তু আমি ভাবছি তোমাদের কি হবে? তুমি, রোহিতাশ্ব—এরা কোথায় থাকবে?

—তুমি যেখানে থাকবে আমরাও সেখানে থাকবো।

—আমি জানি না আমি কোথায় থাকবো। রাজা ভাঙা গলায় বললেন, হয়তো শিবের স্থান বারাণসীতে আমাকে থাকতে হবে—হয়তো কোন শ্মশানে মশানে কিংবা লোকালয়ের বাইরে কোন প্রান্তরে।

ভিক্ষান্নে হয়তো বা ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে হবে। এমতাবস্থায় তোমরা আমার সঙ্গে কিরূপে থাকবে ?

—তুমি যেরূপে থাকবে, আমরাও সেরূপে থাকবো। শৈব্যা স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, তোমার ভিক্ষান্নই আমরা ভাগ করে খাবো।

—শৈব্যা, মহারাণী, তুমি রাজকন্যা রাজবধূ, তুমি পারবে এ কষ্ট সহ্য করতে ?

—তুমি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে যদি এ কষ্ট সহ্য করতে পারো, তবে আমরাই বা পারবো না কেন ? আমি তো জীবনে মরণে তোমার সহগামিনী, তোমার জন্যই আমি সর্বংসহা।

—শৈব্যা, তোমার বাক্যে আমি নতুন উৎসাহ বোধ করছি। কিন্তু আর একটি সমস্যার সমাধান তার আগে আমাকে করতে হবে প্রিয়ে।

—কোন্ সমস্যা ?

—বিশ্বামিত্র দানের দক্ষিণা চেয়েছেন সাত কোটি স্বর্ণমাষা। তা আমাকে সাতদিনের মধ্যে সংগ্রহ করে দিতে হবে।

—এ আর সমস্যা কি। আমার অঙ্গের অলংকারের মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী। তুমি এই দিয়ে দক্ষিণা সমস্যার সমাধান করো।

—না শৈব্যা, তা হয় না। হরিশ্চন্দ্র চিন্তিতস্বরে বললেন, আমি সর্বস্ব দান করেছি, তার মধ্যে এই অলংকারও পড়ে। প্রদত্ত সম্পদে আমি কিরূপে দক্ষিণা দেব ?

—তাহলে আমি পিতার কাছ থেকে এই পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা চেয়ে নেব।

—তাও হয় না শৈব্যা। তোমার পিতৃরাজ্যও তো আমার সাম্রাজ্যের অধীন। সেখানকার কোষাগারের সম্পদে আমার কোন অধিকার নেই।

—তবে ? শৈব্যার মুখে এবার চিন্তার রেখা।

—এই পরিমাণ অর্থ আমাকে অর্জন করতে হবে—ভিক্ষা দ্বারা নয়,

শ্রম দ্বারা। আমি কোন সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে আত্মবিক্রয় করে এই পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করবো।

—আমি থাকতে তুমি কেন আত্মবিক্রয় করবে প্রভু? শৈব্যা জল ভরা চোখে তাকালেন, তুমি আমাকে কোন সম্পন্ন গৃহস্থের নিকট বিক্রয় করে দাও। আমি সেখানে দাসীর কর্ম করবো।

—শৈব্যা! হরিশ্চন্দ্র চীৎকার করে ওঠেন, তা হয় না। রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাণী শৈব্যা হবে দাসী! এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হোক।

—তুমি বিচলিত হচ্ছো কেন রাজা? শৈব্যা পরম মমতায় স্বামীর হাতে হাত রাখেন, তুমি দক্ষিণা দিতে সত্যবদ্ধ। আমাকে বিক্রয় করে তুমি সত্যমুক্ত হও। পরে নিজের পৌরুষ দিয়ে তুমি আমাকে মুক্ত করো আবার।

—না—না শৈব্যা, তা হয় না। তা হয় না। হরিশ্চন্দ্র এবার কেঁদে ফেলেন, এর চেয়ে আমার আত্মঘাতী হওয়া শ্রেয়।

—আত্মঘাতী হওয়া মহাপাপ। তুমি পুরুষ মানুষ। পৌরুষ দিয়ে তুমি আবার সব কিছু জয় করে নাও। তুমি আগামী কালই আমাকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা কর।

* * *

পরদিন অযোধ্যার দাস বিক্রয় কেন্দ্রে সে এক মর্মান্তিক করুণ দৃশ্য। রাজা হরিশ্চন্দ্র দীনবেশে রাণী শৈব্যা আর বালক পুত্র রোহিতাশ্বর হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছেন বিপণনশালায়। সেখানে আরও অনেক দাসদাসী বিক্রয়ার্থে উপস্থিত। অন্যদিন দাসদাসীর মূল্য নিয়ে দরদাম চলে উচ্চকণ্ঠে। আজ সব নীরব। বিশাল জনতা রাজ পরিবারের চতুর্দিকে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারো চোখই শুষ্ক নেই।

রাজা চীৎকার করে বললেন—যার গৃহে দাসীর প্রয়োজন চলে এসো। আমার পত্নী দাসীর সমস্ত কাজই নিখুঁত ভাবে করে দেবে।

বিশাল জনতা থেকে কোন মানুষই এগিয়ে এল না।

রাজা আবার হেঁকে বলেন—মনে কোন দ্বিধা করো না। আমি আজ তোমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। আমার অর্থের প্রয়োজন। আমার পত্নীর দাসীত্বের বিনিময়ে যে অর্থ পাবো, তাই দিয়ে আমি সত্যমুক্ত হবো। তোমরা আমায় সাহায্য করো।

এবার এগিয়ে এলেন এক সৌম্যকান্তি ব্রাহ্মণ।

—আমার গৃহে দাসীর প্রয়োজন। আমি তোমার পত্নীকে আমার গৃহে নিয়ে যেতে চাই।

—আমাকে সাত কোটি স্বর্ণমাষা বিক্রয় মূল্য দাও ব্রাহ্মণ।

—অত স্বর্ণমুদ্রা আমার সঞ্চয়ে নেই। আমি তোমাকে চারকোটি স্বর্ণমাষা দিতে পারি।

—বেশ তাই দাও।

—আমার গৃহে চল। সেখান থেকে আমি এই অর্থ দিচ্ছি।

রাজা শৈব্যাকে বললেন, চল শৈব্যা। এই ব্রাহ্মণের গৃহে তুমি দাসীবৃত্তি করবে।

শৈব্যা নীরবে রোহিতাশ্বের হাত ধরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। ব্রাহ্মণ বললেন—আমি তো তোমাকেই শুধু দাসী হিসাবে নির্বাচিত করেছি। তোমার পুত্রকে আমার প্রয়োজন নেই। ওকে তুমি রেখে যাও।

—ওকে আমি কোথায় রেখে যাব? আপনি দয়া করে আমার কাছে ওকে থাকতে অনুমতি দিন।

—অনুমতি তো দিতে পারি। কিন্তু তোমাদের দুজনের ভরণ পোষণের সাধ্য তো আমার নেই মা।

—আমাদের দুজনের খাদ্য আপনাকে দিতে হবে না বাবা। শৈব্যা কান্নাভেজা গলায় বললেন, আমার জন্য যে খাদ্য দেবেন, তাই আমরা দুজন ভাগ করে খাবো।

—বেশ তাই হোক।

ব্রাহ্মণ স্বগৃহে এসে হরিশ্চন্দ্রকে স্বর্ণমাষা দিয়ে দিলেন। হরিশ্চন্দ্র পুত্র পত্নীর সজল দৃষ্টির সামনে থেকে একরকম ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

চার কোটি স্বর্ণমাষা পাওয়া গেল। এখন বাকী তিনকোটি। কে দেবে এই পরিমাণ অর্থ? এখন আত্মবিক্রয় ছাড়া উপায় নেই।

অযোধ্যা নগরে কেউ তাকে দাসের কর্ম দেবে না। একমাত্র বারাণসীতে হয়তো তাকে কেউ দাস হিসাবে কিনতে পারে। রাজা সেখান থেকে চলে গেলেন বারাণসীতে।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে হাটে দাঁড়িয়ে তিনি চীৎকার করে বলতে লাগলেন—দাস চাই? দাস? আমি দাসের কর্ম করতে চাই।

রাজার চীৎকার শুনে এগিয়ে এল কালু ডোম।

—আমার দাসের দরকার আছে। তুমি আমার শুয়োর চরাতে পারবে?

—পারবো।

—মণিকর্ণিকার ঘাট আমার জমা নেওয়া। সেখানে মড়া পোড়াতে হবে। মড়া পিছু পঞ্চাশ কাহন করে আদায় করতে হবে। পারবে?

—পারবো।

—বেশ। কত দাম চাও তুমি নিজের জন্য?

—তিন কোটি স্বর্ণমাষা।

—বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে না?

—বেশীও না কমও না। ঠিক আমার যা প্রয়োজন তাই আমি চাইছি। রাজার চেহারা এবং কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে কালু ডোম আর না করতে পারল না।

সে তিনকোটি স্বর্ণমাষাই দিল হরিশ্চন্দ্রকে।

হরিশ্চন্দ্র বললেন—আমাকে একটু অবকাশ দিতে হবে। আমি ঋষি বিশ্বামিত্রকে এই মুদ্রাগুলি দিয়ে আবার ফিরে আসবো।

[illegible]

—ফিরে আবার আসবে তো ?

—বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গে তোমার কোন লোক চলুক।

—দরকার নেই। তোমার কথাতেই বিশ্বাস করছি।

* * *

হরিশ্চন্দ্র সাতকোটি স্বর্ণমাষা নিয়ে বিশ্বামিত্রকে দিয়ে দিলেন। বিশ্বামিত্র এতটা আশা করেননি। তার ধারণা ছিল, রাজা এই পরিমাণ মুদ্রা সংগ্রহ করতে পারবেন না, সুতরাং দক্ষিণা দিতে অপারগ হওয়ায় তার দান অসিদ্ধ হয়ে যাবে।

হরিশ্চন্দ্র তাকে দক্ষিণা পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়ায় তিনি আরও ক্রুদ্ধ হলেন।

রাজা বারাণসীতে ফিরে এসে কালুডোমের কাজে লেগে গেলেন। ভোর বেলা শুয়োরের পাল নিয়ে মাঠে ছেড়ে দেন। তারপর মালকোচা মেরে কাপড় পরে মণিকর্ণিকা ঘাটে মড়া পোড়ান। একের পর এক মৃত দেহ নিয়ে আসা হয়। তিনি সেগুলি চিতায় শুইয়ে পুড়িয়ে দেন। তাকে এখন আর রাজা বলে চেনা যায় না। রোদে পুড়ে জলে ভিজে তার চেহারা হয়েছে পুরোপুরি ডোমের মতো।

* * *

এদিকে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে শৈব্যা উদয়াস্ত খাটেন। ভোর বেলায় উঠে কাজে লাগেন আর অর্ধেক রাতে তার কাজ শেষ হয়। ব্রাহ্মণ তাকে প্রতিদিন একসের করে চাল দেন। একসের চালের ভাত রান্না করে শৈব্যা অধিকাংশ ভাত পুত্রকে খাইয়ে দেন। নিজে সামান্য ভাত আধপেটা খান।

মনে মনে ভাবেন, আমি তো তবু দুটো খেতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার স্বামী ? তার কি হচ্ছে ? হয়তো না খেয়ে পথে পথে ঘুরছেন।

সারাদিন অক্লান্ত খাটুনির পরও স্বামীর চিন্তায় শৈব্যার ঘুম আসে না। অনেক দিন না খেয়েই শুয়ে থাকেন।

একদিন ব্রাহ্মণ এসে বললেন—কাল থেকে আমি দেবপূজা করবো। তোমার ছেলে বন থেকে ফুল তুলে এনে দিক।

—বেশ তো। আমার ছেলে বন থেকে ফুল তুলে এনে দেবে।

পরদিন থেকে রোহিতাশ্ব ফুলের সাজি হাতে বনে চলে যেতে লাগল ফুল আনতে। বনের মধ্যে অসংখ্য ফুলের গাছ। রোহিতাশ্ব মনের আনন্দে ফুল তুলে সাজি ভরে। বাড়ীতে এসে ব্রাহ্মণকে ফুলগুলি দিতে ব্রাহ্মণ খুব খুশি।

রোহিতাশ্বকে বলেন—তুমি রোজই আমাকে ফুল এনে দেবে বাবা। আমি তোমাদের চালের বরাদ্দ কিছু বাড়িয়ে দেব।

একদিন ভোরবেলা রোহিতাশ্ব ঘুম থেকে উঠে ফুলের সাজি নিয়ে বনে যাবার জন্য প্রস্তুত।

শৈব্যা এসে ছলছল চোখে বলেন—আজ না হয় ফুল তুলতে নাই গেলি বাবা।

—কেন? রোহিতাশ্ব বিস্মিত হয়ে বলল, ফুল না আনলে যে ব্রাহ্মণের পূজা হবে না।

—ওরে, আমার আজ মন কেমন করছে রে। শৈব্যা ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন, তুই আজ যাস না। আমি ব্রাহ্মণের পূজার জন্য ফুল এনে দেব।

—তা হয় না মা, রোহিতাশ্ব হেসে মাকে প্রবোধ দিল, আমি এক ছুটে যাব আর চলে আসবো। তুমি কিছু ভেবো না।

এই বলে বালক সাজি হাতে এক ছুট লাগাল বনের দিকে। আজ গাছে গাছে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। ফুল তুলতে বালকের খুব আনন্দ। মুঠো মুঠো ফুল তুলে বেলপাতা ছেঁড়বার জন্য আঁকশি ধরে টান দিল। গাছের একটা ছোট ডাল ভেঙে পড়ল মাটিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো কুচকুচে সাপ ফণা তুলে মুহূর্তের মধ্যে রোহিতাশ্বের বুকে ছোবল মারল। গাছের ডালেই সাপটা জড়িয়ে

ছিল। মাটিতে পড়ে আঘাত লাগায় সোজা ফণা তুলে ছোবল মেরেছে

ছোবল খেয়ে রোহিতাশ্ব লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তার হাতের সাজি ছিটকে পড়ে গেল। ফুলগুলি চারধারে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আর সে ফুলের রাশির উপর দিয়ে সাপটা এঁকে বেঁকে কোথায় চলে গেল।

রোহিতাশ্ব মাটির উপর পড়ে রইল। নিস্পন্দ নীরব।

কতক্ষণ কেটে গেল।

রোহিতাশ্ব ঘরে ফেরে না। শৈব্যা বারবার ঘরবার করছেন। এদিকে পূজার সময় চলে যাচ্ছে ব্রাহ্মণের।

শৈব্যা বললেন—আমি বনের মধ্যে যেয়ে দেখে আসি কি হল।

ব্রাহ্মণ বললেন—যাও তবে।

শৈব্যা প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে এলেন বনের মধ্যে। ভয়ে ভাবনায় মন অস্থির। কতবার পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। কাঁটায় কাঁটায় ছড়ে গেল সারা শরীর। কোন কিছুতে দৃকপাত নেই।

ছেলেকে ডাকতে ডাকতে তিনি বনের গভীরে ঢুকে পড়লেন।

দূর থেকেই দেখলেন, ছেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। ছুটে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। হিমশীতল দেহ। সর্পবিষে নীল।

ছেলের দেহকে কোলে তুলে নিয়ে পাগলিনী বেশে ফিরে এলেন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে। কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন ব্রাহ্মণের পায়ে।

—বাবা, এই আমার ছেলে। বলে দিন এখন আমি কি করব ?

—সর্পদংশনে তোমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে মা। যে গেছে তাকে তো আর বাঁচানো যাবে না। তুমি একে দাহ করবার ব্যবস্থা করো।

—মা হয়ে আমি কি করে ছেলেকে দাহ করবো বাবা ?

—উপায় নেই মা। শাস্ত্রবিধি মানতেই হবে। তুমি ছেলেকে নিয়ে বারাণসী চলে যাও। মণিকর্ণিকা ঘাটে একে দাহ করো।

শৈব্যা ছেলের মৃতদেহ কোলে করে চলে এলেন মণিকর্ণিকা ঘাটে। অমাবস্যার রাত। চারধারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তারপর আবার শুরু হয়েছে ঝড়বৃষ্টি।

শৈব্যা ছেলের মৃতদেহ কোলে করে মণিকর্ণিকা ঘাটে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীষণ আকৃতি এক ডোম একটি মড়া পুড়িয়ে শৈব্যার কাছে এসে কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, এ্যাই—কি চাই?

শৈব্যা নীরবে ছেলের দেহকে সামনে তুলে ধরলেন।

—সে তো আগেই বুঝেছি। ডোম রুক্ষকণ্ঠে বলল—মড়া পোড়াতে পঞ্চাশ কাহন লাগে। সঙ্গে আছে?

শৈব্যা মাথা নাড়লেন। না—নেই।

—তবে ভাগ্ এখান থেকে। অন্য ঘাটে গিয়ে বিনি পয়সায় মড়া পোড়াগে যা। এখানে পয়সা ছাড়া কাজ হবে না।

—আমার তো পয়সা কড়ি নেই। আছে শুধু পরণের কাপড়। এইটে আমি অর্ধেক দিয়ে দিচ্ছি। এইটে নিয়ে তুমি কাজ উদ্ধার করে দাও।

—তোর ও ছেঁড়া কাপড়ের অর্ধেক নিয়ে আমি কি করব? যা ভাগ এখান থেকে—না হলে মারব লাঠির বাড়ি।

শৈব্যা তবু নড়েন না। ছেলের মৃতদেহ কোলে দাঁড়িয়ে থাকেন আর একটি মৃতদেহ হয়ে।

ডোমটি এবার লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে।

শৈব্যা কপালে করাঘাত করে কেঁদে ওঠেন—কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র, তুমি কোথায়? দেখে যাও তোমার ছেলে আর তোমার রাণীর অবস্থা।

শৈব্যার কান্না শুনে ডোম থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মাথাটা যেন ঘুরতে থাকে। পা টলতে থাকে। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, টলতে টলতে ডোম শৈব্যার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল—তুই কে?

শৈব্যা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সেই

মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ করে কোথায় বজ্রপাত হল। বিদ্যুতের আলোকে চারদিক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত হল।

আর সেই আলোকে ডোম আর শৈব্যা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল অপলক শুষ্ক চোখে।

—মহারাজা হরিশ্চন্দ্র! তোমার আজ একি অবস্থা?

—মহারাণী শৈব্যা! তোমার আজ একি অবস্থা? তুমি কি আমার প্রিয়তম পুত্রকে আজ দাহ করতে এখানে নিয়ে এসেছো?

—হ্যাঁ প্রভু। তোমার প্রিয়তম পুত্র রোহিতাশ্ব সর্পদংশনে মৃত। তাকে দাহ করবার জন্যই আমি এখানে এসেছি।

—আর আমি যথার্থ ডোমের মতোই পয়সার জন্য তোমাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছি। হা-হা-হা! ভাগ্যের কি পরিহাস। ডোম বেশী হরিশ্চন্দ্র পাগলের মতো অট্টহাসি হেসে উঠলেন। পরে হাসি থামিয়ে বললেন—অনেক মৃতদেহ দাহ করেছি। আজ শেষবারের মতো দাহ করবো দুটি দেহ—আমার পুত্রের আর আমার নিজের। এক চিতাশয্যায় দগ্ধ হবে দুটি দেহ।

—দুটি নয় প্রভু। তিনটি। শৈব্যা ধীরস্বরে বললেন, মনে আছে প্রভু, ফুলশয্যার রাতে তোমাকে বলেছিলাম, আমি জীবনে মরণে তোমার সহগামিনী। এবার তার পরীক্ষা হোক।

—তাই হোক শৈব্যা। এসো এক চিতাশয্যায় একই সঙ্গে বিলীন হয়ে যাই হতভাগ্য আমরা তিনজন।

হরিশ্চন্দ্র চিতায় কাঠ সাজালেন। চিতার একদিকে শান্তভাবে শুয়ে পড়লেন শৈব্যা। পাশে ছেলে রোহিতাশ্ব। হরিশ্চন্দ্র চিতার কাঠে আগুন দিয়ে ছেলের পাশে শুয়ে পড়লেন।

আগুনে কাঠ পুড়তে লাগল।

হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার হাতে হাত বেঁধে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু কোথায় মৃত্যু?

কোথায় অগ্নির দুঃসহ দহন জ্বালা ?

তার পরিবর্তে এ যে স্নিগ্ধ চন্দনের শীতল প্রলেপ সর্বাঙ্গে।

সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোতির্ময় ধর্মরাজ। পাশে ঋষি বিশ্বামিত্র।

—ওঠো রাজা হরিশ্চন্দ্র, ধর্মের পরীক্ষায় তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ। ওঠো মহারাণী শৈব্যা. পাতিব্রাত্যধর্মে তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণা।

—আমার পুত্রকে ছেড়ে আমি উঠবো না প্রভু।

—তোমার পুত্রের জীবন আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। ধর্মরাজ রোহিতাশ্বের কপাল স্পর্শ করে বললেন, ওঠো রোহিতাশ্ব।

রোহিতাশ্ব চিতাশয্যার উপর উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগল।

ধর্মরাজ হরিশ্চন্দ্রকে বললেন, আমি মানুষকে দিয়েই তো ধর্মের পরীক্ষা করি। ঋষি বিশ্বামিত্র নিমিত্তমাত্র! তোমার জয় হোক।

ধর্মরাজ মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

বিশ্বামিত্র এবার বললেন, তোমার রাজ্য তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম রাজা হরিশ্চন্দ্র। রাজ্যে ফিরে গিয়ে ধর্মে মতি রেখে রাজত্ব করো। এবার শৈব্যার দিকে ফিরে বললেন, মা শৈব্যা, দুঃসহ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে নারীধর্মের মহিমা তুমি উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছ। সর্বংসহা মহীয়সীরূপে চিরকাল তুমি বেঁচে থাকবে মানুষের হৃদয়ে। তোমার কল্যাণ হোক।

শৈব্যা নত হয়ে বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করলেন।

——— —

দুর্গতি নাশিনী গঙ্গা

চারধারে শুধু অথৈ জল জল জল আর জল।

দিকদিগন্ত জুড়ে গৈরিক জলের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। ভগীরথ নীরব নিঃস্পন্দ। ব্রহ্মলোকে এক শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে তিনি স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন সেই অনন্ত জলধারার পানে।

এই সেই গঙ্গা হরিপাদপদনিঃসৃত শৈবলিনী তরঙ্গশালিনী পতিতোর্দ্ধারিণী গঙ্গা!

ভগীরথ চোখ বুঁজে করজোড়ে গঙ্গাস্তব শুরু করলেন—

পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি
দূর-প্রচারি গিরিরাজ গুহাবিদারি
ঝংকারকারি হরিপাদ—রজোবিহারি
গাঙ্গ্যং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥

অকস্মাৎ সমস্ত দৃশ্যপট যেন পরিবর্তিত হয়ে গেল। কোথায় মিলিয়ে গেল সেই অনন্ত জলরাশি। এবার চারধারে শ্বেতশুভ্র তুষারাবৃত পর্বতমালা, গুহামুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে গৈরিক জলধারা। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী দেববর্ণিনী রমণী গঙ্গা। মুখে স্মিত হাসি নিয়ে রমণী মধুরকণ্ঠে বললেন,

—ভগীরথ, তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট। বল, তোমার কি প্রার্থনা?

ভগীরথ সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বললেন, মা, আমি তোমার অধম পুত্র। সাধনায় তোমাকে তৃপ্ত করতে পারি, এমন শক্তি আমার কি আছে?

—একমাত্র তোমারই সে শক্তি আছে, বৎস। গঙ্গার মুখে স্মিত

হাসি, তোমার ঊর্ধ্বতন তিনপুরুষের তপস্যা আমি দেখেছি। তাঁরা ব্যর্থ।

—কোন কিছুই তোমার অবিদিত নয় জননি, ভগীরথ বিনীত কণ্ঠে বললেন, সগরবংশের ষাট হাজার সন্তান ঋষিশাপে ভস্মীভূত। তোমার পবিত্র বারিস্পর্শেই তাদের সদগতি। তাই তোমাকে আমি মর্ত্যলোকে নিয়ে যেতে এসেছি মা।

—বৎস, তুমি অন্য কিছু প্রার্থনা কর। ব্রহ্মলোক ত্যাগ করে মর্ত্য-লোকে গমন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

—মা, আমার যে অন্য কোন প্রার্থনাই নেই। জ্ঞানোন্মেষের পর থেকে আমার শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ওই একটিমাত্র প্রার্থনা—তোমাকে আমি মর্ত্যলোকে নিয়ে আসব, তোমার পবিত্র বারিস্পর্শে উদ্ধার পাবে আমার পূর্বপুরুষগণ আর সেই সাথে পাপীতাপী অসংখ্য মানুষ।

—তা হয় না বৎস। মর্ত্যবাসীর অপরিমেয় পাপের ভার আমি কিরূপে বহন করব? ওই পঙ্কিল পাপস্পর্শে আমার শরীর যে বিষাক্ত হয়ে যাবে। আমার তখন কি গতি হবে?

ভগীরথ অনন্যোপায় হয়ে শ্রীহরিকে স্মরণ করলেন। আর সেই মুহূর্তে কোথা থেকে আশ্চর্য এক সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল : গঙ্গা, তুমি স্বয়ং দুর্গতিনাশিনী, পাপীতাপীর তুমি মুক্তিদাত্রী। মর্ত্যলোকে তোমার প্রবাহে অসংখ্য সাধক সন্ন্যাসী বৈষ্ণব নিত্যস্নান করবেন। তাঁদের পবিত্র সান্নিধ্যে তোমার প্রবাহের পাপ তাপ দূরীভূত হয়ে যাবে। মর্ত্যগমনে তুমি দ্বিধা করো না গঙ্গা।

সেই কণ্ঠস্বর শুনে গঙ্গা ঊর্ধ্বমুখে করজোড়ে প্রণাম করলেন। আবার শোনা গেল সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর : ভগীরথ, তোমাকে দিচ্ছি আমার বিজয়শঙ্খ। এই শঙ্খধ্বনি করে তুমি মর্ত্যলোকে গঙ্গার শুভাবতরণ ঘোষণা কর।

বলতে বলতেই বিশাল এক শ্বেতশুভ্র সুন্দর শঙ্খ ভগীরথের হাতে এসে পড়ল। ভগীরথ দুহাতে সেটি গ্রহণ করে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রণাম জানালেন।

গঙ্গা বললেন, বৎস ভগীরথ, প্রভুর আদেশ আমার শিরোধার্য। যাব আমি তোমার সঙ্গে মর্ত্যলোকে। তুমি প্রভুর ওই বিজয়-শঙ্খে আমার আগমন ঘোষণা করে অগ্রে অগ্রসর হও। আমি তোমার পশ্চাতে আসছি মর্ত্যভূমি প্লাবিত করে।

* * *

ভগীরথ বিজয়শঙ্খ ধ্বনিত করে চললেন আগে আগে। তার পিছনে আসতে লাগলেন গঙ্গা। স্বর্গ-মর্ত্যে দারুণ আলোড়ন। গঙ্গা বিগলিত করুণাধারায় মর্ত্যলোকে অবতরণ করছেন। অনন্ত জলরাশিকে তিনি সংবরণ করেছেন স্নিগ্ধ শান্ত গৈরিক স্রোতস্বিনীর মধ্যে। স্বর্গবাসীরা মহানন্দে গঙ্গার জলধারায় স্নান করে পরম পরিতৃপ্ত। তাঁরা ভগীরথের উপর পুষ্পবর্ষণ করে আশীর্বাণী উচ্চারণ করছেন: ভগীরথ, তুমি ধন্য। তোমার পুণ্যে আমরা গঙ্গার পবিত্র বারিতে স্নানের সুযোগ লাভ করেছি।

গঙ্গার প্রবাহ অবিরাম বয়ে চলেছে পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে। সুমেরু পর্বতমালার মধ্যে বিশাল গহ্বর। গঙ্গার প্রবাহ তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে আর বেরোবার পথ পায় না! গহ্বরের মধ্যে বিশাল আবর্ত সৃষ্টি করে রুদ্ধ ক্ষোভে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। ভগীরথ অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। গঙ্গাপ্রবাহের সুমিষ্ট কলধ্বনি শুনতে না পেয়ে তিনি বিস্মিত।

পিছন পানে তাকিয়ে দেখলেন, ধূ ধূ প্রান্তর। কোথায় সেই গঙ্গার গৈরিক জলধারা? তবে কি গঙ্গা আবার ব্রহ্মলোকে ফিরে গেলেন? গঙ্গা মর্ত্যলোকে না এলে পাপীতাপীর মুক্তি হবে কিরূপে? কে তাদের দুর্গতি নাশ করবে?

ভগীরথ করজোড়ে গঙ্গার উদ্দেশে স্তব শুরু করলেন: হে মাতঃ

অলকানন্দা পরমানন্দা, তুমি আমার একমাত্র গতি, তুমি আমার প্রতি করুণা বর্ষণ কর। তোমাকে না নিয়ে যেতে পারলে আমার বংশের যে গতি হবে না মা।

দূর থেকে ভেসে এল মিষ্ট কলধ্বনি কণ্ঠস্বর ঃ বৎস ভগীরথ, আমি সুমেরু পর্বতের মহাগহ্বরে বদ্ধ হয়ে রয়েছি। এই মহাগহ্বর থেকে মুক্তির পথ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

—এই অবস্থায় আমার কর্তব্য কি তুমি বলে দাও মা।

—একমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতই পারে এই মহাগহ্বর তার ভীমদন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করতে। তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে চলে যাও, তাঁকে জ্ঞাপন কর সব বার্তা। এই গহ্বরের মধ্যে আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।

—তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না মাতা। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি ইন্দ্রলোকে।

* * *

ভগীরথ চলে গেলেন ইন্দ্রলোকে।

ইন্দ্রের কাছে জ্ঞাপন করলেন সকল বৃত্তান্ত।

ইন্দ্র ভগীরথকে পাঠিয়ে দিলেন ঐরাবতের কাছে।

ইন্দ্রের ঐরাবত—দেবরাজের মহামূল্যবান ঐশ্বর্য।

দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র থেকে অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের সঙ্গে ঐরাবত সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। হস্তিকুলের রাজ-রাজেশ্বর ঐরাবত যেন এক বিশাল শ্বেতপর্বত—তার চারটি সুতীক্ষ্ণ দন্ত যেন বহুযোজন বিস্তৃত শাণিত রূপালি তরবারি।

ঐরাবত তার নিজস্ব ভবনে রাজকীয় মহিমায় উপবিষ্ট।

ভগীরথ সামনে এসে করজোড়ে বললেন, হে মহৈরাবত, হে অজেয় শক্তিধর, আপনাকে প্রণাম জানাই।

ঐরাবত তাচ্ছিল্য সহকারে ভগীরথের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তো মর্ত্যলোকের একজন মানব। তোমার ইন্দ্রলোকে আগমন কি হেতু?

—আমি সূর্যবংশের রাজা ভগীরথ। আমার পূর্বপুরুষ সগরের ষাট হাজার সন্তান মহামুনি কপিল শাপে ভস্মীভূত। তাদের উদ্ধার-হেতু আমি গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যলোকে নিয়ে আসছিলাম। পথিমধ্যে সুমেরু পর্বতের মধ্যে তিনি বদ্ধ হয়ে পড়েছেন। একমাত্র আপনিই পারেন সে গহ্বর থেকে তাঁকে মুক্ত করতে।

—সুমেরু পর্বতের গহ্বর তো তুচ্ছ, আমি গোটা সুমেরু পর্বতটাকেই উৎপাটন করতে পারি এক নিমেষে।

—তবে প্রভু, অনুগ্রহ করে চলুন আমার সঙ্গে। আমার গঙ্গা মা গহ্বরে বন্দী হয়ে বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।

—আমি তোমার মাকে উদ্ধার করতে পারি বন্দীদশা থেকে একটি শর্তে।

—কি সেই শর্ত প্রভু?

—শুনেছি গঙ্গাদেবী আশ্চর্য রূপলাবণ্যযৌবনবতী। উদ্ধার করবার পর তাঁকে এক রাত্রি আমার সান্নিধ্যে অতিবাহিত করতে হবে—তৃপ্ত করতে হবে আমার বাসনার কামাগ্নি।

ভগীরথ কানে হাত দিয়ে বললেন, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান সহচর আপনি। আপনার মুখে এ প্রস্তাব আমার কানে শোনাও পাপ। প্রয়োজন নেই আমার বংশ উদ্ধারের। আমি চললাম।

ভগীরথ চলে এলেন সুমেরু পর্বতমালার পাশে। চুপচাপ বসে থাকেন শিলাখণ্ডের উপর। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। তবে কি গঙ্গাকে তিনি নিয়ে যেতে পারবেন না? তার জন্য গঙ্গাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে এই কঠিন পাষাণ গহ্বরের মধ্যে? বিশ্ববাসীর কি তবে দুর্গতি নাশ হবে না?

সেই মহাগহ্বর থেকে কলধ্বনির মধ্য দিয়ে মিষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বৎস ভগীরথ, তুমি এত বিমর্ষ কেন?

—মা গো, তোমাকে মর্ত্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া বোধহয় আমার ভাগ্যে নেই। আমার সাধনা ব্যর্থ।

—দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত কি বললেন ?

—ঐরাবত যা বলেছেন, পুত্র হয়ে তা তোমাকে আমি বলতে পারব না মা। তুমি অন্তর্যামী, নিজেই জেনে নাও।

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল।

গহ্বরের ভিতর থেকে ভেসে এল গঙ্গার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর : বৎস ভগীরথ, ঐরাবত আপন দম্ভে আত্মস্ফীত। তাকে গিয়ে বল, আমার দুটি পূর্ণ এবং একটি অর্ধ তরঙ্গাঘাত যদি সে সহ্য করতে পারে, তবে এক রাত্রি কেন, সপ্তরাত্রি তাঁর সঙ্গে আমি সানন্দে অতিবাহিত করব। যাও, তুমি এক্ষুনি গিয়ে আমার বার্তা জানাও।

ভগীরথ গিয়ে ঐরাবতকে জ্ঞাপন করলেন গঙ্গার বার্তা। শুনে অট্টহাস্য করে উঠলেন ঐরাবত : দুটি পূর্ণ এবং একটি অর্ধ তরঙ্গাঘাত ! ওই সুন্দরী অপরূপা চঞ্চলা তন্বীর লক্ষ লক্ষ নৃত্যচঞ্চল তরঙ্গঘাত ! সহ্য করবার ক্ষমতা আমার আছে, তা জেনে রাখো।

আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে মহৈরাবত হুংকার ছাড়লেন, চল ভগীরথ। দেখি কত শক্তি ধরে সে সুমেরু পর্বতের গহ্বর।

ঐরাবত স্বর্গভূমি আলোড়িত করে এগিয়ে চললেন সুমেরু পর্বত-মালার দিকে। বিশাল শুণ্ড দিয়ে উপড়ে ফেলতে লাগলেন গিরিশৃঙ্গ। গহ্বরের কাছে এসে তীক্ষ্ণধার দাঁত দিয়ে চিরে ফেললেন গহ্বরটাকে টুকরো টুকরো করে। লাস্যময়ী তরুণীর মতো গঙ্গা বেরিয়ে এলেন পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালায় নাচতে নাচতে। প্রথম তরঙ্গাঘাতেই ঐরাবতের নাকে-মুখে-চোখে আর শুঁড়ে জল ঢুকে গেল। দ্বিতীয় তরঙ্গাঘাতে খড়কুটোর মতো ভেসে চললেন ঐরাবত। চারদিক যেন অন্ধকার। প্রাণ যায় যায়। শুধু শোনা যাচ্ছে গঙ্গার সুমিষ্ট হাস্যধ্বনি।

ঐরাবত ডুবতে ডুবতে কাতরস্বরে বললেন, রক্ষা কর মা।

গঙ্গাদেবী খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললেন, কেন, তুমি তো লক্ষ তরঙ্গাঘাত ধারণ করবার ক্ষমতা ধর।

—আমার ধৃষ্টতা মার্জনা কর মা।

—দুটি তরঙ্গের পর বাকী আছে অর্ধতরঙ্গ—এ তোমার সহনীয়।

—আমাকে রক্ষা কর মা। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

—যাও। আর অসার দম্ভ প্রকাশ করো না।

ঐরাবত জল থেকে উঠে প্রাণভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগালেন। গঙ্গা এবার কৈলাস পর্বতে প্রবাহিত হলেন। সেখান থেকে প্রচণ্ড বেগে পড়তে লাগলেন পৃথিবীর উপর। পৃথিবীর মাটি নরম। নরম মাটির পক্ষে গঙ্গার সে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করা কোন ক্রমেই সম্ভব হল না। গঙ্গার দুর্দম প্রবাহ মাটি ভেদ করে ঢুকে যেতে লাগল পাতাল দেশে।

ভগীরথ আর্তকণ্ঠে বললেন, মা গো, তবে কি তুমি মর্ত্যলোকে অবস্থান করবে না?

—বৎস ভগীরথ, আমার এই প্রচণ্ড বেগ ধারণ করবার ক্ষমতা পৃথিবীর নেই। তাই পৃথিবীর নরম-কোমল মাটি ভেদ করে আমার প্রবাহ চলে যাচ্ছে পাতাল দেশে।

—তবে উপায় কি মা?

—তুমি শিবলোকে চলে যাও। শিবের কাছে প্রার্থনা জানাও, একমাত্র তিনিই পারেন আমার প্রবাহ ধারণ করতে। শিব আমার প্রবাহ ধারণ করলে আমার বেগ হবে স্তিমিত, তখন পৃথিবীর পক্ষে আমাকে ধারণ করতে কোন অসুবিধা হবে না।

ভগীরথ চলে গেলেন শিবলোকে।

ভোলা মহেশ্বর শিব। ভগীরথের কাতর প্রার্থনায় আপন জটাজাল-বিকীর্ণ মস্তক বিস্তৃত করে দিলেন। গঙ্গার প্রবাহ সশব্দে পড়তে লাগল তার উপর, তারপর সেই দুর্দম প্রবাহ জটাজাল ভেদ করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল বসুমতীর নরম মাটির উপর।

হরিদ্বার, প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থভূমির পাশ দিয়ে গঙ্গা কলকল রবে এগিয়ে চলেছেন। মর্ত্যভূমির অসংখ্য মানুষ গঙ্গাস্নান করে পাপমুক্ত হচ্ছেন। সাধু-সন্ন্যাসীগণ গঙ্গাধারায় স্নান করে গভীর শান্তি লাভ করছেন। গঙ্গা সকলের আশ্রয়, পাপীতাপী পুণ্যবান সকলেরই তিনি মা, মর্ত্যবাসীর তিনি পরমা গতি।

ভগীরথ আগে আগে শঙ্খ বাজিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। গঙ্গা আসছেন পিছনে সকলকে উদ্ধার করতে করতে।

মাঝপথে পড়ে জহ্নুমুনির আশ্রম। মহাতেজস্বী মুনি। গঙ্গা আপন আনন্দে জহ্নুমুনির আশ্রম ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন।

জহ্নুমুনি ক্রুদ্ধ হলেন। এক গণ্ডূষে তিনি পান করে ফেললেন গঙ্গার নির্মল জলপ্রবাহ।

ভগীরথ আগে আগে যাচ্ছিলেন। গঙ্গাকে না দেখতে পেয়ে পিছন দিকে ফিরে এসে জহ্নুমুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মুনিবর, আপনি মা গঙ্গাকে দেখেছেন?

জহ্নুমুনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, তোমার মা গঙ্গা আমার উদরে। আমার আশ্রম ভাসিয়ে দিয়েছে তার প্রবাহ, তাই আমি তাকে পান করে উদরে রেখে দিয়েছি।

ভগীরথ জহ্নুমুনির ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত। তার উদ্দেশে স্তব করে বললেন, তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি শিব। তুমি যদি করুণা না কর, তবে আমার তপস্যা হবে ব্যর্থ, আমার বংশের আর উদ্ধার হবে না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

জহ্নুমুনি বললেন, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি ভগীরথ। তবে গঙ্গার জল আমি পান করেছি। আবার তা মুখ দিয়ে উগরে দিলে সে জল উচ্ছিষ্ট হয়ে যাবে, তার উপর মানুষের কোন ভক্তি থাকবে না। আমি আমার জানু চিরে গঙ্গার জলধারা বের করে দিচ্ছি।

জহ্নুমুনি আপন জানু চিরে ফেললেন। সেই জানুর পথ দিয়ে

গঙ্গাপ্রবাহ বিপুল বেগে বেরিয়ে এল। জানু চিরে বের করার জন্য গঙ্গার নাম হল জাহ্নবী।

ভগীরথের পিছন পিছন আবার গঙ্গা এগিয়ে যেতে লাগলেন।

* * *

ভগীরথ এসে উপস্থিত হলেন গৌড়দেশে।

এবার তিনি যাবেন কপিল মুনির আশ্রমের পানে। গৌড়ের সীমানায় পদ্ম নামে মহা তেজস্বী এক মুনি জেদ ধরে বসলেন, গঙ্গাকে তিনি নিয়ে যাবেন পূর্ব বাংলায় তাঁর দেশে।

ভগীরথ জোড়হাতে তাঁকে অনুনয় বিনয় করলেন। মুনি কথা শোনেন না। গঙ্গাকে তিনি পূর্ব বাংলায় নিয়ে যাবেনই। পূর্ব বাংলার পাপীতাপী উদ্ধার পাবে গঙ্গার বারিতে স্নান করে।

ভগীরথও তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল। গঙ্গাকে তিনি নিয়ে যাবেন দক্ষিণদেশে-কপিলমুনির আশ্রমে যেখানে দিগন্ত বিস্তৃত বালুকারাশির সঙ্গে মিশে রয়েছে যাট হাজার সগর সন্তানের ভস্মরাশি।

দুজনেই গঙ্গাদেবীকে নিয়ে যেতে চান। জটিল সমস্যা। অবশেষে গঙ্গাই সে সমস্যার সমাধান করে দিলেন। নিজের শরীর থেকে সৃষ্টি করলেন আর এক তন্বী তরুণী চঞ্চলা উচ্ছলা।

গঙ্গা পদ্মমুনিকে বললেন, তুমি এই চঞ্চলা ধারাকে নিয়ে যাও তোমার দেশে। এর প্রবাহে স্নান করলে আমারই প্রবাহে স্নান করার ফল হবে।

পদ্মমুনি গঙ্গার সেই চঞ্চলা প্রবাহকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের দেশে—তার নাম হল পদ্মা।

ভগীরথ এগিয়ে চললেন গৌড়ভূমির উপর দিয়ে। সপ্তদ্বীপ হয়ে নবদ্বীপ পাশে রেখে গঙ্গা এগিয়ে চললেন। এবার তার নাম ভাগীরথী।

সপ্তগ্রাম মাহেশ পার হয়ে গঙ্গা এগিয়ে চললেন দক্ষিণ থেকে আরো দক্ষিণে।

লক্ষ লক্ষ নরনারী গঙ্গার পবিত্র বারিতে স্নান করে মহানন্দে তার জয়ধ্বনি দিল ঃ জয় ! গঙ্গামাতার জয়।

গঙ্গা কলকল রবে এগিয়ে চলেন। এখন আর তার সেই পার্বত্য তরঙ্গাঘাত নেই, নেই মন্দ্রমুখর গর্জন। এখন যেন গঙ্গা স্তিমিত ক্লান্ত।

ভগীরথ জিজ্ঞাসা করেন, মাগো, এ দেশের কাদামাটির উপর দিয়ে চলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে? পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার চলা অভ্যাস।

গঙ্গা হেসে বলেন, আগে কষ্ট হত। এখন আর হয় না। আমি যে এ দেশের মানুষকে ভালোবেসে ফেলেছি। এ দেশের মানুষ বড় অসহায় বাবা।

—সত্যি বলেছো মা, এ দেশের মানুষ বড় অসহায়। তারা জপতপ জানে না, স্বর্গের সন্ধান রাখে না, পাপতাপ থেকে তাদের মুক্তির কোন উপায় ছিল না। এখন তুমি তাদের একমাত্র গতি। তুমি এদের কোনদিন ত্যাগ করো না মা। কথা দাও।

—কথা দিচ্ছি বৎস, আমি কোনদিন গৌড়ভূমি ত্যাগ করে যাবো না।

ভগীরথ অবশেষে এসে পৌঁছোলেন দক্ষিণ প্রত্যন্তে কপিল মুনির আশ্রমের সম্মুখে। এখানে বহু যোজনব্যাপী স্থান জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তার পূর্বপুরুষদের ভস্মরাশি।

সম্মুখে সাগর যেন কি এক রুদ্ধরোষে গর্জন করে চলেছে অবিরত। নীল তরঙ্গরাশি ফেনোচ্ছলতায় ছড়িয়ে পড়ছে তটভূমিতে।

ভগীরথ পিছন পানে তাকালেন।

পুণ্য জলধারা চারধারে ছড়িয়ে গঙ্গা এগিয়ে আসছেন সম্মুখে। দেখতে দেখতে শতসহস্র ধারায় গঙ্গাদেবী প্লাবিত করে দিলেন যুগযুগান্ত ধরে পড়ে থাকা শুষ্ক রুক্ষ অভিশপ্ত ভস্মরাশি। সগরের ষাট হাজার

সন্তানের অভিশপ্ত ভস্মরাশি গঙ্গার নির্মল পবিত্র জলধারায় বিলীন হয়ে যেন এক পরম শান্তির মধ্যে সদ্গতি প্রাপ্ত হল।

অকাশ-বাতাস কম্পিত করে ধ্বনি উঠল : ধন্য ভগীরথ, তুমি ধন্য। তোমার সাধনায় দুর্গতিনাশিনী গঙ্গা সকলের দুর্গতি নাশ করছেন। ধন্য তোমাব সাধনা।

ভগীরথ করজোড়ে গঙ্গার স্তব করতে লাগলেন।

গঙ্গাদেবী স্মিত হেসে মুহূর্তের মধ্যে নৃত্যচঞ্চল ভঙ্গীতে সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে লীন হয়ে গেলেন অনন্ত অসীম সুনীল জলরাশির মধ্যে।

ইন্দ্রনীলা ইন্দুমতী

মগধ রাজকন্যা ইন্দুমতী।

অপরিমেয় রূপসৌন্দর্য দিয়ে গড়া তিলোত্তমা রমণী।

শুধু কি রূপ সৌন্দর্য? সর্বগুণের আধার রাজকন্যা ইন্দুমতী। মগধরাজ তাকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করেছেন। কন্যার সঙ্গে তিনি সকল বিষয়ে আলোচনা করেন।

ইন্দুমতীর রূপগুণের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত। বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবৃন্দ প্রতিদিন দূত পাঠাচ্ছেন মগধরাজের কাছে। প্রার্থনা তাঁদের একটিই—ইন্দুমতীকে পত্নীরূপে পেলে তাঁরা ধন্য হবেন।

দিনের পর দিন দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে করতে মগধরাজ কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেন।

একদিন কন্যাকে ডেকে বললেন, মা ইন্দুমতী, তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছো। এখন তোমার বিবাহদান আমার কর্তব্য। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি বল।

ইন্দুমতী হেসে বললেন, আমার অমত নেই পিতা। পিতৃগৃহে অবস্থান করবার নির্দিষ্ট সময় আমি পার হয়ে এসেছি, এবার পতিগৃহে বসবাস করাই শ্রেয় মনে করি।

মগধরাজ সন্তুষ্ট হলেন কন্যার জবাব শুনে। কন্যাকে তিনি এরূপ স্পষ্টভাষিণী করেই বড় করে তুলেছেন। তিনি খুসি হয়ে বললেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা আমার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। দূতের মুখে তাদের সম্বন্ধে যে বিবরণ শুনেছি, তা থেকেই একজনকে তোমায় পতিরূপে নির্বাচন করতে হবে।

—শ্রুতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছলনা করে পিতা। শ্রুত বিবরণে আমার

আস্থা নেই, আমি দর্শনে বিশ্বাসী। আগে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারী।

—উত্তম বলেছো কন্যা। মগধরাজ কন্যাকে সাধুবাদ জানালেন, আমি এক একজন করে রাজাকে আমার রাজ্যে আমন্ত্রণ জানাই। তাঁরা এলে তাদের তুমি দর্শন কর, তারপর মনস্থির কর।

—এ তো অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হবে পিতা, তার চেয়ে আপনি আমার স্বয়ংবরের আয়োজন করুন। আমি স্বয়ংবরা হতে চাই।

—সে তো ভালো কথা মা। কিন্তু—মগধরাজের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে, স্বয়ংবরের আয়োজন করা যে জটিল ব্যাপার। একসঙ্গে অসংখ্য রাজার সমাবেশ—মুহূর্তে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্ভাবনা—অতীতে অনেকবার এরকম ঘটেছে।

—দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভয়ে কি শ্রেয়লাভের আশা ত্যাগ করা উচিত পিতা ?

—না মা। তুমি ঠিকই বলেছো। মগধরাজ লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, স্বয়ংবর সভার মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ বরার্জন সম্ভব। আমি আগামী কালই দিকে দিকে স্বয়ংবরসভা আহ্বানের বার্তা প্রচার করে দেবার ব্যবস্থা করছি।

* * *

মগধরাজ পরদিন থেকেই ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

রাজকন্যার স্বয়ংবর। সমগ্র মগধরাজ্য উৎসব সমারোহে সজ্জিত হল। গৃহে গৃহে আনন্দ কল্লোল।

শ্রেষ্ঠ রাজন্যবৃন্দের কাছে পৌঁছে গেল মগধরাজের আমন্ত্রণ লিপি। রাজ্যে রাজ্যে পড়ে গেল সাড়া।

ইন্দুমতীর রূপলাবণ্য ও গুণের খ্যাতি বহুবিস্তৃত। শ্রেষ্ঠ রাজন্য-

বৃন্দ তাকে পত্নীরূপে পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এখন মগধরাজের আমন্ত্রণলিপি পেয়ে তাঁরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নিজ নিজ লোক-লস্কর নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পোশাক ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে মগধ রাজ্যে উপস্থিত হতে লাগলেন।

* * *

নির্দিষ্ট দিনে শুরু হল রাজকন্যা ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভা। সুবিশাল সুসজ্জিত কক্ষে স্বর্ণসিংহাসনে বসে আছেন বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবৃন্দ। অপরূপ তাদের বেশভূষা। সর্বাঙ্গে মহামূল্যবান মণিরত্নের অলংকার। সকলেই যেন নিজ নিজ রত্নালংকার ও রূপ প্রদর্শনে ব্যগ্র। সকলের মনে ধারণা তিনিই সর্বোত্তম।

এরই মাঝে সেখানে প্রবেশ করলেন অযোধ্যার রাজা অজ। মহাপরাক্রমশালী রাজা রঘুর পুত্র তিনি। পরম রূপবান কন্দর্পকান্তি তরুণ যুবক, শৌর্যবীর্য ও লাবণ্যের আশ্চর্য সমাবেশ তার যৌবনদীপ্ত পৌরুষমণ্ডিত আকৃতিতে।

রাজা অজের রাজকীয় পদক্ষেপেই তাঁর গৌরব ও মহিমা বিচ্ছুরিত। তার আগমনে অন্যান্য রাজন্যবৃন্দের দীপ্তি যেন এক নিমেষে স্তিমিত হয়ে গেল।

রাজা অজ গর্বিত অথচ বিনম্র পদক্ষেপে নির্দিষ্ট স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করলেন।

মনে হল পশুরাজ সিংহ যেন অরণ্যের পশুদের সভায় প্রবেশ করলেন।

মগধরাজ করজোড়ে নিবেদন করলেন. হে মহাসম্মানিত রাজন্যবৃন্দ, আপনাদের আগমনে আমার এ মগধরাজ্য ধন্য হল। আমার কন্যা ইন্দুমতী স্বয়ংবরা হতে অভিলাষিণী। সমবেত রাজন্যবৃন্দের মধ্যে যাকে সে পতিরূপে নির্বাচন করবে, তিনি হবেন আমার জামাতা।

—সাধু! সাধু! উপস্থিত রাজন্যবৃন্দ একযোগে বলে উঠলেন।

—আপনাদের অনুমতি পেলে আমার কন্যাকে এ স্বয়ংবর সভায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি।

সমবেত রাজন্যবৃন্দ হাত তুলে অনুমতি দিলেন।

মগধরাজ এবার নির্দেশ পাঠালেন ইন্দুমতীকে স্বয়ংবর সভায় নিয়ে আসবার জন্য।

কিছুক্ষণের মধ্যে সহচরীদের সঙ্গে সভাস্থলে প্রবেশ করলেন ইন্দুমতী। শত শত রাজন্যবৃন্দের দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। তাঁরা মুগ্ধ বিস্মিত স্তম্ভিত। নারী এত রূপবতী হতে পারে! এ তো মানবী নয়, স্বর্গলোকের অপ্সরা। দেবরাজ ইন্দ্রের দেবসভার শ্রেষ্ঠ রূপসী। দীঘল দেহে কমনীয় যৌবনোচ্ছ্বাস। আয়ত আঁখির কোণে মদির কটাক্ষ। বহুমূল্য রত্নালংকারখচিত অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণে সুসজ্জিতা ইন্দ্রনীলা ইন্দুমতী! পিছনে শ্রেণীবদ্ধ রূপবতী সহচরিবৃন্দ। প্রধানা সহচরীর হাতে ধরা স্বর্ণথালিকায় সুন্দর অপরূপ বরমাল্য সাজানো।

রাজকন্যা ইন্দুমতী উপবিষ্ট রাজন্যবৃন্দের সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। স্বচ্ছন্দ সাবলীল মনোহর তাঁর গতি। যখন যে রাজার সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেই রাজার চৈতন্য তখন বিলুপ্তপ্রায়।

ইন্দুমতী যে রাজাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছেন, দুঃখে-শোকে তার অবস্থাও যেন মৃতপ্রায়। যেন ইন্দুমতীর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের প্রাণসত্তাটিও যেন অন্তর্হিত।

ইন্দুমতী কিন্তু কোনদিকে তাকিয়ে দেখছেন না। যেন একটি স্বপ্নের ঘোরে তিনি স্বপনপরীর মতো হেঁটে চলেছেন। আর চলতে চলতে এক সময় গতি হল তার স্তব্ধ। ঠোঁটের কোণে সুমিষ্ট সুস্মিত হাসির রেখা। চোখে বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

সম্মুখে স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট স্বর্ণকান্তি রাজা অজ। তার চোখেও সেই একই বিস্মিত বিমুগ্ধ আর বিভ্রান্ত দৃষ্টি সম্পাত। ইন্দুমতীকে দেখে তিনি যেন কোন সুদূর অতীতে ডুব দিয়েছেন। অতীতের

তলদেশ থেকে কি যেন তুলে আনবার চেষ্টা করছেন। ইন্দুমতী ক্ষণিকের জন্য তার সম্মুখে যুক্তকর হলেন, তারপর নির্দ্বিধায় নিঃশঙ্কোচে সহচরীর স্বর্ণথালিকা থেকে বরমাল্য তুলে নিয়ে অপূর্ব লীলায়িত ভঙ্গীতে রাজা অজের গলায় পরিয়ে দিলেন। যেন তাঁরই প্রত্যাশায় তিনি এতদিন প্রতীক্ষা করে ছিলেন। রাজার পানে তাকিয়ে মিষ্টকণ্ঠে বললেন, আর্যপুত্র, আপনার গলে বরমাল্য দান করে আমি স্বয়ংবৃতা হলাম।

রাজা অজ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, তোমাকে পত্নীরূপে পেয়ে আমিও ধন্য হলাম সুকল্যাণি।

সেই মুহূর্তে চারদিকে বেজে উঠল বিবিধ বাদ্যযন্ত্র। মগধরাজ পাত্রমিত্র অমাত্যবৃন্দ সহ এগিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, হে মাননীয় রাজন্যবৃন্দ, আজ আমার বড় সুখের দিন। আমার কন্যা ইন্দুমতী অযোধ্যার রাজা অজকে পতিরূপে নির্বাচন করেছে। এর পর শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী উভয়ের পরিণয় পর্ব সুসম্পন্ন হবে। আপনাদের সকলকেই আমি সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আপনাদের আতিথেয়তার আয়োজন করা হয়েছে।

তিনদিন ধরে মগধরাজ্য জুড়ে রাজকন্যা ইন্দুমতীর বিবাহ উৎসব। শাস্ত্রাচার অনুযায়ী মগধরাজ অযোধ্যার রাজা অজের হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেন। যৌতুকস্বরূপ দিলেন মহামূল্যবান রত্নালংকার, অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব।

রাজা অজ ও ইন্দুমতী—দুজনে দুজনকে পেয়ে যেন আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে রইলেন।

রাজা অজ ইন্দুমতীর পানে তাকিয়ে বলেন, স্বয়ংবর সভায় তোমাকে যখন প্রথম দেখলাম, মনে হল তুমি যেন জন্মজন্মান্তরে আমার পত্নী। আমার দৃষ্টি ছিল তোমার অসামান্য রূপ সৌন্দর্যের প্রতি, কিন্তু আমার হৃদয় গিয়েছিল অন্য এক জগতে হারিয়ে।

ইন্দুমতী হেসে বলেন, আমারও সেই একই অবস্থা। স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করেই তোমার পানে দৃষ্টি পড়ায় আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হল, এই তো সেই দেবতা যাকে আমি কতদিন স্বপ্নের মধ্যে দেখেছি, মনে হল এ আমার চির চেনা। তাই আমি কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা তোমার পানেই এগিয়ে এসেছিলাম।

রাজা অজ হেসে পত্নীর সুকুমার চিবুকটি তুলে ধরে বললেন, আগে বল তো এর রহস্যটি কোথায়? তুমি কি সত্যিই গতজন্মেও আমার পত্নী ছিলে?

—গত জন্মে কেন? ইন্দুমতী স্বামীর বুকে মুখ রেখে গাঢ়স্বরে বললেন, জন্মজন্মান্তর ধরে আমি তোমার পত্নী—জন্ম জন্ম ধরে আমাদের অচ্ছেদ্য ভালোবাসার বন্ধন।

—এখন মনে হচ্ছে এতদিন তোমাকে ছেড়ে আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করেছি। অজ পত্নীর কুসুম কোমল মুখে চুম্বন রেখা এঁকে দিলেন।

—আমিও একই কথা ভাবছি স্বামী। তোমার বিরহ আমি এতদিন কিরূপে সহ্য করেছি।

—আর সহ্য করতে হবে না প্রিয়ে, অজ হেসে বলেন, এখন থেকে জীবনেও আমরা দুজন বদ্ধ আর মৃত্যুর মধ্যেও একইরূপে বদ্ধ।

—আমি তোমার আগে মরতে চাই নাথ। ইন্দুমতীর চোখে অশ্রুরেখা, তোমার বিচ্ছেদবেদনা আমাকে যেন সহ্য করতে না হয় এই আশীর্বাদ কর।

—তাই হোক সতী, রাজা অজ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, তবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও এ দেহ ত্যাগ করব একথা বলে রাখছি।

ইন্দুমতী নিবিড়ভাবে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। অজও তাকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিলেন।

মিলনের মধ্যেও বিরহের ব্যাকুল বেদনা তুজনকেই অশ্রু-অভিষিক্ত করে তুলল।

*　　*　　*

তিন দিন পর রাজা অজ নব পরিণীতা বধূকে নিয়ে যাত্রা করলেন অযোধ্যার পানে। হস্তী অশ্ব লোক-লস্কর নিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা আগেই রওনা দিয়েছে।

রাজা অজ ইচ্ছা করেই সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে যাননি। দ্রুতগামী রথে চড়ে তিনি পত্নীকে নিয়ে একাকী যাবেন--যেতে যেতে ইন্দুমতীকে অযোধ্যা রাজ্যের সব কিছু দেখাবেন—এই তাঁর ইচ্ছা।

এক শুভক্ষণে পত্নীকে নিয়ে তিনি রথে উঠে অশ্বের পিঠে কশাঘাত করলেন। রথ ছুটতে লাগল উল্কার মত।

ইন্দুমতী স্বামীর রথচালনা নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ। পার্বত্য বন্ধুর পথে রথ ছুটে চলেছে, অথচ চালননৈপুণ্যে মনে হচ্ছে মসৃণ রাজপথে রথ গড়িয়ে চলেছে।

যাত্রাপথের তুধারে সুনীল সুন্দর পর্বতমালা, পার্বত্য নদী, ঝরণা, ধাবমান হরিণ, যূথবদ্ধ হস্তী বাহিনী প্রভৃতি পশু।

অজ রাজা ইন্দুমতীকে সব দেখান, ইন্দুমতী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

রাজা অজ যেমন তুঃসাহসিক তেমনি নতুনত্বপ্রিয়। তাঁর মনের মধ্যে সর্বদা সজীব তারুণ্যের চাঞ্চল্য। তার সেই চঞ্চলতা স্পর্শ করেছে ইন্দুমতীকে। তুজনেই এই রথযাত্রার আনন্দে মগ্ন।

অপরাহ্নের শেষ আলোকশিখা পর্বতমালার ওপারে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্লান্ত দেহে অজ ইন্দুমতীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। সুশিক্ষিত অশ্ব নির্দিষ্ট পথে নির্বিঘ্নে চলতে লাগল। ইন্দুমতী পরম

প্রীতিভরে রাজার সুন্দর ললাটে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। রাজা মধুর শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অকস্মাৎ নিবিড় অরণ্যের মধ্যে একে একে অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠল। মশালের আলোকধারায় সমস্ত বনভূমি হয়ে উঠল আলোকিত।

সেই আলোকে ইন্দুমতী দেখলেন: বনের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে স্বর্ণমুকুটধারী অসংখ্য রাজকীয় চেহারার মানুষ দণ্ডায়মান। চোখে তাদের নিষ্ঠুর পৈশাচিক দৃষ্টি।

এরা কারা? কি চায় এরা?

ইন্দুমতী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

রথ ছুটে চলেছে সামনের দিকে।

হঠাৎ বনভূমি কম্পিত করে অট্টহাসির ঝড় বয়ে গেল। সেই সঙ্গে শোনা গেল ভীমকণ্ঠে গর্জন: ওরে মূর্খ অজ, তুই কি ভেবেছিস, তুই ওই বরবর্ণিনী তিলোত্তমা ইন্দুমতীকে রাজ্যে নিয়ে গিয়ে নিজে উপভোগ করবি? সে হতে দেব না। তোকে হত্যা করে ইন্দুমতীকে আমরা নিয়ে যাবো। ইন্দুমতী আমাদের ভোগ্যা।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ইন্দুমতীর কাছে। এরা তাহলে সেই সব বীর পুরুষ রাজা যারা তাকে না পেয়ে বনের মধ্যে কাপুরুষের মতো লুকিয়ে আছে তাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য। স্বয়ংবরসভায় প্রত্যাখ্যাত হবার প্রতিশোধ এরা এইভাবে নিচ্ছে! ন্যায়নীতি বিবেকধর্ম এরা বিসর্জন দিয়েছে। ধিক! এরা তো পশুরও অধম।

এখন উপায় কি? ইন্দুমতী জানেন তার স্বামী মহাবীর। কিন্তু এতগুলো সশস্ত্র রাজার বিরুদ্ধে তার স্বামী একাকী কি করবেন? বিশেষ করে রথের উপর যে অস্ত্রশস্ত্র আছে তা তো সামান্য। অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে বিশাল এক ধনুক আর কয়েকটি মাত্র অদ্ভুত গঠন বাণ।

অন্যদিকে মশালের আলোকে ইন্দুমতী স্পষ্ট দেখতে পেলেন, অসংখ্য রাজার ভয়ংকর চেহারা—প্রত্যেকের হাতেই নানাধরনের অস্ত্র। ভাবতে ভাবতে ইন্দুমতী বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তাহলে কি আজকেই সব শেষ? তার স্বামীকে বধ করে এরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে? শেষ পর্যন্ত তাকে হতে হবে কামার্ত পশু-ভোগ্যা?

না—না—কিছুতেই না।

প্রাণ থাকতে না। যদি সত্যই সেরকম কিছু ঘটে, তবে ইন্দুমতী স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। স্বামীর ওই তীক্ষ্ণধার তরবারি মুহূর্তের মধ্যে বক্ষে বিদ্ধ করে তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবেন।

ওদিকে বনের মধ্যে ক্রুদ্ধ কর্কশ গর্জন আরো ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, ওরে মূর্খ অজ, শেষবারের মতো ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর।

ইন্দুমতী এবার অজকে ডাকলেন, ওগো শুনছো, স্বয়ংবর সভার সেইসব প্রত্যাখ্যাত রাজারা দলবদ্ধভাবে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। ওরা তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তুমি ওঠো।

অজর মধ্যে উঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যে ভাবে ঘুমিয়ে ছিলেন, সেই ভাবেই ঘুমিয়ে রইলেন।

ওদিকে ক্রুদ্ধ কর্কশ কোলাহল আরও নিকটবর্তী। যেন বিশাল এক পশুবাহিনী কর্কশ কোলাহল করতে করতে এগিয়ে আসছে।

ইন্দুমতী আবার স্বামীকে একটু ঠেলা দিলেন, ওগো তুমি ওঠো। ওরা যে এগিয়ে আসছে। তোমাকে ওরা বধ করবে সে আমি দেখতে পারবো না। তার আগে আমি আত্মঘাতী হবো। ইন্দুমতী রাজার তরবারি কোষমুক্ত করতে গেলেন।

অজ ধরে ফেললেন তার হাত। হেসে বললেন, এত উদ্বিগ্ন হলে কেন প্রিয়ে? অজ রাজার পত্নীর তো এত উদ্বিগ্ন হওয়া সাজে না।

ইন্দুমতী কাতরস্বরে বললেন, উদ্বিগ্ন না হয়ে কি করব? অসংখ্য সশস্ত্র রাজা চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। কোন দিকে পালাবার পথ নেই।

—রঘু রাজার পুত্র অজ যাবে কতকগুলি কাপুরুষ কুকুরের ভয়ে পালিয়ে? তুমি চুপ করে বস রথের উপর। দ্যাখ আমি কি করি।

অজ এবার উঠে বসে নিমেষে রথ নিয়ে গেলেন রাজাদের সামনে। মুহূর্তে অসংখ্য ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল যেন পাশব উল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

অজ তূণীর থেকে অদ্ভুতদর্শন একটি বাণ বেছে নিয়ে ধনুকে জ্যা টেনে নিক্ষেপ করলেন রাজাদের লক্ষ্য করে।

মুহূর্তের মধ্যে সেই বাণ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে অদ্ভুতগঠন যান্ত্রিক শরীর সৃষ্টি হতে লাগল, আর সেই শরীরগুলি নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজন্যবৃন্দের উপর।

সমস্ত বনভূমিতে ধ্বনিত হতে লাগল কাতর করুণ আর্তনাদ: রক্ষা কর, রক্ষা কর।

মশালগুলো নিভে গেছে। বনভূমি জুড়ে চলছে তাণ্ডব ধ্বংসলীলা। বনভূমি যেন গাঢ় অন্ধকারে ভয়ংকর দ্বন্দ্ব সংঘাত ও হত্যালীলায় প্রেত-ভূমি হয়ে পড়ল।

অজ গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: গন্ধর্ব বাণের যান্ত্রিক শারীর নিষ্পেষণে ওরা নিজেরাই নিজেদের হত্যা করছে। মৃত্যু ওদের নিয়তি। তিনি এবার অযোধ্যার পানে রথ ছুটিয়ে দিলেন।

* * *

অজ ইন্দুমতীকে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। ইন্দুমতীর অসামান্য রূপে শুধু রাজপ্রাসাদ নয়, সমগ্র রাজ্যও যেন সৌন্দর্যে শোভায় ঝলমল করতে লাগল। রাজা অজ আর রাণী ইন্দুমতীর নিবিড় প্রেম বন্ধন যেন মানুষের গল্পকথা হয়ে দাঁড়াল। সবার মুখে

আজ ইন্দুমতীর প্রেমকথা। অজ যেন এক মুহূর্তের জন্যও ইন্দুমতীকে ছাড়তে চান না। ইন্দুমতীও স্বামীর ক্ষণকালীন বিচ্ছেদও সহ্য করতে পারেন না।

ইন্দুমতী এবার জননী হলেন। সুন্দর সুশ্রী পুত্র হল তার। নাম রাখা হল দশরথ।

অজ হেসে ইন্দুমতীকে বললেন, এবার তবে তোমার আমার ভালোবাসার মধ্যে এক ভাগীদার এল।

—কেন? ইন্দুমতী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন।

অজ শিশুর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ওই শিশুই তো তোমার ভালোবাসার অনেকখানি আদায় করে নেবে।

—কিছুমাত্র না। ইন্দুমতী গাঢ় স্বরে স্বামীকে বললেন, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসায় সন্তানও ভাগ বসাতে পারবে না।

—সন্তান না পারুক, একজন তো পারবে। অজ হেসে বললেন।

—কে সে?

—মৃত্যু। অজ হাসতে হাসতে বললেন, মৃত্যু এসে একদিন না একদিন দুজনকে আলাদা করে দেবে।

—মৃত্যুও পারবে না। ইন্দুমতী দৃঢ়স্বরে বললেন, তোমার প্রতি অগাধ ভালোবাসা নিয়েই আমি চলে যাবো।

—তোমার আগেই আমি যাবো।

—অসম্ভব। ছাখো, কি ঘটে।

* * *

এর কিছুদিন পর ইন্দুমতী পুষ্পোদ্যানে বসে মালা গাঁথছিলেন। অদূরে শিশু দশরথ শায়িত। অজ ইন্দুমতীর জন্য একটি পুষ্পবৃক্ষতলে সুন্দর পুষ্প চয়নে ব্যস্ত। এই পুষ্প তিনি ইন্দুমতীর সুন্দর কেশদামে জড়িয়ে দেবেন। অকস্মাৎ একটি আর্ত চীৎকার শুনে অজ ফিরে তাকালেন।

ইন্দুমতী মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। অজ নিজেও আর্তনাদ করে তড়িত বেগে ছুটে এলেন ইন্দুমতীয় কাছে।

ইন্দুমতী মাটির উপর শুয়ে আছেন। নীরব নিঃস্পন্দ দেহ। চারধারে নানা রকম ফুল ছড়িয়ে আছে।

ইন্দুমতীর পেলব সুন্দর বুকের উপর পড়ে আছে একগাছি মালা। আশ্চর্য সুন্দর ফুলের মালা। সেই ফুলের মালা থেকে তীব্র সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

রাজা অজ দেখেই চিনতে পারলেন, এ হল পারিজাত ফুলের মালা। দেবরাজ ইন্দ্রের নন্দনকাননের শ্রেষ্ঠ ফুল পারিজাত। এ ফুল শুধু দেবভোগ্য। মর্ত্যবাসী এ ফুল সহ্য করতে পারে না। স্পর্শমাত্র মৃত্যু হয়। এই পারিজাত ফুলের মালাগাছি ইন্দুমতীর মৃত্যু ডেকে এনেছে।

অজ রাজার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগেই আকাশপথে তিনি দেবর্ষি নারদকে চলে যেতে দেখেছেন। তার কণ্ঠে দুলছিল এই মালা। সেই মালাই কণ্ঠচ্যুত হয়ে এসে পড়েছে ইন্দুমতীর শরীরে। আর তার ফলে অকালে ঝরে গেল আর একটি সুন্দর ফুল।

অজ ইন্দুমতীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। ইন্দুমতী কথা রেখেছে। তার আগেই সে মৃত্যুপথের যাত্রী হল। তাঁর বিরহ তাকে সহ্য করতে হল না।

ইন্দুমতীর বিরহ অজও সহ্য করতে পারবেন না। এই কান্নার সময়টুকুই মনে হচ্ছে কত যুগ যুগান্ত।

অজ মুহূর্তের মধ্যে পারিজাত মালা নিজের হাতে তুলে নিলেন। পারিজাত স্পর্শে তার শিরায় শিরায় কোষে কোষে শুরু হল বিদ্যুৎ তরঙ্গের খেলা। তীব্র গন্ধে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

অজ প্রাণহীন দেহে লুটিয়ে পড়লেন ইন্দুমতীর পাশে॥

— ০ —

কুশলকারিণী কৌশল্যা

কোশলরাজের আদরিণী কন্যা কৌশল্যা।

শান্তস্নিগ্ধ কমনীয় রূপসৌন্দর্যের অধিকারিণী। সৌন্দর্যের মধ্যে উগ্রতা নেই, আছে বিনম্র কোমলতা।

পিতামাতার আদরিণী কন্যা। তারা তাকে কাছ ছাড়া করতে চান না। তাই প্রথম দিকে কন্যার বিবাহ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হননি। কন্যা পরিণত বয়স্কা হতে কোশলরাজ তার বিবাহ দিতে তৎপর হলেন।

কুলে শীলে মানে কৌশল্যার উপযুক্ত পাত্র কোথায়? দিকে দিকে প্রেরিত হল দূত।

দূতের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল, অযোধ্যার রাজা দশরথ সর্বাংশে কৌশল্যার উপযুক্ত পাত্র। দশরথ প্রবল পরাক্রমশালী বীর নৃপতি। তিনিও মধ্যবয়স্ক। কৌশল্যার সঙ্গে তাঁর রাজযোটক।

কোশলরাজ এবার রাজা দশরথের কাছে ব্রাহ্মণ পুরোহিত পাঠালেন কন্যার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে।

দশরথ সাগ্রহে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তারপর এক শুভদিনে পাত্রমিত্র অমাত্য সেনাপতি ও লোকজন সহ উপস্থিত হলেন কোশল রাজ্যে। মহাসমারোহে কোশল রাজকন্যা কৌশলার সঙ্গে অযোধ্যার রাজা দশরথের বিবাহ সুসম্পন্ন হল।

কোশলরাজ জামাতাকে যৌতুকস্বরূপ প্রচুর উপঢৌকন দিলেন।

বিবাহের তিনদিন পর দশরথ নবপরিণীতা পত্নীকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন।

*　　　*　　　*

বিবাহের পর কয়েক বছর কেটে গেল। কৌশল্যার কোন সন্তান

হল না। দশরথের মনে সুখ নেই। অপুত্রক রাজা সুখী হন না। পুত্র যদি না থাকে, কে ভোগ করবে রাজকীয় বিপুল ঐশ্বর্য? গৌরব-গরিমামণ্ডিত সূর্যবংশ কি তবে এবার বিলুপ্ত হবে?

দশরথের বিক্ষুব্ধ অন্তরের সন্ধান রাখেন কৌশল্যা। দশরথকে তিনি কোন সন্তান উপহার দিতে পারেননি, এ যেন তাঁর বিরাট লজ্জা। তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিলেন স্বামীর কাছ থেকে। এখন পুরজনের দেখাশোনা আর দেবসেবা নিয়েই অধিকাংশ সময় কেটে যায় তাঁর।

বাল্যকাল থেকেই কৌশল্যা ধীর স্থির শুদ্ধচিত্তা। নিজের চেয়ে অন্যের কল্যাণ সাধনেই তাঁর বেশী আনন্দ। সকলের কুশলেই তাঁর গভীর তৃপ্তি। স্বামী যে দুর্দান্ত ভোগী পুরুষ, তা তার অজানা নয়। স্বামীর আরও অসংখ্য অপ্রধান পত্নী আছে, তা তিনি জানেন। কিন্তু তা নিয়ে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র ব্যথা বা দুঃখ নেই।

স্বামীর দুর্দম বহ্নিবাসনা চরিতার্থ করবার সাধ্য তাঁর নেই, এবং সম্ভবত প্রবৃত্তিও নেই। তাই স্বামীর জন্যে কৌশল্যার মনের মধ্যে আছে এক ধরনের সহানুভূতি ও করুণা।

পুত্রের জন্য স্বামীর আকুলতা দেখে তিনি স্নিগ্ধকণ্ঠে স্বামীকে বলেন, আর্যপুত্র, তুমি আবার বিবাহ কর। পুনর্বিবাহে তুমি নিশ্চয় পুত্রের পিতা হতে পারবে।

—পুনর্বিবাহ তুমি সহ্য করতে পারবে রাণী?

—তোমার জন্য আমি সব কিছু সহ্য করতে প্রস্তুত।

—তোমার কষ্ট হবে না?

—এতটুকু নয়, কৌশল্যা হেসে বলেন, তোমার সুখেই আমার সুখ। তোমার কুশলতায় আমার কুশল।

—তাইতো তুমি কৌশল্যা। দশরথ গভীর আবেগে বুকে টেনে নিলেন স্ত্রীকে।

দশরথ এরপর বিবাহ করলেন কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ীকে। কৈকেয়ী যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী।

কৌশল্যা হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন তাকে। কৈকেয়ীকে বলেছেন, আমি তোমার দিদি। তুমি আমার ছোট বোন। আমার বয়স হয়েছে, দেবার্চনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, স্বামীসেবা করতে পারি না ঠিকমতো। এখন থেকে তোমাকে দিলাম সেই ভার।

দশরথ কৈকেয়ীকে নিয়ে মেতে রইলেন। কৈকেয়ীর প্রকৃতি কৌশল্যার বিপরীত। উগ্র যৌবন চঞ্চলা নারী। বুদ্ধিবৃত্তিটা কিছুটা কম। কৈকেয়ীর প্রধান পরমর্শদাত্রী মন্থরা নামে একজন পরিচারিকা। এই পরিচারিকাকে কৈকেয়ীর মা মেয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কৈকেয়ী অনেক ব্যাপারেই এর পরামর্শ নেন।

মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী দশরথকে নিজের কাছে বেঁধে ফেলার জন্য সচেষ্ট। উদগ্র যৌবনের লীলাবিলাসে দশরথ তার বশীভূত। কৈকেয়ী ছাড়া তাঁর এক মূহূর্তও চলে না।

শুধু যৌবনবিলাসে পুরুষকে দীর্ঘকাল বেঁধে রাখা যায় না, পুরুষকে চিরদিন বেঁধে রাখতে হলে যৌবনের সঙ্গে উজাড় করে ঢেলে দিতে হবে সেবা। মন্থরা তাকে একথাও শিখিয়েছে।

তাই কৈকেয়ী সেবা দিয়েও দশরথকে বশ করেছেন। কৌশল্যা সবই জানেন। স্বামী সুখী হয়েছেন দেখে তিনিও সুখী।

* * *

কৈকেয়ীকে বিবাহ করবার পরও দশরথ অপুত্রকই রয়ে গেলেন। রাজার মানসিক কষ্ট আরও বেড়ে গেল।

কৈকেয়ীকে নিয়ে বেশ কিছুকাল উন্মত্ত হয়ে ছিলেন। সে উন্মত্ততাও এখন স্তিমিত। রাজা দশরথ পুরুষকার সম্পন্ন পুরুষ। কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁকে সন্তান উপহার দিতে পারেননি। তিনি ভাগ্যের নির্বন্ধ বলে চুপ করে বসে থাকেননি। তিনি ভেবে নিয়েছিলেন এটা

কৌশল্যা ও কৈকেয়ীরই অক্ষমতা। তিনি যে পিতা হবার ক্ষমতা রাখেন তা ইতিপূর্বে প্রমাণিত। এক অপ্রধান পত্নীর গর্ভে ইতিপূর্বে তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। সে কন্যা তাঁর বন্ধু লোমপাদ রাজার ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছে।

রাজা দশরথ বাস্তববোধ সচেতন আত্মবিশ্বাসী এবং ভোগী রাজা। তিনি কৌশল্যা এবং কৈকেয়ীকে না জানিয়ে একদিন সিংহল রাজকন্যা সুমিত্রাকে বিবাহ করে নিয়ে এলেন।

সুমিত্রা অল্পবয়স্কা রূপবতী রমণী। রাজার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তাকে নিয়ে তিনি এবার উন্মত্ত হয়ে রইলেন।

কৌশল্যা রাজার এই ব্যাপারটা নিয়েও কিছু বললেন না। রাজাকে তিনি ভালোবাসেন। রাজার যাতে সুখ তারও তাতে সুখ।

* * *

সুমিত্রাকে বিবাহ করবার পরও রাজার পুত্রসাধ মিটল না। তিনি পুত্রের জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন।

এর মধ্যে ঘটল এক ঘটনা।

একদিন দশরথ মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন অরণ্যে। বহুক্ষণ ধরে কোন মৃগ না পেয়ে তিনি ক্লান্ত অবসন্ন। অকস্মাৎ অরণ্যের মধ্যে মৃগের জলপানের শব্দ শুনে তিনি নিক্ষেপ করলেন শব্দভেদী বাণ। শব্দভেদী বাণ তীব্রগতিতে ছুটে গিয়ে সিন্ধু নামে এক ঋষিকুমারের বক্ষ বিদ্ধ করল।

সিন্ধু সরোবর থেকে কলসীতে জল ভরছিল, আর তাই শুনে দশরথ ভেবেছিলেন মৃগ জলপান করছে। আর তাই ভেবেই তাঁর এ বাণ নিক্ষেপ। বাণ নিক্ষেপ করেই দশরথ দৌড়ে গেলেন সরোবরের কাছে। গিয়ে যা দেখলেন, তাতে তো তাঁর চক্ষুস্থির। ঋষিকুমার সিন্ধু বুকে বাণবিদ্ধ অবস্থায় আর্তনাদ করছেন। দশরথ মুহূর্তের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে সিন্ধুর বুক থেকে বাণ খুলে নিলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল।

সিন্ধু কাতর স্বরে কোনমতে বললেন, শীঘ্র আমাকে তুমি পিতা অন্ধমুনির আশ্রমে নিয়ে যাও।

দশরথ সিন্ধুর দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটলেন অন্ধমুনির আশ্রমের পানে। পথিমধ্যেই মৃত্যু হল সিন্ধুর।

অন্ধমুনি এবং তাঁর পত্নীও অন্ধ। দশরথ সিন্ধুর মৃতদেহ সামনে রাখতে অন্ধমুনি ধ্যানযোগে প্রকৃত ঘটনা জেনে নিলেন। তারপর অভিশাপ দিলেন, পুত্রশোকে আমাদের যেমন প্রাণ যাচ্ছে, তোমারও একদিন এইভাবে পুত্রশোকে প্রাণ যাবে। এরপর পুত্রশোকে অন্ধমুনি ও তার পত্নী প্রাণত্যাগ করলেন। দশরথই তাদের সৎকার করলেন।

অন্ধমুনির এই অভিশাপবাণী শুনে দশরথ বিষণ্ণ হবার বদলে হয়ে উঠলেন উৎফুল্ল। তিনি জানতেন, অন্ধমুনি বাকসিদ্ধ সাধু। তাঁর বাণী কখনও ব্যর্থ হবার নয়। আজ হোক কাল হোক তিনি পুত্রের পিতা হবেনই।

দশরথ এবার নূতন উদ্যমে বুক বাঁধলেন। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে দিয়ে পুত্রযজ্ঞ করালেন। সেই যজ্ঞস্থলে অগ্নি থেকে উঠে এল চরু।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বললেন, তুমি এই চরু নিয়ে তোমার প্রথমা রাণীকে খাওয়াও। তাহলে তার গর্ভে জন্ম নেবেন অপূর্ব সুন্দর পুত্র, নররূপী নারায়ণ।

দশরথ উৎফুল্ল হৃদয়ে চরু নিয়ে অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। চরু কৌশল্যাকে খাওয়াবার কথা।

কিন্তু দশরথ চরু কৌশল্যাকে সবটা না দিয়ে সেটাকে দুভাগ করে একভাগ দিলেন কৌশল্যাকে, অন্যভাগ কৈকেয়ীকে।

কৌশল্যা কিছুই বললেন না এজন্য। স্বামীর সব কিছুই তিনি মেনে নিয়েছেন। সুমিত্রা ওদিকে করুণ বিলাপ শুরু করলেন। কৌশল্যা কৈকেয়ী পুত্রবতী হবেন, আর তিনি থেকে যাবেন অপুত্রবতী। তার বিলাপে অযোধ্যার অন্দরমহল যেন থমথম করতে লাগল।

তার কান্না শুনে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন কৌশল্যা। তিনি নিজের চরুকে তুভাগ করে একভাগ দিলেন সুমিত্রাকে।

সুমিত্রা আনন্দে তার হাত ধরে বললেন, আমার পুত্র হলে সে পুত্র হবে তোমার পুত্রের নিত্য অনুচর।

কৌশল্যার দেখাদেখি কৈকেয়ীও তাঁর চরু থেকে একভাগ চরু দিলেন সুমিত্রাকে।

*   *   *

যথাকালে কৌশল্যার অপূর্ব সুন্দর পুত্রের জন্ম হল। আশ্চর্য মনোহর দেহলাবণ্য। নীলপদ্মের মতো আয়ত চোখ, সিঁতুরের মতো রাঙা পা, যেন বিশ্বের সব সৌন্দর্য একত্র করে শিশুকে গড়া হয়েছে।

ওদিকে কৈকেয়ীরও পুত্র হয়েছে। সুমিত্রার হয়েছে যমজ পুত্র।

কৌশল্যা পুত্রের নাম রাখলেন রামচন্দ্র। কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত।

সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

রামচন্দ্র কৌশল্যার নয়নমণি। কিন্তু কৌশল্যা তাঁকে সবসময় নিজের মহলে আগলে রাখেন না।

রামচন্দ্রের অধিকাংশ সময় কাটে কৈকেয়ী আর সুমিত্রার মহলে। রামচন্দ্রকে ওরা তুজন খুব ভালোবাসেন, এতে কৌশল্যা খুব সুখী। অপরপক্ষে তিনিও ভরত লক্ষণ শত্রুঘ্নকে খুবই ভালোবাসেন।

কৌশল্যা অযোধ্যার রাজপরিবারে মাতৃস্থানীয়া রাজবধূ। অন্তরের কল্যাণবুদ্ধির জন্যই তিনি গৃহশান্তি বজায় রাখতে পেরেছেন। সপত্নীদের তিনি আপন বোনের মতো দেখেন, সপত্নীপুত্ররা তাঁর আপন সন্তানতুল্য।

শুধু কি তাই? দশরথের আরও অসংখ্য অপ্রধান পত্নী আছে। তারাও কৌশল্যার গুণে তাঁর বশীভূত। কৌশল্যা তাদেরও নিজের বোনের মত মনে করেন, তাদের সুখ-তুঃখ-আনন্দ-বেদনার অংশভাগিনী।

তাই তাঁরাও কৌশল্যাকে খুব মান্য করেন। কৌশল্যার গুণেই অযোধ্যার রাজপরিবারে অখণ্ড শান্তি।

* * *

এরই মধ্যে রামচন্দ্র ও অন্যান্য ভাইয়ের বিবাহ হল। পরিবারে এলেন জনকনন্দিনী সীতাদেবী এবং অন্যান্য বধূবৃন্দ।

কৌশল্যা পরম স্নেহে সীতাদেবীকে গৃহে বরণ করলেন। অন্যান্য বধূদের প্রতিও তাঁর সমদৃষ্টি। শ্বাশুড়ীরূপেও কৌশল্যা আদর্শ।

* * *

দিন কখনও একরকম যায় না।

অযোধ্যার রাজপরিবারে সুখের দিনগুলোর মধ্যে নেমে এল দুঃখের কৃষ্ণচ্ছায়া, মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী রামচন্দ্রের বনবাস প্রার্থনা করে বসলেন দশরথের কাছে।

শোকে দুঃখে ক্রোধ ক্ষোভে দশরথ অস্থির।

কৌশল্যাও দুঃখস্তব্ধ। কোন মা পুত্রের বনবাস সহ্য করতে পারেন? তাও আবার রামের মতো অসামান্য গুণবান পুত্রের বিশ্বভুবনে যার কোন তুলনা নেই।

রামের বনগমনকালে কৌশল্যা বিষাদপ্রতিমা। তার চোখের সামনে দিয়ে প্রাণপ্রিয় পুত্র বনে চলে গেল। বনের মধ্যে কত বিপদ আপদ কত অসুবিধা। তিনি অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে বাস করবেন, আর পুত্র কোথায় সেই বনের মধ্যে অনাহারে উপবাসে কষ্ট পাবে! একি কোন মায়ের প্রাণে সহ্য হয়?

কৌশল্যাকে সব কিছুই সহ্য করতে হয়। রাম বনে যাবার পর অযোধ্যার রাজপুরী শ্মশান। ঘরে ঘরে ক্রন্দন রোল। এর মধ্যে পুত্র শোকে আবার দশরথের মৃত্যু হল। কৌশল্যা শোকে নির্বাক্।

ভরত মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন।

ভরতকে দেখে কৌশল্যার মনে প্রথমে একটু অভিমান হল। যে

ভরতকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করেন, সেই ভরতের জন্যই তো আজ তার সর্বনাশ।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ভুল ভেঙে গেল। বুঝলেন এ ব্যাপারে ভরতের কোন দোষ নেই। ভরতকে কোলে করে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

ভরত বললেন, মাগো, তুমি তো জান আমি কায়মনোবাক্যে রামেরই সেবক। তোমাকে শুধু এই কথাই বলি, যদি সত্যই এ ব্যাপারে আমার কোন দোষ হয়ে থাকে, তবে জগতের যাবতীয় পাপের আমি যেন ফলভোগী হই। রামকে বঞ্চনা করে যদি আমার মনে এতটুকু রাজ্যের লোভ থাকে, তবে আমার ইহকাল পরকাল সব যেন নষ্ট হয়। তুমি বিশ্বাস করো মা, রাজত্বে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।

কৌশল্যা বললেন, তোমার মন আমি জানি ভরত। রাম চোদ্দ বছর পর ফিরে আসবে। ততদিন কি আর আমি বাঁচব?

ভরত বললেন, তুমি বেঁচে থাকবে মা, নিশ্চয় বেঁচে থাকবে—দাদার জন্যই তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। দেশে ফিরে এসে তোমাকে না দেখলে দাদার কি অবস্থা হবে তা ভেবে দেখেছো।

ভরতের কথায় কৌশল্যা কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন। বললেন, ভরত, তোমার পিতার মৃতদেহ ঘরেরর মধ্যে পড়ে আছে। তুমি তাঁর শেষকৃত্য করো।

* * *

দশরথের শেষকৃত্যের পর ভরত সদলে গেলেন রামকে ফিরিয়ে আনতে। কৌশল্যা নতুন আশায় বুক বেঁধে চললেন তাঁর সাথে। ভরতের বহুবিধ কাতর অনুরোধেও রাম ফিরলেন না। কৌশল্যার শেষ আশার দীপ নিভে গেল। ফিরে যাবার সময় পুত্রকে কোলে করে তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

* * *

দীর্ঘ চৌদ্দবছর কৌশল্যা পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে দিনগুলি অতিবাহিত করলেন। কোথায় গেল সেই সোনায় মোড়া নানারঙের দিনগুলি? স্বামী সান্নিধ্যের সেই মধুর দিনগুলি? রামচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি? সে সব এখন স্বপ্নমাত্র! কৌশল্যা এখন বসে বসে শুধু স্মৃতির জাল বোনেন, আর খুলে ফেলেন, এবং আবার বোনেন।

* * *

চৌদ্দ বছর পর অযোধ্যায় ফিরে এলেন রামচন্দ্র। কৌশল্যার আনন্দের শেষ নেই। রামচন্দ্র রাজা হলেন। তাঁর প্রজাবাৎসল্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত জগতে। পুত্রের যশে জগৎ পূর্ণ।

কৌশল্যা ভাবেন, পুত্রকে এই অবস্থায় রেখে যেতে পারলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু বিধাতা কৌশল্যার কপালে সুখ লেখেননি।

লোকনিন্দার জন্য রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জন দিলেন। কৌশল্যার মাথায় যেন বজ্রাঘাত। সীতা বিহনে রাজপুরী অন্ধকার।

কৌশল্যা দুঃখে কষ্টে নিশ্চুপ। তবু একমাত্র সান্ত্বনা, পুত্রকে সব সময় চোখের সামনে দেখতে পান।

সীতা বাল্মীকি মুনির তপোবনে বাস করছেন। লব-কুশ যমজ সন্তানের মাতা তিনি।

বাল্মীকির উপদেশে রাম সীতাকে পুনর্গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। সীতা বড় আশায় বুক বেঁধে এসেছেন। আবার স্বামীর সঙ্গে তাঁর মিলন হবে।

রাম বললেন, সীতাকে আবার চরিত্রশুদ্ধি পরীক্ষা দিতে হবে সর্বসমক্ষে।

কৌশল্যা এবার প্রতিবাদ করলেন, তুমি তো একবার তাঁকে পরীক্ষা করে দেখেছো রাম, তবে আবার পরীক্ষার প্রয়োজন কি?

রাম বললেন, মা, অযোধ্যার মানুষের সামনে চরিত্রশুদ্ধির পরীক্ষা না দিলে সীতার অপবাদ যে ঘুচবে না।

কৌশল্যা বললেন, রাম, সীতার মতো সতী জগতে নেই। তিনি নিষ্পাপ, সাক্ষাৎ কমলা তিনি। তার চরিত্রের আর পরীক্ষা নিও না। রামচন্দ্র বললেন, তুমি এসব কথা কেন বলছো মা? আমি রাজা হয়ে স্ত্রীর চরিত্রের পরীক্ষা যদি না করি, তবে আমার প্রজারা কি বলবে?

কৌশল্যা বললেন, বাবা, আমি তোমার মা, আমি তোমাকে বলছি, সীতার মতো সতী নারী আর দুটি নেই। তুমি নির্দ্বিধায় ওঁকে নিয়ে ঘর কর।

রামচন্দ্র বললেন, মাগো, ঘর আমি করবো, তার আগে সাধারণ মানুষ জানুক সীতা সত্যই নিষ্পাপ—রাবণের প্রাসাদে দীর্ঘকাল থাকা সত্ত্বেও কোন পাপ তাঁকে স্পর্শ করেনি।

—সাধারণ মানুষের জানা না জানায় কি আসে যায় পুত্র? তোমার মন জানলেই তো যথেষ্ট।

—মা, আমি জানি সীতার মতো সতী নারী বিশ্বে সুদুর্লভ। রাম গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সীতা যে অবস্থায় দুর্ধর্ষ সম্ভোগী রাবণের গৃহে নিষ্পাপ পবিত্র জীবন কাটিয়েছে, বিশ্বের আর কোন নারীর পক্ষে তা হয়তো সম্ভব হতো না, তাও আমি জানি মা। তবু আমি নিরুপায় মা।

কৌশল্যা শেষবারের মতো মিনতি করে বললেন, বাবা, আমি তোর মা, আমি বলছি সীতাকে তুই দুঃখ দিস না। তুই ওকে বিনা পরীক্ষায় ঘরে ফিরিয়ে নে।

রামচন্দ্র করজোড়ে বললেন, তুমি মা—তুমি স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। সীতাকে দুঃখ দিয়ে আমি নিজেও সহস্রগুণ বেশী দুঃখ পাই। তবু আমি নিরুপায়।

কৌশল্যা বুঝলেন, পুত্রকে অনুরোধ করা বৃথা। তিনি কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেলেন।

ঘরে বসেই তিনি শুনলেন যে, পরীক্ষা দেবার কথায় সীতা দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় পাতাল প্রবেশ করেছেন। মাতৃহারা বালক লব আর কুশ মায়ের জন্য অঝোরধারায় কাঁদছে। একথা শুনে তিনি আর ঘরে বসে থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে এসে লব-কুশকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, আয় বাছারা, আমার কোলে আয়, আজ থেকে তোদের সব ভার আমার। যতদিন বাঁচবো, তোদের বুকে করে রাখবো। কৌশল্যা ওদের বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে হালকা হলেন।

—০—

কামনা সেবিকা কৈকেয়ী

গিরিরাজ নগরে রাজা কেকয়ের রাজধানী।

কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ী পরম রূপবতী। রাজার আদরিণী কন্যা। তাই আবেগ ও অভিমানের তীব্রতা তার বেশী। না চাইতে সব কিছু পেয়ে যান কৈকেয়ী। কেকয়রাজ কন্যার স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন।

আমন্ত্রণ পাঠানো হল বড় বড় রাজার কাছে।

আমন্ত্রণ গেল অযোধ্যার রাজা দশরথের কাছে। দশরথের প্রধানা মহিষী আছেন কৌশল্যা। কৌশল্যা নিঃসন্তান।

কেকয়রাজের আমন্ত্রণ পেয়ে দশরথ রথে চড়ে যাত্রা করলেন গিরিরাজ নগরের উদ্দেশে।

গিরিরাজ নগর উৎসব সাজে সজ্জিত। অপরূপ বর্ণাঢ্য সাজে সাজানো হয়েছে স্বংয়বর সভা। সুবিশাল সভাস্থলে মর্যাদা অনুযায়ী বসানো হয়েছে রাজন্যবৃন্দকে।

নির্দিষ্ট সময়ে রাজকন্যা কেকয়ী সখীদের সঙ্গে প্রবেশ করলেন সভাস্থলে। প্রধানা সখীর হাতে স্বর্ণথালিকা, তার উপর সুগন্ধযুক্ত সুন্দর মালিকা।

কেকয়ী স্বভাবত চঞ্চল প্রকৃতির। সভাস্থলে প্রবেশ করে একে একে প্রতিটি রাজার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। কাউকেই যেন পছন্দ হচ্ছিল না। কোন রাজার স্থূল শরীর, কারো নাকটা খুব বোঁচা। কারো চোখের চাউনি ভালো নয়, কারো গোফ জোড়া দেখতে বিশ্রী।

রাজাদের সামনে দিয়ে যেতে যেতে হেসে ফেলছিলেন কৈকেয়ী। রাজার সংখ্যা তো কম নয়।

রাজাদের একঘেয়ে চেহারা দেখতে দেখতে বিরক্ত ও ক্লান্তও হয়ে উঠছিলেন।

এমন সময় দশরথের সিংহাসনের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হ্যাঁ, এই তো সত্যিকার রাজার মতো চেহারা। সর্ব অঙ্গ যেন নিখুঁত। দেখেই বোঝা যায়, পুরুষের মতো পুরুষ।

কৈকেয়ী সখীর স্বর্ণথালিকা থেকে বরমাল্যটি তুলে নিয়ে দশরথের গলায় পরিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারধারে মাঙ্গলিক বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠল।

রাজা কেকয় আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করলেন অযোধ্যার রাজার সঙ্গে রাজকন্যা কৈকেয়ীর বিবাহের কথা।

রাজারাও একবাক্যে স্বীকার করলেন, রাজকন্যার নির্বাচন যথোপযুক্তই হয়েছে। অযোধ্যার রাজা কুলে-শীলে রূপে-গুণে এবং পরাক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনাই হতে পারে না। রাজারা মনে কোন ক্ষোভ না নিয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন।

নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে দশরথ অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

রাজা কেকয় জামাতাকে প্রচুর ধনরত্ন অশ্ব গজ যৌতুক দিয়েছেন। আর দিয়েছেন মন্থরা নামে একজন কুব্জা দাসীকে। রাজমাতা দশরথকে একান্তে ডেকে বলেছিলেন, এই মন্থরা দাসী আমার কন্যাকে বাল্যকাল থেকে বড় করে তুলেছে। আমার কন্যার বুদ্ধি বিচক্ষণতা একটু কম। তাই মন্থরাকে ওঁর সঙ্গে দিলাম। ওই আমার কন্যাকে দেখাশুনা করতে পারবে।

দশরথ বিনীতভাবে বলেছিলেন, প্রয়োজন কি? আমার প্রাসাদের অগণ্য দাসী কৈকেয়ীর পরিচর্যায় সতত নিযুক্ত থাকবে।

—তা জানি। তবু মন্থরা সঙ্গে যাক্। ও যেরূপভাবে কৈকেয়ীর প্রয়োজন বুঝে কাজ করতে পারবে, অন্যের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। দশরথ আর আপত্তি করেননি।

দশরথ কৈকেয়ীকে নিয়ে খুব মেতে রইলেন। তিনি ভোগী পুরুষ। ভোগের মধ্যে জীবনকে তিনি সার্থক করে তুলতে চান। তাঁর প্রধানা মহিষী কৌশল্যা ধীর-স্থির ব্যক্তিত্বশালিনী ও ভক্তিমতী। দশরথ তাঁকে সমীহ করে চলেন।

কৈকেয়ী প্রাণচঞ্চল আবেগপ্রবণ কামনাময়ী।

এছাড়া কৈকেয়ী সেবাময়ী। রাজা দশরথ তাঁর মহলে এলে তিনি প্রাণঢালা সেবা দিয়ে তাঁকে যেন গ্রাস করে নিতে চান।

কৌশল্যাও দশরথকে সেবা করেন। কিন্তু সে সেবা দেবসেবার মতো অনেকটা যেন প্রথাসিদ্ধ। কৈকেয়ীর সেবা সুতীব্র আগ্রাসী। বাসনার তীব্রতা মিটিয়ে ও প্রাণঢালা সেবা দিয়ে কৈকেয়ী দশরথকে আপন বশে রেখেছেন।

এর মধ্যে দশরথ আবার সিংহল রাজকন্যা সুমিত্রাকে গোপনে বিবাহ করে ফেললেন।

কৌশল্যা রাজার এ বিবাহে নির্বিকার। কেননা তিনি জানেন, রাজা দশরথের মতো রাজার পক্ষে এ ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কৈকেয়ী এ বিবাহের খবর পাবার পর থেকেই ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো ফুঁসতে লাগলেন।

স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করলেন। দশরথের বহু সাধ্য-সাধনাতেও তাঁর মন গলল না। দিনরাত সুমিত্রাকে গাল দিতে লাগলেন আর পার্বতী মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে পার্বতী শঙ্কর, সুমিত্রার যেন সর্বনাশ হয়।

শেষে দশরথ এক চাল চাললেন। তিনি কৈকেয়ীকে বললেন, ছাখ রাণী কৈকেয়ী, রাজকার্যে খুব পরিশ্রম করবার জন্য আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি। রাজবৈদ্যের বিধান অনুযায়ী আমার এখন সেবা ও বিশ্রাম প্রয়োজন।

—কেন, নূতন রাণী সুমিত্রা আছেন। তার কাছে চলে যাও না ?

—কার সাথে কার তুলনা ? দশরথ হেসে বলেন, রাণী কৈকেয়ী মূর্তিমতী সেবা, একথা বিশ্ববাসী জানে। অপরপক্ষে রাণী সুমিত্রা কতখানি গুণহীনা তাও সবাই জানে।

—তবে ওকে বিবাহ করলে কেন ?

—আমার তো একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। ঘরে অমৃতভাণ্ডার থাকতে কে আর গুড় খেতে চায় বলো ? দশরথ উপেক্ষাভরে বললেন, নেহাত সিংহলরাজ ধরে বসলেন—তাই—

কৈকেয়ীর মন ভিজতে শুরু করল।

স্বামীর কাছে সরে এসে বললেন, তুমি ওই পেত্নীকে আবার ভালোবাসো না তো ?

দশরথ কৈকেয়ীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ছি ছি। ও কথা ভাবতেও আমার ঘৃণা হয়।

পত্নীর মুখে চুম্বন রেখা এঁকে দিয়ে বললেন, আমার ভালোবাসা শুধু তোমারই জন্যে। তুমিই আমার হৃদয়েশ্বরী।

* * *

দুধর্ষ অসুর সম্বর স্বর্গলোকে খুব উপদ্রব শুরু করেছে। দেবরাজ ইন্দ্র তার সাথে কিছুতেই পেরে উঠছেন না। দুর্দান্ত অসুর মেঘের আড়ালে কোথায় লুকিয়ে থেকে যুদ্ধ করে, তাকে দেখতেই পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন, তুমি অযোধ্যায় চলে যাও। রাজা দশরথের শরণাপন্ন হও। তিনিই তোমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

ইন্দ্র চলে গেলেন অযোধ্যায়। দশরথকে বললেন সব বিবরণ। দশরথ হেসে বললেন, তুমি নিশ্চিন্তমনে ফিরে যাও তোমার রাজ্যে দেবরাজ, আমি সম্বর অসুরকে বধ করব।

ইন্দ্র দেবলোকে ফিরে গেলেন।

রাজা দশরথ বিশাল বাহিনী নিয়ে সম্বর অসুরকে বিনাশ করতে চললেন।

সম্বরও কম যায় না। তার অধীনে ছিল বিশাল এক অসুর-বাহিনী। দশরথের বাহিনীর সঙ্গে সম্বরবাহিনীর তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। এদিকে দশরথ আক্রমণ করলেন সম্বরকে।

সম্বর অসুর অলক্ষ্যে থেকে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। ঝাঁকে ঝাঁকে মারা যেতে লাগল দশরথের সেনা।

দশরথ শেষকালে ভয়ংকর এক শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করলেন। সম্বর আড়ালে লুকিয়ে যেখানে গর্জন করছিল, সেই বাণ সোজা গিয়ে তাকে আঘাত করল।

প্রচণ্ড ক্রোধে এইবার দশরথের দিকে ছুটে এল সম্বর। আঁচড়ে-কামড়ে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। কিন্তু বাণের আঘাতে তার প্রাণশক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

দশরথের দেহ ক্ষত বিক্ষত করবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্বব অসুরের মৃত্যু হল।

সম্বরের দাঁতে ছিল বিষ। দশরথের সারা শরীর যন্ত্রণায় জ্বলছিল। রাজধানীতে পৌঁছেই তিনি প্রথমে চলে গেলেন কৈকেয়ীর মহলে। কৈকেয়ী তাঁর এ রক্তাক্ত শরীর দেখে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন।

দশরথ বেদনারুদ্ধকণ্ঠে বললেন, প্রিয়ে কৈকেয়ী, বেদনায় প্রাণ যায়।

কৈকেয়ী মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিলেন। রাজার ক্ষতস্থান ভাল করে ধুয়ে দিয়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলেন। তারপর উপযুক্ত প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন ক্ষতস্থানগুলিতে।

কৈকেয়ীর সেবায় দশরথের ক্ষতগুলো সেরে গেল। তার যন্ত্রণার উপশম হল। দশরথ খুশি হয়ে বললেন, কৈকেয়ী, তুমি আমার প্রাণ

বাঁচিয়েছ। তোমার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। তুমি আমার কাছে তোমার মনোমত বর চেয়ে নাও।

কৈকেয়ী বললেন, আমি আবার কি বর চাইব? তুমি আরোগ্য-লাভ করেছ, এতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে।

—না কৈকেয়ী। তুমি কি চাও বলো? তোমাকে কিছু না দিতে পারলে আমার মন তৃপ্তি পাচ্ছে না।

কৈকেয়ী বললেন, আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর। আমি আসছি। এইবলে তিনি দৌড়ে গেলেন মন্থরার কাছে। মন্থরাকে সব কথা বললেন। মন্থরা বলল, তুমি গিয়ে রাজাকে বলো, আমার এখন কিছু দরকার নেই। দরকার হলে চেয়ে নেব।

মন্থরার শেখানো মতো কৈকেয়ী গিয়ে সে কথা রাজাকে বললেন। রাজা হেসে বললেন, ঠিক আছে। তাই হবে প্রিয়া।

এদিকে আবার আর এক বিপদ ঘটল।

রাজার ক্ষত আরোগ্য হল। কিন্তু তার নখ পেকে উঠল। নখে জমল পূঁজরক্ত। রাজা ব্যথায় চীৎকার করতে লাগলেন। সমস্ত আঙ্গুল ধীরে ধীরে বিষাক্ত হয়ে যেতে লাগল। অনেক রকম ওষুধ প্রয়োগ করা হল। কিছুতেই কিছু হল না।

কৈকেয়ী দিনরাত রাজার কাছে বসে থাকেন। তাঁর স্নানাহার বন্ধ। রাজার কষ্ট দেখে তাঁর চোখ দিয়ে জল পরে। এই নখক্ষতের যন্ত্রণা থেকে রাজা কিসে মুক্তি পাবেন তা তিনি ভেবে পান না।

নানাদিকে তিনি লোক পাঠালেন। কে এই নখক্ষত আরোগ্য করবার উপায় বলে দিতে পারে?

অবশেষে একদিন পদ্মকর নামে এক বৈদ্য এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, রাজার এই বিষাক্ত নখে মুখ দিয়ে কেউ যদি ভিতরের পূঁজরক্ত টেনে বের করে দিতে পারে, তবে রাজা আরোগ্য লাভ করবেন।

কিন্তু কে মুখ দিয়ে টেনে বের করবে দূষিত পূঁজরক্ত?

কৈকেয়ী বললেন, আমি মুখ দিয়ে আঙ্গুল থেকে টেনে বের করব ভিতরের যত ক্লেদ।

রাজা তাঁকে নিষেধ করলেন। এতে কৈকেয়ী অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। কৈকেয়ী তার নিষেধ শুনলেন না।

তিনি নির্দ্বিধায় রাজার বিষাক্ত নখ মুখে পুরে নিলেন, তারপর মুখের ভিতর টেনে নিলেন বিষাক্ত পূঁজরক্ত, যতক্ষণ না শেষ বিন্দু পূঁজরক্ত টেনে নিতে পারলেন, ততক্ষণ থামলেন না। রাজার নখ থেকে সমস্ত ক্লেদ বেরিয়ে গেল, যন্ত্রণা গেল কমে।

রাজা গভীর তৃপ্তিতে বললেন, কৈকেয়ী, প্রিয়তমে, তুমি দ্বিতীয়বার আমার প্রাণ রক্ষা করলে। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। কি চাও তুমি বলো ?

কৈকেয়ী হেসে বললেন, এখন আমার কিছুই চাইবার নেই। তুমি দ্রুত আরোগ্য লাভ কর আমি শুধু তাই চাই।

—না-না এবার তোমায় কিছু চাইতেই হবে।

—দরকার হলে পরে আমি চেয়ে নেব।

* * *

রাজা দশরথ অপুত্রক ছিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে দিয়ে যজ্ঞ করালেন পুত্রকামনায়। যজ্ঞস্থল থেকে উঠে এল পুত্র উৎপাদক চরু।

ঋষ্যশৃঙ্গ রাজাকে বললেন, তুমি এই দৈবী চরু নিয়ে প্রধানা মহিষী কৌশল্যাকে খাইয়ে দাও। এতেই তুমি পুত্রের পিতা হতে পারবে।

চরু নিয়ে দশরথ পড়লেন বিপদে। কারণ কৈকেয়ীকে তিনি ভালোমতই জানেন। এই চরু শুধুমাত্র কৌশল্যাকে দিলে মহা অনর্থের সৃষ্টি হবে।

কৈকেয়ীর ক্রোধ প্রলয়ের আগুন ছড়াবে।

তাই দশরথ মুনির নির্দেশ অমান্য করে দৈবী চরুকে দুটো ভাগে

ভাগ করলেন। এক ভাগ দিলেন কৌশল্যাকে, আর এক ভাগ দিলেন কৈকেয়ীকে।

সুমিত্রার জন্য দশরথের চিন্তা ছিল না। সুমিত্রা শান্তশিষ্ট মেয়ে। চরু না পেয়ে তিনি হয়তো খানিকটা কাঁদবেন।

সত্যিই তাই। সুমিত্রা যখন শুনলেন কৌশল্যা ও কৈকেয়ী চরু পেয়েছেন, তখন তিনি মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে কৌশল্যা তাঁর নিজের ভাগ থেকে কিছুটা চরু তাকে দিলেন।

কৈকেয়ীও তখন তাঁর ভাগ থেকে কিছুটা চরু সুমিত্রাকে দিয়ে দিলেন।

* * *

যথাকালে কৌশল্যা কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা মা হলেন।

কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত। পরম রূপবান ধীর স্থির পুত্র। ভরত কৈকেয়ীর নয়নমণি।

কৈকেয়ী ভরতকে যেমন ভালোবাসেন, তেমনি ভালোবাসেন রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে। রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন তাঁর মহলেই খেলাধূলা করে। একদিন রাম লক্ষ্মণ ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের দেখা না পেয়ে কৈকেয়ী শোকে পাগলিনী হয়ে গিয়েছিলেন। রাম লক্ষ্মণ ফিরে এলে তবে তিনি অন্নজল মুখে তুলেছিলেন।

রামচন্দ্র অযোধ্যাবাসীর ভালোবাসার ধন, এ যেন কৈকেয়ীরও গৌরব। রামচন্দ্রকে তিনি আপন পুত্র ভারতের চেয়ে কোন অংশে কম ভালোবাসেন না।

রামকে তিনি যেমন ভালোবাসেন, তেমনি সব বিষয়ে তাঁর উপর গভীর আস্থাও রাখেন।

রামের অসামান্য বীরত্বের বিবরণে কৈকেয়ীর বুক ফুলে ওঠে গর্বে আনন্দে, আবার মিথিলায় হরধনুভঙ্গের পর রাম যখন মাণ্ডবীর সঙ্গে ভরতের বিবাহ প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন, তখনও কৈকেয়ী তাতে

দ্বিমত করেননি। রামের কথাই তাঁর কাছে শেষ কথা। তাই যখন দশরথ রামচন্দ্রকে অযোধ্যার রাজ্যভার দিতে ইচ্ছা করলেন তখন কৌশল্যার মতো কৈকেয়ীও আন্তরিকভাবে খুশি হলেন।

মন্থরা যখন তাঁকে রামের রাজ্যাভিষেকের কথা বলল, তখন আনন্দের আতিশয্যে কৈকেয়ী মন্থরাকে একরাশ মূল্যবান অলংকার দিয়ে বললেন, রাম রাজা হলে তোকে আরও অনেক ধন-সম্পদ দেব।

মন্থরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলল, তোর ধন-সম্পদের মুখে আমি ঝাড়ু মারি। সতীনের ছেলে রাজা হবে, আর উনি আনন্দে নাচছেন। রাম রাজা হয়ে তোকে দূর করে দেবে।

কৈকেয়ী বললেন, তুই কি পাগল হয়েছিস? রাম আমার সে রকম ছেলেই নয়। মায়ের চেয়েও আমাকে সে বেশী মান্য করে।

—রাজা হোক, তখন কত মান্য করে দেখবো। মন্থরা গজ গজ করে বলল, নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। এ দেখি পাগলেরও অধম। কোথায় নিজের ছেলেকে রাজা করবে, তা না করে সতীনের ছেলের রাজা হবার আনন্দে নাচছে। তোর ছেলে ভরত তো জীবনেও রাজা হতে পারবে না। মা হয়ে তুই নিজের ছেলের ক্ষতি করলি?

এতক্ষণে কৈকেয়ী ভাবেন, সত্যিই তো। ভরত তো কোনদিন আর রাজা হতে পারবে না। উপায়?

—উপায় আছে। তুই এখন রাজার কাছে গিয়ে বল, আমাকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো বর দাও—এক বরে রামের বদলে ভরতের রাজ্যাভিষেক, অন্য বরে রামচন্দ্রের চোদ্দ বছরের জন্য বনবাস।

—না—না এ বর আমি রাজার কাছে চাইতে পারবো না।

—পারতেই হবে। না পারলে তোর সর্বনাশ—তোর ছেলের সর্বনাশ। তুই এখন চুপচাপ শুয়ে থাক মাটিতে। একটা ময়লা কাপড় পরে নে। শরীর থেকে সব গয়নাগাটি খুলে ফেলে শুধু কাঁদতে

থাক। রাজা এসে তোকে এ অবস্থায় দেখলে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তখন তুই এ সব চাইবি।

*　　　*　　　*

মন্থরার শেখানো মতো কৈকেয়ী মলিন কাপড় পরে মাটিতে শুয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর দশরথ তার কাছে এসে তাকে ওই অবস্থায় দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন। ভূমিতে বসে পড়ে বললেন, তোমার কি হয়েছে বলো? তুমি কাঁদছো কেন? কি দুঃখ তোমার?

—দুঃখ হবে না কেন? তুমি কথা দিয়ে কথা রাখোনি। আমার মরে যাওয়াই ভালো।

—ছি ছি। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। তুমি কি চাও বল?

—আমি চাই, তুমি ভরতকে রাজা কর, আর রামকে চোদ্দ বছরের জন্য বনবাস দাও।

দশরথ স্তম্ভিত। নিজের কানকে তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। যে কৈকেয়ী রামকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন, সেই কৈকেয়ীর মুখে এইকথা! তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, এসব কি বলছো তুমি কৈকেয়ী?

—ঠিকই বলছি। তোমার কাছে দুটি বর আমার প্রাপ্য। এক বরে ভরতকে তুমি রাজা কর, অন্য বরে রামকে বনবাস দাও।

দশরথ প্রচণ্ড চীৎকার করে বললেন, পাপীয়সী, এই তোর মনে ছিল? এই জন্য তখন তুই আমার কাছে বর নিসনি। তুই জানিস তোর এই কর্মফলে আমি মরব, তুইও নিষ্কৃতি পাবি না। ভরতকে আমি চিনি। ভরতই তোকে হত্যা করবে।

কৈকেয়ী উত্তর না দিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। দশরথ অনুনয় করে বললেন, কৈকেয়ী, আমি তোমার স্বামী—তোমার ইহকাল পরকাল। রামকে বনবাস দিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য।

তুমি স্বামীবধের নিমিত্ত হয়ো না। ওই দুটি বর ছাড়া অন্য যা কিছু চাও, সব আমি দেব।

—না—আমি ওই দুটি বরই চাই।

—আমি স্বামী হয়ে তোমার পায়ে ধরছি কৈকেয়ী। অন্য বর চাও।

—না।

—পাপীয়সী। সর্বনাশী! তুই স্বামীকে বধ করলি! যতদিন চন্দ্রসূর্য থাকবে, ততদিন জগতে থাকবে তোর অপযশ।

দশরথ টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে গেলেন।

* * *

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ এখন শ্মশানভূমির মতো নির্জন নীরব। আত্মীয় পরিজন দাসদাসী সবই আছে। অথচ কিছুই নেই।

রাম বনবাসে যাবার পর থেকেই অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ যেন করুণ শূন্যতার মধ্যে দীর্ঘশ্বাস মর্মরিত।

পর পর কত ঘটনা ঘটে গেছে। রামের বনগমনের পর দশরথের মৃত্যু ঘটেছে। ভরত এসে মাতাকে যথেষ্ট কটুকথা বলেছেন। রামকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে তিনি তাঁর পাদুকাযুগলকে সিংহাসনে স্থাপন করে তাঁর প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করছেন। নিজে একেবারে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছেন।

লঙ্কেশ্বর রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃতা। রামচন্দ্র লংকায় গিয়ে রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেছেন। এসব সংবাদও অযোধ্যায় এসে পৌঁছেছে। রামচন্দ্রের আগমন প্রত্যাশায় অযোধ্যাবাসীরা আনন্দে আবার উদ্বেল হয়ে পড়েছে। রামচন্দ্র অযোধ্যা ত্যাগ করার পর তাদের জীবনে আনন্দ উৎসব আসেনি। দীর্ঘদিন পর আবার অযোধ্যা নগর উৎসবের সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। রাম ফিরে আসছেন, ফিরে এসে গ্রহণ করবেন রাজ্যশাসনভার।

আযোধ্যার রাজপ্রাসাদে আবার নবজীবনের সাড়া। শুধু কৈকেয়ীর মহলই অন্ধকার, নিরানন্দ।

কৈকেয়ী সব সংবাদই পেয়েছেন।

তিনি রামচন্দ্রের বনগমনের পর থেকে দুঃখে বেদনায় নিশ্চুপ হয়ে গেছেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি শোকে পাথর। স্বামী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। স্বামীর তুলনায় তাঁর বয়েস অনেক কম। তথাপি তিনি স্বামীকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। স্বামীর সেবাযত্ন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁর মন ছিল না। কিন্তু তথাপি কি করে যেন সব অঘটন ঘটে গেল।

রামের বনবাস তিনি মনে প্রাণে চাননি, তাঁর দুর্ভাগ্যই যেন মন্থরার পরামর্শ হয়ে তাঁকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নিল। যা তিনি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি, তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর দ্বারা ঘটানো হল। নিয়তির লিখন কে খণ্ডাবে!

কৈকেয়ী জানেন, সমস্ত অযোধ্যাবাসী তাঁকে বিষনজরে ছাখে। রামচন্দ্র ফিরে আসার পর তার কি অবস্থা হবে তিনি জানেন না। তবু তিনি শুধু রামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় বসে আছেন। রামচন্দ্র যদি তাঁর কাছে না আসেন, তিনি এ ঘৃণ্য জীবনের ইতি টেনে দেবেন।

কৈকেয়ী তীব্র বিষের একটি গুলি তৈরী করে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন লক্ষ লক্ষ মানুষের জয়ধ্বনির মধ্যে। চারদিকে বাজতে লাগল আনন্দবাদ্য।

কৈকেয়ী নিজের মহলে বসেই বুঝতে পারছেন, রাম প্রথমে যাবেন মাতা কৌশল্যার কাছে, তার পর সুমিত্রা, তারপর অন্যান্য শ্রদ্ধেয় পরিজনের কাছে। রাম তাঁর কাছে আসবেন না?

কৈকেয়ী নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

হঠাৎ দ্বারের কাছে জয়ধ্বনি হল, 'জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয়।'

কৈকেয়ী চমকে উঠলেন। দ্বারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র। কি অপরূপ মূর্তি। কৈকেয়ী তাতাতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

—মা, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে সর্বাগ্রে তোমাকেই প্রণাম করতে এলাম।

রামচন্দ্র সাষ্টাঙ্গে নত হয়ে প্রণাম করলেন কৈকেয়ীকে। পিছনে সীতাদেবীও স্বামীকে অনুসরণ করলেন।

কৈকেয়ী আশীর্বাদ করে বললেন, বৎস, তুমি যদি আমার কাছে না আসতে, তবে আমি এই বিষের নাড়ু খেয়ে নিজেকে শেষ করতাম। রামচন্দ্র মৃদু হাসলেন। বললেন, মাগো, তোমাকে দেখবো বলেই তো ছুটে এসেছি। কৈকেয়ীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তিনি বললেন, বৎস, তুমি তো স্বয়ং বিষ্ণু। তুমি তো আগে থেকেই সব কিছু ঠিক করে রেখেছো। রাবণ বধের জন্যই তোমার মর্ত্য লীলা। তবে তুমি আমাকে নিমিত্তের ভাগী করে চিরদিন আমাকে অপযশের লজ্জায় ফেলে রাখলে কেন?

রাম নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

—০—

সুস্মিত স্বভাবা সুমিত্রা

অযোধ্যার রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন।

কৌশল্যা ও কৈকেয়ী তার দুই মুখ্য রাণী। এ ছাড়া অপ্রধান রাণী আছেন আরও অনেক।

দশরথের সারা জীবনটা প্রায় কেটে গেছে বাসনা ভোগ-বিলাসের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য। তাঁর ভোগতৃষ্ণা এখনও প্রবল।

এই কারণেই তিনি প্রায় গোপনেই বিবাহ করে ফেললেন সিংহল রাজকন্যা সুমিত্রাকে।

সুমিত্রা সদ্য যুবতী। পরম রূপবতী।

দশরথ মৃগয়ার ছলে অযোধ্যা ত্যাগ করে উপস্থিত হয়েছিলেন সিংহলে। তাবপর একরকম গোপনেই বিবাহ করে সুমিত্রাকে নিয়ে ফিরে চললেন অযোধ্যায়।

সুমিত্রার চোখ দু'পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের পানে। সবই তাঁর কাছে নূতন।

দশরথের চোখ সুমিত্রার পানে। এই অপরূপ সৌন্দর্য ও লাবণ্যময়ী নবযুবতীকে দেখে দশরথ চোখ ফেরাতে পারেন না।

মধ্যম রাণী কৈকেয়ীও যুবতী। কিন্তু সুমিত্রার কাছে তাঁকেও বয়স্ক মনে হয়।

দশরথ সুমিত্রাকে দেখতে দেখতে কামনায় উদ্বেল। তাঁকে নিজের কাছে টেনে নিতেই সুমিত্রা লজ্জায় বলে ওঠেন, না না আর্যপুত্র, আজ তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

—কেন? দশরথ বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, তুমি তো আমার ধর্মপত্নী। তোমাকে স্পর্শ করায় বাধা কোথায়? সুমিত্রা মুখ নত করে থাকেন।

দশরথ আবার সুমিত্রাকে কাছে টানতে গেলে সুমিত্রা দূরে সরে বসলেন।

—ও বুঝতে পেরেছি। দশরথের কণ্ঠে অভিমানী সুর, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তাই আমার স্পর্শ তোমার মনঃপূত নয়।

—না-না, তা-নয়-তা নয়। সুমিত্রার কণ্ঠে ব্যাকুলতা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না আর্যপুত্র।

—ভুল নয়, ঠিকই বুঝেছি।

—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি কায়মনোবাক্যে তোমারই। তুমি আমার প্রভু। আমার উপর তোমারই শুধু সর্বত অধিকার।

সুমিত্রার মুখে একথা শুনে দশরথ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না।

রথের উপরই আদরে-সোহাগে সুমিত্রাকে বিবশ করে দিলেন। মিলন শেষে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন।

দশরথ হেসে বললেন, এবার বলো, তুমি তখন আমাকে তোমায় স্পর্শ করতে বাধা দিয়েছিলে কেন?

সুমিত্রা মৃদুকণ্ঠে বললেন, আজ যে কালরাত্রি। কালরাত্রিতে স্পর্শদোষ ঘটলে সে নারী হয় চিরদুর্ভাগিনী।

* * *

সুমিত্রা দুর্ভাগ্য নিয়েই যেন অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন!

কৌশল্যা আর কৈকেয়ীর কাছে সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল—রাজা দশরথ অল্পবয়স্কা পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করে ফিরে এসেছেন।

কৌশল্যা এ বিষয়ে নির্বিকার। তিনি স্বামীর স্বভাব ভালোমত জানেন। সুমিত্রাকে নিয়ে তাঁর মনে কোন চাঞ্চল্য ছিল না।

চাঞ্চল্য ছিল কৈকেয়ীর মনে। তিনি রূপে-গুণে রাজাকে বশ করে রেখেছিলেন। রাজার বিবাহের সংবাদে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু পরে তিনি আরও নিবিড়ভাবে রাজাকে কাছে টেনে ধরেছিলেন। একদিকে রূপযৌবনের লীলা বিস্তারে রাজাকে মুগ্ধ পতঙ্গের মতো নিজের মহলে বন্দী করেছিলেন, অন্যদিকে প্রাণঢালা সেবায় রাজার চিত্তকে তিনি জয় করে নিয়েছিলেন।

সুমিত্রা শান্ত স্নিগ্ধ সংযত। কৈকেয়ীর মতো প্রাণচাঞ্চল্য তাঁর মধ্যে নেই। তাই অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে রাজবধূ হয়ে এসেও তাঁর দিন কাটতে লাগল করুণ এক রিক্ততার মধ্যে।

সুমিত্রার জীবন-যৌবন যেন উপেক্ষা আর অনাদরে ঘেরা।

দশরথ কৈকেয়ীকে নিয়েই উন্মত্ত। রাজকার্যের অবকাশে কৈকেয়ীর মহলেই তার অধিকংশ সময় কেটে যায়।

সুমিত্রার দিকে ফিরে তাকাবারও অবকাশ হয় না।

* * *

সুমিত্রা নিজের মহলে নিঃসীম একাকীত্বের মধ্যে দিন কাটান। ভাগ্যই তাকে অসুখী করেছে। একটি সন্তান থাকলেও তাকে নিয়ে তিনি সুখী হতেন। সন্তানকে নিয়ে কেটে যেত তার জীবনের বাকী দিনগুলি।

কিন্তু কোথায় সন্তান ?

দশরথ তাকে সন্তান দিতে পারেননি। শুধু তাঁকে কেন, কৌশল্যা কৈকেয়ী —কাউকেই নয়।

আর সেইজন্যই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে দিয়ে মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন করেছেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। যজ্ঞ থেকে চরু উঠেছে, যে কথা সুমিত্রাও শুনেছেন।

দশরথ নিশ্চয় সেই চরু তাদের তিনজনের মধ্যে ভাগ করে দেবেন।

সুমিত্রা চরুর আশায় বসে রইলেন।

কিন্তু কোথায় সেই যজ্ঞের চরু ?

সুমিত্রা নিজের মহলে বসে শুনলেন, দশরথ সেই চরু কৌশল্যা আর কৈকেয়ীকে ভাগ করে দিয়েছেন। সুমিত্রাকে করেছেন অবহেলা আর অসম্মান।

যা তার প্রাপ্য, তা থেকে করেছেন বঞ্চিত।

দুঃখে অপমানে বেদনায় লজ্জায় সুমিত্রা কেঁদে ফেলেন। কান্না ছাড়া তার আর উপায় কি? কাকে তিনি মনের ব্যথার কথা জানাবেন?

সুমিত্রার কান্নার সংবাদ গিয়ে পৌঁছাল কৌশল্যার কানে। কৌশল্যা চরু ভাগ করে তাকে একভাগ চরু দিলেন।

সুমিত্রা বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করলেন, আর ত্যাগ করলেন অনাগত সন্তানের উপর তার সর্ব অধিকার।

কাঁদতে কাঁদতে কৌশল্যাকে বললেন, দিদি, আমার সন্তান হলে সে সন্তান হবে তোমার সন্তানের সর্বক্ষণের অনুচর।

কৌশল্যার দেখাদেখি কৈকেয়ীও সুমিত্রাকে তার ভাগ থেকে এক ভাগ চরু দিলেন।

সুমিত্রা তার সে দয়ার দান গ্রহণ করে বললেন, দিদি, আমার সন্তান হলে সে হবে তোমার সন্তানের সর্বক্ষণের অনুচর।

* * *

সুমিত্রা সত্যিই দুর্ভাগিনী।

স্বামীর অনাদর উপেক্ষার মধ্যে সন্তানকে নিয়ে তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার সে আশাও পূর্ণ হল কোথায়?

লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন—দুই অপূর্ব সুন্দর যমজ পুত্রের মা হলেন তিনি। কিন্তু জন্মের পর থেকেই তো তারা তার কাছছাড়া।

লক্ষ্মণ কৌশল্যাপুত্র রামচন্দ্রের অনুক্ষণের অনুচর, কৌশল্যার মহলেই তার নিয়ত অবস্থান।

অপর পুত্র শত্রুঘ্নও তো কৈকেয়ীর মহলেই বাস করে। সুমিত্রা শুধু যমজপুত্রকে প্রসবই করেছেন, কিন্তু তাদের নিজের মনের মতো করে মানুষ করে তোলার অধিকার তাঁর কোথায়?

সব অধিকার তো তিনি স্বেচ্ছায় দিয়েছেন কৌশল্যা আর কৈকেয়ীকে।

ওরা দুজনেই যেন তাঁর দুই পুত্রের মা।

সুমিত্রার মনে এ জন্য কোন দুঃখ নেই।

রামচন্দ্র আগে আগে যান। লক্ষণ যান তার পিছনে। সুমিত্রা আড়াল থেকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছাখেন।

আবার এদিকে ভরতের সাথে ছায়ার মতো ঘোরেন শত্রুঘ্ন। সুমিত্রা আড়াল থেকে দেখেই মুগ্ধ হন।

দুই পুত্র মানুষ হচ্ছে দুই রাণীর মহলে।

সুমিত্রার কোন অভিযোগ নেই, অধিকার নেই। দুঃখ বেদনা দুর্ভাগ্যের মধ্যেই তিনি সুখী।

* * *

পুত্রের উপর সুমিত্রার সামান্যতম অধিকারও নেই।

রামচন্দ্র পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনগমন করলেন। লক্ষ্মণও তার সাথী হলেন। পিছনে পড়ে রইলেন দুর্ভাগিনী মা, নবপরিণীতা পত্নী ঊর্মিলা। ঊর্মিলার মুখের দিকে তাকিয়ে বেদনায় সুমিত্রার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

লক্ষ্মণ বনে যাবার পর সুমিত্রা নববধূ ঊর্মিলাকেই কোলে টেনে নিলেন, তার দুর্ভাগ্যের মধ্যেই দেখতে পেলেন নিজের দুর্ভাগ্যের ছায়া। অযোধ্যার নির্জন প্রাসাদে করুণ এক রিক্ততার মধ্যে শাশুড়ী-বধূর দিন কাটে।

সকলে স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরসংসার করে। ঊর্মিলার ঘর শূন্য। শূন্য ঘর শূন্য শয্যার দিকে শুষ্ক চোখে তাকিয়ে থাকে নববধূ। সুমিত্রা তার মাথায় হাত দিয়ে বলেন, দুঃখ করিস না মা। লক্ষ্মণ নিশ্চয় ভালোয় ভালোয় ফিরে আসবে।

ঊর্মিলা কান্না ভেজা গলায় বলে, কত কথা শুনতে পাই মা। দুর্ধর্ষ রাক্ষসদের রাজ্যে গেছে। সেখানে কত বিপদ!

সুমিত্রা অভয় দিয়ে বলেন, ওরে সঙ্গে যে বিপদতারণ রাম আছেন।

তুই জানিস না মা, কিন্তু আমরা জানি, স্বয়ং বিষ্ণু আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে মর্ত্যলোকে লীলা করতে এসেছেন। আমার লক্ষ্মণকে রাম তো প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসে। তার কোন ভয় নেই মা।

সুমিত্রা একদিকে নববধূ উর্মিলাকে সান্ত্বনা দেন, আবার কৌশল্যার মহলে গিয়ে তাঁর পরিচর্যা করেন। কৌশল্যার বয়স হয়েছে। পুত্রশোকে তিনি উন্মাদিনী প্রায়। সুমিত্রা তাঁকে নানা ভাবে ভুলিয়ে রাখেন। কৌশল্যাকে বলেন, তুমি অত উতলা হও কেন দিদি? স্বয়ং বিষ্ণু যার পুত্র, তার পক্ষে অত উতলা হওয়া কি সাজে? তোমার রাম শীঘ্রই ফিরে আসবে তোমার কোলে। সুমিত্রা কৈকেয়ীর মহলেও যান। সেখানে চুপচাপ বসে থাকেন কৈকেয়ীর কাছে। কৈকেয়ীর বেদনাভরা নীরব নিথর মুখখানির দিকে তাকিয়ে তার বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে।

* * *

অযোধ্যার নিঝুম নীরব রাজাপ্রাসাদে সুমিত্রাই একমাত্র প্রাণবন্ত নারী। তার নিজের কোন দুঃখ নেই, কোন শোক নেই, সকলের দুঃখকে তিনি নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছেন, সকলের নৈরাশ্য বেদনাকে তিনি আশার নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত করে রেখেছেন। কৌশল্যা অক্ষম, কৈকেয়ী নীরব। একমাত্র সুমিত্রাই অযোধ্যার রাজপুরীকে সজীব করে রেখেছেন—সকলের মধ্যে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন—রঘুকুল গৌরব রাম আবার ফিরে আসবেন!

সত্যিই তাই হল। রাবণ বধ করে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ পরম গৌরবের মধ্যে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

প্রথমে কৈকেয়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে পরে এলেন কৌশল্যার কাছে। সুমিত্রা সেখানেই বসেছিলেন। রাম লক্ষ্মণ ও সীতা উভয়কে প্রণাম করলেন।

লক্ষ্মণের শরীরে শক্তি শেলের ক্ষতচিহ্ন দেখে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস, এ কিসের চিহ্ন ?

রামচন্দ্র তখন সবিস্তারে বললেন লক্ষ্মণের শরীরে শেলের আঘাতের বিবরণ, কিরূপে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণকে বিশল্যকরণীর সাহায্যে বাঁচানো হয়েছিল।

লক্ষ্মণ শেলের আঘাত থেকে বেঁচে উঠেছেন, কিন্তু শেল রেখে গেছে লক্ষ্মণের শরীরে কুৎসিৎ ক্ষতচিহ্ন।

রাম বললেন, মাগো, কিছুতেই এ ক্ষতচিহ্ন মিলিয়ে যায়নি। সুমিত্রা মৃদুকণ্ঠে বললেন, বৎস, তোমার পদযুগল লক্ষ্মণের দেহে স্থাপন করলেই তো এ ক্ষতচিহ্ন বিলীন হয়ে যেত বাবা। যে পাদস্পর্শে কাষ্ঠ হয়ে যায় স্বর্ণ, সে পাদস্পর্শে সামান্য ক্ষতচিহ্ন বিলীন হয়ে সেখানে ফুটে উঠবে চম্পকবর্ণ তা তুমি বোঝনি কেন বাবা ? এ তোমার কেমন লীলা ?

—০—

সতী সীমন্তিনী সীতা

—তুমি আমার সাথে বনগমনের সংকল্প ত্যাগ কর সীতা, রামচন্দ্র মিনতি করে বললেন, তুমি আবাল্য রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছো, বনবাসের দুঃখকষ্ট তুমি সহ্য করতে পারবে না।

—এ তুমি কি বলছো আর্যপুত্র? সীতা কোমল অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তুমিও তো আবাল্য রাজপ্রাসাদে বড় হয়েছো। তুমি যদি বনবাসের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারো, আমি পারবো না কেন?

—পুরুষ যা পারে, নারী তা পারে না সীতা। অবস্থার চাপে পড়ে পুরুষকে অনেক কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়, নারীর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তুমি ও সংকল্প ত্যাগ কর সীতা।

—আমাকে মার্জনা কর আর্যপুত্র। আমি তোমার সকল অনুরোধ রাখতে পারি। কিন্তু, এ অনুরোধ রাখতে পারব না।

—সীতা, বন অতি ভয়ংকর স্থান। বিপদ সেখানে পদে পদে। সেখানে তোমার মতো অল্পবয়স্কা নারীর বসবাস কোনক্রমেই শ্রেয় নহে।

—আর্যপুত্র, তোমার এ কথায় আমি বিস্মিত হচ্ছি, সীতা ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র যার পতি, তার আবার বিপদের ভয় কিসের? রঘুবীর রামচন্দ্র তো সকলেরই বিপদতারণ।

—সীতা, তুমি অবুঝ হয়ো না। রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বরে এবার একটু কাঠিন্যের আভাস, তুমি বনগমনের সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হও। তুমি অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে থাকলে আমি নিশ্চিন্তমনে বনগমন করতে পারব। এখানে তো মাতাপিতা আত্মীয় পরিজন সবাই আছেন।

—সবাই আছেন, কিন্তু আমার কেউ নেই। সীতা বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, আমার শুধু তুমি আছ। তুমি আমার আশ্রয়, তুমি আমার জগৎ, তুমি আমার সর্বস্ব, তোমার অস্তিত্বই আমার অস্তিত্ব।

রামচন্দ্র সীতার বিষণ্ণ বাক্যে এবার একটু বিচলিত হলেন। পিতৃসত্য রক্ষার জন্যে তাঁকে তো বনে যেতেই হবে। তিনি পুরুষমানুষ। চোদ্দবছর সময়টা তিনি কোনক্রমে কাটিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু সীতা সঙ্গে গেলে তার রক্ষণাবেক্ষণেই তো তাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হবে। এদিকে সীতা অনমনীয় জেদ ধরেছেন তার সঙ্গে যাবার জন্যে। এ অবস্থায় কি করবেন ভেবে না পেয়ে রামচন্দ্র কোমলকণ্ঠে বললেন, আমি তোমার জীবনসর্বস্ব, তা আমি জানি প্রিয়ে, কিন্তু আমার মাতাপিতা আত্মীয় পরিজন এরাও তো তোমার আপনজন।

—আমার আপনজন একমাত্র তুমি। সীতা আকুলকণ্ঠে বললেন, আমার পিতা নেই, মাতা নেই, আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, আমার শুধু তুমি আছ। আমি আজন্ম ভাগ্য বিড়ম্বিতা দুর্ভাগিনী নারী।

—একথা কেন বলছ প্রিয়ে? রামচন্দ্র সস্নেহে বললেন, মিথিলারাজ জনক তোমার পিতা, তুমি আজন্ম তাঁর আদরে-সোহাগে লালিত হয়েছ।

—সবই সত্য আর্যপুত্র। পিতা জনকের কোন তুলনা নেই। কিন্তু যজ্ঞভূমি কর্ষিতা কন্যা আর আত্মজা কন্যার প্রতি স্নেহ কি এক? আত্মজা কন্যার সঙ্গে পিতার রক্তের সম্পর্ক, কন্যার ব্যথা-বেদনায় তার নাড়ীতে পড়ে টান, আমি কি সেই স্নেহের স্বাদ পেয়েছি? মায়ের বুকভরা স্নেহ কি, তা কি আমি কোনদিন জেনেছি? আমি শুধু জেনেছি তোমার আগাধ স্নেহ মমতা ভালবাসা—তোমার মধ্যে পেয়েছি আমি সব কিছু, তোমার কাছ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে বিচ্ছিন্ন কর না।

সীতা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লেন স্বামীর পায়ের উপর।

রামচন্দ্র তাঁকে সাদরে তুলে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তবে তাই হোক প্রিয়ে। চল তুমি আমার সাথে।

* * *

সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে এসেছেন। সঙ্গে আছেন লক্ষ্মণ। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এসে সীতার মনে তিলমাত্র দুঃখ নেই। বরঞ্চ গভীর এক আনন্দ যেন তার মন-প্রাণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কত নতুন জায়গা দেখছেন, কত নতুন নতুন মানুষ দেখছেন, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হচ্ছে। তার স্বামীর জন্যে সাধারণ মানুষের মনে এত বুক-ভরা ভালোবাসা, তা বাইরে না এলে কি জানতে পারতেন? ছোটবড় ধনী-নির্ধন—সকলের একান্ত আপনজন রামচন্দ্র। গুহক চণ্ডাল থেকে বড় বড় মুনিঋষিরা পর্যন্ত তাঁর বন্ধু। সকলেই তাঁকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল। ভরদ্বাজ মুনি, অত্রি মুনি, অগস্ত্য মুনি প্রভৃতি বড় বড় মুনির আদরযত্ন ভোলা যায় না। অত্রিমুনির পত্নী অনসূয়ার মধ্যে সীতা খুঁজে পেয়েছিলেন নিজের মাকে। মায়ের স্নেহ কি সীতা জানেন না, অনসূয়ার মধ্যে তিনি পেলেন মাতৃস্নেহের স্বাদ।

বাইরে এসে সীতা খুব সুখী। রাজপ্রাসাদের গণ্ডি থেকে বাইরের বৃহত্তর জগতে এসে তিনি যেন মুক্তির স্বাদ পেলেন। রাজপ্রাসাদের স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা বনের মধ্যে নেই, বনের মধ্যে প্রতি পদে অনিশ্চয়তা অভাব অনিরাপত্তা। তবু সীতার খুব ভাল লাগে। বনের বিপদও যেন নতুন স্বাদ নিয়ে আসে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার বিপদ ঘটে গেছে।

ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত তার পিছনে লেগেছিল। কাকের রূপ ধরে এসে তার বুকে আচড়ে দিয়েছিল। স্বামী বাণ মেরে তাকে জব্দ করে দিয়েছে। আর একদিন বিরাট রাক্ষস তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। রামচন্দ্র-লক্ষ্মণ বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলেছেন।

সীতা জানেন, বনে বাস করতে গেলে এ ধরনের বিপদে পড়তে

হবে। আর বিপদে পড়লেই বা কি? সঙ্গে আছেন বিপদতারণ। তার আর চিন্তা কি।

চিত্রকূট থেকে দণ্ডকারণ্য, সেখান থেকে পঞ্চবটী বনে এলেন ওরা। জায়গাটা ভারী ভাল লাগল সীতার। চারদিকে গাছগাছালি, পাখীর কলতান, বনের মধ্যে অসংখ্য ফুল আর ফলের গাছ। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গোদাবরী নদী। চোদ্দ বছর বনের মধ্যে কাটাতে হবে। এতদিন কোন বনই পছন্দ হচ্ছিল না। এখন পঞ্চবটী বনের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সীতা বললেন, আমরা এখানেই কুটির বেঁধে বাস করি না কেন। জায়গাটা তো ভারী সুন্দর।

রামচন্দ্রেরও পঞ্চবটী খুব পছন্দ হল। সেখানেই কুটির বাঁধা হল। সীতা নতুন উৎসাহে ঘর-সংসার শুরু করলেন সেই পাতার কুটিরে। তার সুখের যেন সীমা নেই। লক্ষ্মণ বন-থেকে মিষ্টি মিষ্টি ফলমূল এনে দেন। সীতা মনের সাধে ফুল তোলেন, বনের হরিণশিশুর সঙ্গে খেলা করেন, পাখীদের আদর করেন। আসে-পাশে মুনিঋষির আশ্রম আছে। স্বামীর সঙ্গে সীতা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। এ যেন এক আলাদা আনন্দ।

সীতার মনে হয়, অযোধ্যা না ছাড়লে তো এই আনন্দজগতের সন্ধান পাওয়া যেত না।

পঞ্চবটী বনে সীতা খুব সুখী।

কিন্তু বিধাতা যাঁর ললাটে দুঃখের চিহ্ন মুদ্রিত করে দিয়েছেন, তার কাছে সুখ তো ক্ষণস্থায়ী বুদবুদ মাত্র। দুর্ভোগ তাঁর অনিবার্য নিয়তি। সীতার জীবনে দুঃখ এল এক মারাত্মক ছলনার রূপ ধরে।

কুটিরের সামনে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন সীতা। স্বামী গেছেন সোনার হরিণ ধরে আনতে। বনের মধ্যে থেকে তার আর্তকণ্ঠ শুনে দেবর লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছেন তিনি স্বামীর সন্ধানে।

লক্ষ্মণ গণ্ডি এঁকে দিয়ে গেছেন কুটিরের সীমানায়। সীতা সেই

গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন গভীর উদ্বেগ আর আকুলতা নিয়ে। গণ্ডির ওপাশে জটাজুটধারী সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল—জয় হোক! তোমার পরিচয় জানতে ইচ্ছে করি।

—আমি জনকনন্দিনী সীতা। রঘুবীর রামচন্দ্র আমার পতি।

সন্ন্যাসীবেশী রাবণের রক্তে জাগে শিহরণ। এই তাহলে সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সীতা? এর জন্যই তিনি গিয়েছিলেন মিথিলায় হরধনুতে জ্যা পরাতে? জ্যা পরাতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে তাকে ফিরতে হয়েছে। সেই অবধি সীতা আছে তার ধ্যানে তার কল্পনায়। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সীতা দেবভোগ্যা, স্থান যার স্বর্গের অমরাবতীতে, তাকে কিনা দিন কাটাতে হচ্ছে এই বনবাসে পর্ণকুটিরে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে!

সন্ন্যাসীবেশী রাবণকে চুপ করে থাকতে দেখে সীতা জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পরিচয় তো শুনলেন, আপনার পরিচয় জানতে পারি কি মুনিবর?

—আমার নাম রাবণঋষি। আমি এই বনেই সাধন-ভজন করি। ভিক্ষান্নে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়।

সীতা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে কিছু ভালো ফল এনে বললেন, আপনি এগিয়ে এসে দয়া করে এই ফলগুলি গ্রহণ করুন।

—আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহসীমানায় যাওয়া আমার নিষেধ। তোমাকেই এগিয়ে এসে এগুলি আমায় দিতে হবে।

রাবণ নিজের ঝুলি মেলে ধরলেন।

—আমি তো এই কুটিরের বাইরে যেতে পারব না ঋষিবর। সীতা অসহায় কণ্ঠে বললেন, অপনি কুটির সীমানার কাছে এসে দাঁড়ান, আমি ফলগুলি ঢেলে দিচ্ছি।

—আমি সন্ন্যাসী, গৃহসীমানায় আসতে অক্ষম। আমি চললাম। জয় হোক! এই বলে রাবণ যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

সন্ন্যাসী ভিক্ষা না নিয়ে যাবেন। এতে যে ঘোর অকল্যাণ!

—মুনিবর, যাবেন না। ভিক্ষা নিয়ে যান। সীতা আকুলভাবে ছুটে এসে গণ্ডিসীমানায় পা রাখলেন।

রাবণ বিদ্যুৎগতিতে সেখানে এসে সীতার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে তাঁকে বাইরে টেনে এনে বললেন, আমি লঙ্কার রাজা দশানন। তোমাকে আমার রাণী করতে চাই সীতা।

সীতা প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে পড়ছিলেন। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্রোধে জ্বলে উঠে বললেন, স্পর্ধা তোমার সীমাহীন দুরাচারী রাক্ষস। তোমার এই অপরাধে আমার স্বামীর হাতে সবংশে নিহত হতে হবে তোমাকে।

ইতিমধ্যে রথ এসে গিয়েছিল। রাবণ সীতাকে জোর করে ধরে রথে তুলে নিলেন। রথ ছুটতে লাগল আকাশপথে।

সীতা কাঁদতে কাঁদতে তার শরীর থেকে অলংকার খুলে মাটিতে ফেলে দিতে লাগলেন। কেউ দেখতে পেলে সেগুলি রাম-লক্ষ্মণের হাতে তুলে দেবে।

* * *

লংকাপুরীতে সীতার স্থান হয়েছে অশোককাননে।

রাবণ দুর্ধর্ষ সম্ভোগী, নারীভোগে তিনি নির্বিচার। কিন্তু সীতার ক্ষেত্রে তিনি কেন যেন অক্ষম।

সীতার জ্যোতির্ময়ী রূপের সামনে তার সমস্ত দুর্ধর্ষতা পৌরুষ পরাক্রম যেন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

কাতর ভাবে সীতার কাছে তিনি শুধু প্রেম ভিক্ষা করেন, সীতার পদতলে মাথা রেখে বলেন, আমি তোমার সেবক সীতা। সমস্ত স্বর্ণলংকা তোমার পদতলে রাখছি। তুমি আমার ঈশ্বরী। তোমাকে এখানে হরণ করে এনেছি বলে তুমি রাগ করো না দেবী। তোমার এক কণা ভালোবাসা পেলে আমি ধন্য হয়ে যাই।

সীতা রাবণের দিকে দৃকপাত না করে যেন মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

রাম ধ্যান রাম প্রাণ রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্যজনে নাহি জানে সীতা॥

বলতে বলতে সীতার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। রাবণ নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে যান।

অশোককাননে সীতার চারধারে কড়া পাহারা। ভীষণ দর্শন চেড়ীরা অণুক্ষণ অশোককানন পাহারা দিচ্ছে। সূর্পণখা এসে মাঝে মাঝে তর্জন গর্জন করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওর বেশী কিছু করার সাহস কারো নেই। তাহলে রাবণ তাকে সঙ্গে সঙ্গে বধ করবেন।

দেখতে দেখতে মাসের পর মাস কেটে যায়।

রাবণের যাওয়া-আসার বিরাম নেই। সীতার কাছে গিয়ে তাঁর ওই এক প্রার্থনা: সীতা তুমি আমার দেবী। তুমি আমার দিকে করুণাভরে তাকাও। তোমাকে পেলে আমি অন্য সব রাণীদের ত্যাগ করব।

সীতার মুখে শুধু এক কথা:

রাম ধ্যান রাম প্রাণ রাম সে দেবতা।
রাম বিনা অন্যজনে নাহি জানে সীতা॥

রাবণের ধৈর্য অপরিসীম। কিন্তু সেই ধৈর্যেও একদিন ফাটল ধরল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কত আর ধৈর্য ধরে থাকা যায়? সীতার মুখে রামনামের মন্ত্র শুনে রাবণেরও একদিন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি খড়্গ তুললেন সীতাকে কেটে ফেলবার জন্য। খবর পেয়ে ছুটে এলেন মন্দোদরী। রাবণের হাত থেকে খড়্গ কেড়ে নিয়ে বললেন, এ তুমি কি করছ? নারী বধ কর না।

—বেশ। নারী বধ করব না। রাবণ ক্রোধে কাঁপতে কাপতে বললেন, দশমাস সময় আমি অপেক্ষা করেছি। আরও দু'মাস আমি দেখব। এর মধ্যে সীতার মতি পরিবর্তন না হলে আমি কিন্তু ক্ষমা করব না।

রাবণ যখন এইরূপ আচরণ করছিলেন, তখন হনুমান ছিলেন অশোককাননে শিংশপা বৃক্ষের শাখায়। তিনি লংকা এসেছিলেন সাগর পার হয়ে সীতার সন্ধানে।

রাবণ ও মন্দোদরী চলে যেতে হনুমান চেঁচিয়ে উঠলেন, জয় শ্রীরাম! সীতা চমকে উপর দিকে তাকিয়ে হনুমানকে দেখতে পেলেন। হনুমানের মুখে রামচন্দ্রের নাম শুনে তার আনন্দ আর ধরে না।

উপর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কে?

হনুমান বললেন, আমি হনুমান, শ্রীরামচন্দ্রের দাস। তোমার সন্ধানেই আমার লংকাপুরীতে আগমন।

—তুমি যে মায়াবী রাবণের চর নও, তার কোন প্রমাণ আমাকে দেখাতে পার?

হনুমান রামচন্দ্রের দেওয়া অঙ্গুরীয় বের করে সীতার হাতে দিয়ে বললেন, এই হল প্রমাণ।

সীতা রামের অঙ্গুরীয় বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। অঙ্গুরীয়ের স্পর্শের মধ্যে যেন পতিরই পুণ্য স্পর্শ লাভ হল। সীতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, হনুমান, তুমি আমার পুত্র। রামের অঙ্গুরীয় এনে দিয়ে আমাকে নবজীবন দান করলে।

হনুমান বললেন, মা গো, তুমি আমার পিঠে বসে থাকো। আমি তোমাকে সাগর পার করে আমার প্রভুর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।

সীতা বললেন, তা হয় না বাবা। শ্রীরামচন্দ্র মহাবীর। তিনি আপন বীরত্ব ও পৌরুষে দুরাচারী রাবণকে বধ করে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান, তাই আমি চাই।

হনুমান বললেন, তাই হবে মা। আমার প্রভু রাবণ বধ করে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন। জয় শ্রীরাম!

সীতা বললেন, আমি আমার সতীত্বের সমস্ত গৌরব দিয়ে তোমাকে

আশীর্বাদ করছি বাবা, তোমার কোনদিন কোন বিপদ হবে না, তুমি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চিরজীবী হবে।

হনুমান সীতাকে প্রণাম করে চলে গেলেন। যাবার পথে করে গেলেন লংকাদহন।

* * *

রামচন্দ্র সাগর পার হয়ে বানরসেনা সহ লংকাপুরীতে এসেছেন। লংকাপুরী অবরুদ্ধ। রাবণের সেনাবাহিনী রামের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত। একে একে নিহত হলেন লংকার বড় বড় বীর। রাবণের প্রধান শক্তি বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতি নিহত হলেন। পরিশেষে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণও নিহত হলেন।

রাবণবধের পর সমুদ্রতীরে বিশাল দরবার বসিয়েছেন রামচন্দ্র। সীতাদেবী চতুর্দোলায় চেপে আসছেন পতি সন্দর্শনে। বহুমূল্যবান বস্ত্রে চতুর্দোলা চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে।

সীতাকে দেখবার জন্য হাজার হাজার বানর ঠেলাঠেলি মারামারি শুরু করে দিল। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে অসংখ্য বানরের মৃত্যু হল। বেগতিক দেখে বিভীষণ দণ্ড দিয়ে তাদের প্রহার করতে শুরু করলেন।

রামচন্দ্র বসেছিলেন দরবারের মাঝখানে। এত বড় যুদ্ধ জয় করেছেন। কিন্তু মুখে তাঁর আনন্দের জ্যোতি কোথায়? আনন্দের বদলে মুখে যেন বিষণ্ণতার চিহ্ন।

যুদ্ধের উন্মাদনায় এতদিন সীতার কথা বিশেষ মনে হয়নি। এবার সারা অন্তর জুড়ে শুধু সীতা। সীতা কেমন আছেন? দশমাস ধরে তিনি দুর্ধর্ষ রাবণের অধীনে আছেন। এই সময়ে কি তার পক্ষে সতীত্ব ও শুচিতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে? রাবণের হাত থেকে আজ পর্যন্ত কোন নারী নিষ্কৃতি পায়নি। সীতার মতো অসহায়া নারীর পক্ষে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব? কে জানাবে তাকে সঠিক উত্তর?'

সীতা সম্পর্কে যত চিন্তা করছেন, ততই তার মুখমণ্ডলে নেমে আসছে কঠিন গাম্ভীর্য।

এই সময় সংবাদ এল সীতাকে দেখবার চেষ্টায় অসংখ্য বানরের মৃত্যু হয়েছে।

শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন রামচন্দ্র। বিভীষণকে ডাকিয়ে এনে বললেন, চতুর্দোলা চারদিকে আবৃত কেন? শীঘ্র খুলে দাও বস্ত্রাবরণ। দেখুক সকলে সীতাকে। মাকে ছেলেরা দেখবে এতে কোন দোষ নেই।

বিভীষণ করজোড়ে বিনীতভাবে বললেন, প্রভু, হাজার হাজার বানর সেনা মায়ের শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

রামচন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে বললেন। যে নারী সতী, সে নিজেকে রক্ষা করতে জানে। তুমি এক্ষুণি বস্ত্রাবরণ খুলে দাও।

বিভীষণ গিয়ে চতুর্দোলার বস্ত্রাবরণ খুলে দিলেন। হাজার হাজার বানর বিস্মিত স্তব্ধ নেত্রে দর্শন করল এক আশ্চর্য রূপলাবণ্যময়ী দেবীপ্রতিমাকে।

দেবীদর্শন করে সকল স্তব্ধবাক, সকলের অন্তরে অনির্বচনীয় শ্রদ্ধা। সেই দেবীপ্রতিমা চতুর্দোলা থেকে নেমে ধীরপায়ে আসতে লাগলেন রামচন্দ্রের দিকে।

দুপাশে বিশাল সেনাবাহিনী করজোড়ে দণ্ডায়মান।

সীতা রামচন্দ্রের সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, চোখ দিয়ে দরদর করে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রু ধারা। রামচন্দ্র সীতাকে দেখে নীরব, এতদিন পর দেখা, কিন্তু চোখে-মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি নেই।

সীতা এবার মৃদুকণ্ঠে বললেন, প্রভু, আমি তোমার কাছে এসেছি। রামচন্দ্র এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এসেছ। কিন্তু না এলেই বোধহয় ভাল ছিল।

—এসব তুমি কি বলছ প্রিয়তম ?

—বড় দুঃখে বলছি সীতা। দশমাস তুমি দুর্ধর্ষ রাবণের গৃহে ছিলে। এই দশমাস তোমার আচরণ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এমতাবস্থায় তোমায় গ্রহণ করলে আমার অপযশ হবে।

সীতার চোখের সামনে একমুহূর্তে সব কিছু শূন্য হয়ে গেল। ভাঙা গলায় বললেন, আমি তাহলে কি করব ?

—তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। বানররাজ সুগ্রীব কিংবা রাক্ষসরাজ বিভীষণ এদের কারো কাছে তুমি থাকতে পার।

—তাহলে তুমি এত কষ্ট করে আমাকে উদ্ধার করলে কেন ?

—উদ্ধার করলাম এইজন্য যে উদ্ধার না করলে লোকে বলত রঘুবীর রামচন্দ্র নিজ পত্নীকে উদ্ধার করতে পারেন না। লোকে যাতে এই কথা না বলতে পারে, সেজন্যই তোমাকে উদ্ধার করেছি।

সীতা চোখের জল মুছে বললেন, আমি সতী কি অসতী, তা তোমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। তবু তুমি যখন এসব কথা আমাকে বলছ, তখন এ জীবনে আমার আর প্রয়োজন নেই। আমি অগ্নিতে আত্মাহুতি দেব।

—যা তোমার অভিরুচি। রাম নির্বিকার কণ্ঠে বললেন।

সীতা লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন, লক্ষ্মণ ভাই, তুমি অগ্নিকুণ্ড সাজাও।

লক্ষ্মণ অসহায় ভাবে দাদার দিকে তাকালেন।

রামচন্দ্র বললেন, সীতা যা বলছে তাই কর। সীতার এখন বেঁচে না থাকাই শ্রেয়।

লক্ষ্মণ বিমর্ষমুখে উঠে গিয়ে বানরদের সাহায্যে অগ্নিকুণ্ড সাজালেন। তাতে ঢেলে দেওয়া হল পাত্রভর্তি ঘৃত। কাঠে আগুন দিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

সীতা করজোড়ে বললেন—হে দেব বৈশ্বানর, মানুষের পাপপুণ্যের

তুমি সাক্ষী। কায়মনোবাক্যে আমি যদি সতী না হই, তবে তুমি আমাকে গ্রাস করো।

রামচন্দ্রকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে সীতা ধীর-শান্ত পদক্ষেপে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

চারধারে সকলে স্তব্ধ। সবার চোখে অশ্রুধারা। এক্ষুণি এই দেবী প্রতিমার সারা শরীর অঙ্গারে পরিণত হবে।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, লেলিহান আগুনের মধ্যে সীতাকে আর দেখা গেল না।

সকলে হায় হায় করে উঠল। সেই অগণিত হাহাকারের মধ্যে রামচন্দ্র বসে রইলেন নিস্তব্ধ নিশ্চুপ হয়ে।

অকস্মাৎ সেই লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে থেকে জ্যোতির্ময় দেবতা স্বয়ং বৈশ্বানর সীতাকে নিয়ে আবিভূর্ত হলেন।

সীতার দেহ অদগ্ধ, সীতার পরিধেয় বস্ত্র অবিকৃত, এমন কি তাঁর মাথায় চুলে গোঁজা পদ্মফুলও ঠিক তেমনিই আছে। সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রতিমা।

দেব বৈশ্বানর রামচন্দ্রের পানে তাকিয়ে বললেন, জগতের পাপ-পুণ্যের আমি সাক্ষী। সীতাদেবী নিষ্পাপ সতী শিরোমণি। তাঁকে কখনো দুঃখ দিও না, তাহলে সংসারে আগুন ধরে যাবে।

বৈশ্বানর অন্তর্ধান করলেন।

রামচন্দ্র এবার প্রসন্ন মুখে তাকালেন অগ্নিশুদ্ধা দেবীপ্রতিমার পানে।

* * *

রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন সীতাকে নিয়ে। অযোধ্যার প্রজাবৎসল রাজা তিনি। প্রজারা তাঁর সন্তানতুল্য।

সীতা আসন্নপ্রসবা। সারা রাজ্যে আনন্দের বার্তা। ঘরে ঘরে

শাতো মুড়িবেন না।

সুখ শান্তি। প্রজার সুখে রামের সুখ। জীবনে এই প্রথম সীতার মনে শান্তি।

কিন্তু জনমত্রুখিনী যে, তার মনে শান্তি স্থায়ী হবে কিরূপে ?

রামচন্দ্র শুনতে পেলেন, প্রজাদের একাংশ সীতা চরিত্রের শুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে।

সীতা এতদিন রাবণের ঘরে ছিলেন। তিনি কতখানি নিজেকে পবিত্র রাখতে পেরেছেন, লোকে তা নিয়ে আলোচনা করছে। রামচন্দ্র বিষণ্ন বিমূঢ়। কিন্তু কর্তব্য স্থির করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না।

ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থ অনেক বড়।

লক্ষ্মণকে ডেকে তিনি সীতাকে বনে রেখে আসতে বললেন। আর এই ব্যাপারে নিলেন একটি ছলনার আশ্রয়। সীতা অনেকদিন থেকে বাল্মীকির তপোবনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। বাল্মীকির তপোবন দেখাবার নাম করে লক্ষ্মণ তাকে নিয়ে গেলেন, আর বনের মধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ করে ফিরে এলেন।

বাল্মীকি সাদরে সীতাকে নিয়ে গেলেন তপোবনে। সেখানে সীতার লব-কুশ নামে তুই পুত্র হল।

বাল্মীকি তাদের শেখালেন রামায়ণ গান।

রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞের অশ্ব বাল্মীকির তপোবনে গেলে লব কুশ তুইভাই সেই অশ্বকে ধরল।

এর ফলে লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধ হল। যুদ্ধে রামচন্দ্র সহ অন্যান্য ভাইয়ের পতন ঘটল। বাল্মীকি তখন তপোবনে ছিলেন না। তাই এ যুদ্ধের বিবরণ কিছুই জানেন না। লব-কুশ মাকেও এ সম্বন্ধে কিছু জানায়নি। তাই সীতাও জানেন না।

যুদ্ধজয়ের পর লব আর কুশ মাকে সমস্ত কথা জানাতে সীতা হাহাকার করতে করতে ছুটে এসে পতিকুলের এই অবস্থা দেখে জ্বলন্ত চিতায় মৃত্যুবরণ করতে উদ্যত হলেন। লব-কুশও মায়ের সাথে মৃত্যুবরণে

প্রস্তুত। চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সেই আগুন দেখে ছুটে আসেন বাল্মীকি। তিনি মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চন করে সকলকে জীবন দান করেন।

রামচন্দ্র ভাইদের নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। এবার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হবে। দেশবিদেশ থেকে রাজারা এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে।

বাল্মীকি এসেছেন লব-কুশকে সঙ্গে করে।

লব-কুশ তিনদিন ধরে সুললিত মধুর কণ্ঠে রামায়ণ গান করে সকলকে মুগ্ধ করল।

সভার সকলে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, রামের চেহারার সঙ্গে লব-কুশের চেহারার আশ্চর্য মিল। বাল্মীকির কাছে রাম জানতে পারলেন লব-কুশের প্রকৃত পরিচয়। প্রকৃত পরিচয় জেনে রাম ওদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন।

সীতার জন্য তার মন ব্যাকুল। সীতাকে আনবার জন্য চর গেল বাল্মীকির তপোবনে।

সীতা বাল্মীকির সাথে চলে এলেন অযোধ্যায়।

রামচন্দ্র বললেন, সীতা তোমাকে আবার সর্বসমক্ষে চরিত্রের শুদ্ধতার পরীক্ষা দিতে হবে।

সীতা বললেন, একবার পরীক্ষা তো দিয়েছি।

রামচন্দ্র বললেন, তা দিয়েছ, তবে সে তো সাগর পারে লঙ্কায়। অযোধ্যার মানুষ সে পরীক্ষা ছাখেনি। তাদের মনে নানা সংশয়। আমার ইচ্ছা, তুমি এবার অযোধ্যার মানুষের সামনে নিজের চরিত্রের শুদ্ধতার পরীক্ষা দিয়ে দেখাও, তুমি প্রকৃতই সতী।

কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা রামকে অনেক বোঝালেন, সীতা সতী-সাবিত্রী। বারবার তার এরূপ পরীক্ষা নেওয়া মহাপাপ। তুমি সীতার চরিত্রের পরীক্ষা নিও না রাম। রামচন্দ্র কারো কথা শোনেন না। আপন সিদ্ধান্তে অটল।

বাল্মীকি বললেন, শোনো রাম, আমি সুদীর্ঘকাল তপস্যা করেছি, সেই তপস্যার দোহাই দিয়ে বলছি, সীতা নিষ্পাপ, মহাসতী, তাঁকে তুমি গ্রহণ কর।

রাম বললেন, সীতার চরিত্রে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রজাদের খাতিরে তার পরীক্ষা নিতেই হবে। সর্বসমক্ষে পরীক্ষা দিয়ে নিজের চরিত্রের শুদ্ধতা প্রমাণ করতে পারলে তাকে গৃহে বরণ করায় কোন বাধা থাকবে না।

—আমার ঘর সংসারের সকল সাধ মিটে গেছে। এবার সীতা রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সর্বগুণবান আদর্শ রাজা, তুমি এত জান, আর একথা জান না, এত মানুষের মধ্যে গৃহবধূর চরিত্রের পরীক্ষা নেওয়া তার চরম অসম্মান। এই অসম্মান সহ্য করার চেয়ে জীবন বিসর্জন শ্রেয়।

রামচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়ে নীরব হয়ে রইলেন।

সীতা আবার বললেন, আমি তোমার লজ্জা। আজ থেকে তোমার সকল লজ্জা দূর হোক। তোমার কোন দোষ নেই, দোষ আমার ভাগ্যের। তুমি নিমিত্ত মাত্র। যাবার আগে এই প্রার্থনা করে যাই, যেন জন্ম জন্ম তোমাকেই আবার পতিরূপে পাই।

এই বলে সীতা করজোড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, মাগো, এবার তুমি আমাকে কোলে স্থান দিয়ে আমার লজ্জা, আমার যন্ত্রণার অবসান ঘটাও।

সীতা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মাটি চিরে দুভাগ হয়ে গেল।

সীতা সতী সীমন্তিনী সেই মাটির গহ্বরের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেলেন।

—০—

উপেক্ষিতা ঊর্মিলা

ঊর্মিলা আজন্ম উপেক্ষিতা।

রাজা জনকের কন্যা তিনি। অথচ জনকনন্দিনী বলতে সীতাকেই বোঝায়। সীতা জনকের ঔরসজাতা কন্যা নন। যজ্ঞভূমিতে হলকর্ষণ-কালে তার আবির্ভাব।

অথচ বিশ্ববাসী সীতাকেই জানেন জনকনন্দিনী বলে। ঊর্মিলা জনকের আত্মজা হয়েও চিরদিন রয়ে গেলেন নেপথ্যের অন্তরালে। ঊর্মিলার মনে এ নিয়ে কোন ক্ষোভ নেই, নেই কোন অভিমান। জ্ঞান হওয়া অবধি তিনি দেখে আসছেন, সকলে দিদিকে নিয়ে ব্যস্ত।

মা বাবা দিদিকে দেবীজ্ঞানে পূজা করেন। শুধু মা বাবা কেন, মুনি ঋষিরা পর্যন্ত দিদিকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর অংশ মনে করেন। বাবার সাথে কত বড় বড় মুনি ঋষিরা দেখা করতে আসেন, তাদের সবার মুখেই ওই এক কথা: সীতা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর অংশ নিয়ে জন্মেছেন।

ঊর্মিলার দিকে কারো তাকাবার অবসর নেই। ঊর্মিলা বড় হচ্ছেন রাজপ্রসাদের এক কোণে নিভৃতে নিজের জগতে।

ঊর্মিলার মনে চাপা দুঃখ আছে। এত বড় প্রাসাদ, এত লোকজন, এদের মাঝে তার দিকে তাকাবার মতো কি কেউ নেই?

আর মনের কোণে তখনই ভেসে ওঠে এক লাজরক্তিম প্রত্যাশা—অন্য সব মেয়ের মতো তারও তো একদিন বিয়ে হবে আর বিয়ের পর ঘুচবে তার সকল দুঃখ যন্ত্রণা।

স্বামীর কাছে তিনি পাবেন নিবিড় ভালোবাসা আর যোগ্য সম্মান। বিয়ের পর কুমারী জীবনের এই উপেক্ষা এক মুহূর্তেই দূর হয়ে যাবে।

মধুর এক প্রত্যাশায় দিন কাটতে থাকে ঊর্মিলার।

অবশেষে এসে পড়ে সে প্রত্যাশার লগ্ন।

অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রঘুমণি রামচন্দ্র হরধনু ভেঙে ফেলেছেন অনায়াসে। পিতা মহানন্দে তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রাণপ্রতিমা সীতাকে।

রামচন্দ্র বললেন, আমরা চারভাই একই সঙ্গে জন্মেছি। আমরা একসঙ্গে বড় হয়েছি। বিবাহও করব একই পরিবারের চার কন্যাকে। পিতা জনক তো একথা শুনে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। চার কন্যা পাবেন কোথায়? কন্যা বলতে তো ওই সীতা।

তখন পুরোহিত শতানন্দ বলেছিলেন, রাজর্ষি, আপনি ভাবছেন কেন? আপনার ঘরেই তো চারকন্যা আছে। তাদের সাথে চার ভাইয়ের বিবাহ দিন।

—চার কন্যা কোথায়? জনক বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন।

—আপনার নিজের দুই কন্যা—সীতা আর ঊর্মিলা, আপনার কনিষ্ঠ ভাইয়ের দুই কন্যা মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি।

—তাই তো। একথা আমার মনেই হয়নি। জনক আনন্দের হাসি হেসেছিলেন, আমার নিজের কন্যা ঊর্মিলার কথাই মনে পড়েনি।

—পড়বে কেমন করে? পুরোহিত শতানন্দ হেসে বলেছিলেন, আসলে আপনার অন্তর আচ্ছন্ন করে আছেন সীতা মা। পূর্ণচন্দ্রের উদ্‌ভাসিত জ্যোৎস্না যেমন সবকিছুকে আচ্ছন্ন আবিষ্ট করে রাখে, সীতা মায়ের অপরূপ দীপ্তি তেমনি অপর কন্যাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

—যা বলেছেন। জনক হেসে বলেছিলেন।

তারপর তো এক শুভক্ষণে চার ভাইয়ের সঙ্গে চার বোনের বিবাহ হয়ে গেল।

রামচন্দ্র আর সীতা যে ঘরে বসেছিলেন, সেখানেই লোকজনের ভিড়। রাম সীতাকে নিয়েই পুরনারীদের যত কৌতুক আর খেলা। রামকে দেখে যেন কারো আশা মেটে না। বারবার ঘুরে ফিরে

রামসীতাকে দেখবার জন্য সকলে ভিড় করছে। তাদের ঘিরেই যত রঙ্গরস। রামের একটি কথা শুনেও যেন সবার জীবন ধন্য।

ধীরে ধীরে অতিথি অভ্যাগতদের ভিড় হালকা হয়ে এল। পুরনারীরা ফিরে গেল যে যার ঘরে। বাসরঘরে নেমে এল মধুর এক নির্জনতা। ঊর্মিলা একাকী মূল্যবান সজ্জিত পালঙ্কে বসে আছেন। দ্বারের কাছে পরিচারিকার দল। লক্ষ্মণ অনেকক্ষণ আগে চলে গেছেন দাদার সঙ্গে দেখা করে আসতে। অনুক্ষণের সাথী তিনি দাদার। সম্ভবত জীবনে এই প্রথম বাসরঘরে দাদার সঙ্গছাড়া কিছুটা সময় কাটালেন।

আরও কিছুক্ষণ পর লক্ষ্মণ ফিরলেন। তাকে দেখে পরিচারিকার দল নিঃশব্দে চলে গেল অন্তরালে।

লক্ষণ ঊর্মিলাকে একাকী বসে থাকতে চোখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, দাদার ঘরে একটু বিলম্ব হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ আপন খেয়ালে বলে চললেন, দাদা-বৌদি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ-লক্ষ্মী। লোকজন কিছুতেই ও ঘর থেকে সরতে চায় না। অনেক কষ্টে সরাতে হল। সকলেই লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলমিলন দেখে চক্ষু সার্থক করতে চায়।

ঊর্মিলা মৃদুকণ্ঠে বললেন, একই প্রাসাদে চারজন বরকনে, অথচ কত বৈষম্য। সকলের দৃষ্টি একটিমাত্র জায়গায়।

—সে তো হবেই। লক্ষ্মণ সোৎসাহে বলেন, সত্যিকার বরকনে তো দাদা বৌদি। আমরা তো ছায়ামাত্র। আর ছায়াই বা বলি কেন, আমি তো দাদার দাসানুদাস।

—তাহলে আমিও তো দিদির দাসী। ঊর্মিলা ম্লান হেসে বলেন।

—সে তো নিশ্চয়। লক্ষ্মণ হেসে এবার ঊর্মিলাকে কাছে টেনে নিলেন, আমি যদি দাসানুদাস হই, তুমি তবে দাসানুদাসী। স্বামীর স্পর্শে ঊর্মিলার শরীরে জাগল চকিত শিহরণ। চোখে যেন

বাষ্পোচ্ছ্বাস। অনেক যন্ত্রণার পর এই সম্ভবত তার প্রথম সুখের আগমনী গান।

*   *   *

না আগমনী নয়, বিসর্জন। উর্মিলার জীবনে স্বামীর আবির্ভাব চকিত বিদ্যুতশিখার মতো।

লক্ষ্মণের অধিকাংশ সময় কেটে যায় রামচন্দ্রের মহলে। সর্বক্ষণ ছায়ার মতো থাকেন তিনি দাদার সাথে। দাদার তুচ্ছতম কাজ করেও তাঁর মহানন্দ। দাদার এবং বৌদির প্রতিটি কার্য তার নিজের হাতে করা চাই। রাজপ্রাসাদে অসংখ্য পরিচারক। কিন্তু রাম ও সীতার সব কাজ লক্ষ্মণ করবেন, এর কোন অন্যথা হবার উপায় নেই।

লক্ষ্মণের নিজের প্রসাদে উর্মিলা একাকিনী বসে থাকেন স্বামীর প্রতীক্ষায়। কেটে যায় প্রতিটি উৎকণ্ঠার মুহূর্ত—লক্ষ্মণের সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই।

মাঝে মাঝে বিদ্যুৎশিখার মতো চকিত আবির্ভাব এবং তার মধ্যেই আদর সোহাগের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে আবার তার তিরোভাব।

অন্য সব মহলে আনন্দ কলতান সংগীত, শুধু উর্মিলার মহল নীরব নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ।

উর্মিলা ভাগ্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এভাবেই তাঁর জীবন কাটবে। যতটুকু স্বামীকে পাচ্ছেন, তাই ভালো।

কিন্তু তাই বা হলো কোথায়!

পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনে যাবেন। দিদি সীতাও যাচ্ছেন তার সাথে।

কিন্তু তার স্বামী লক্ষ্মণ কেন ওদের সহযাত্রী হবেন?

উর্মিলার বুকের মধ্যে অনন্ত কান্নার তরঙ্গ। চোদ্দ বছর তাকে একাকিনী বাস করতে হবে এই রাজপ্রাসাদে! বিবাহের পর কোন নারীর ভাগ্য এরকম দুর্দৈব ঘটেছে?

প্রাসাদের নির্জন কক্ষে উর্মিলা অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ কান্না অসম্মানের কান্না। স্বামী একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন না, তার নারীত্বের কোন মর্যাদা দিলেন না। যেন সাত্যই তিনি পরানুগৃহীত দাসীমাত্র, সকলের একান্ত কৃপার পাত্রী।

পালঙ্কের উপর বসে উর্মিলা নীরবে চোখের জল ফেলতে থাকেন। আর সেই সময় লক্ষ্মণ বনে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ঘরে ঢুকলেন।

—আমরা বনে যাচ্ছি, আর তুমি এই গৃহকোণে বসে চোখের জল ফেলছ।

—কি করব? উর্মিলা চোখের জলে ভেজা করুণ সুন্দর মুখখানি তুলে ধরেন, আমার কি করবার আছে?

—তোমার কি করবার আছে মানে? লক্ষ্মণের চোখে ভ্রূকুটি, দাদা বৌদি অযোধ্যা থেকে বিদায় নিচ্ছেন। সারা নগরের মানুষ সমবেত হয়েছে প্রাসাদ দ্বারে, আর তুমি রয়েছ আপন কক্ষে! ওদের বিদায় কালে তুমি প্রণাম করবে না?

—তুমিও তো যাচ্ছ ওদের সাথে।

—আমাকে তো যেতে হবেই। বনের মধ্যে আমি ছাড়া ওদের কে পরিচর্যা করবে? বিশেষ করে বৌদি, তাঁর দেখাশুনা তো আমাকেই করতে হবে।

—কিন্তু এখানে আমার দেখাশুনা কে করবে?

—বাঃ। তোমার আবার দেখাশুনা করবার কি আছে? তুমি থাকবে সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদে আত্মীয় পরিজনের মাঝখানে, এখানে অসংখ্য মানুষ আছে তোমার দেখাশুনার জন্য।

—না—কেউ নেই উর্মিলা মৃদুকণ্ঠে বললেন, মেয়েদের জীবনে স্বামীই তো একমাত্র দেখাশুনা করবার মানুষ।

—তোমার অতসব কথা শুনবার সময় আমার নেই। লক্ষ্মণ অধৈর্যকণ্ঠে বললেন, সকলে যাবার জন্য প্রস্তুত।

—তাহলে আমাকেও তোমাদের সাথে নাও। ঊর্মিলা উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর হাত ধরে মিনতি করে বললেন, আমি তোমাদের সবার পরিচর্যা করতে পারব।

—তোমার কি মতিভ্রম ঘটেছে? লক্ষ্মণ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, বৌদির প্রহরায় আমাকে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হবে। তার উপর তুমি! ওসব মতলব ছেড়ে দাও। লক্ষ্মণ হাত ছাড়িয়ে নিলেন, বনভূমির চেয়ে রাজপ্রাসাদ অনেক সুখের আশ্রয়। আমি চললাম।

লক্ষ্মণ ব্যস্তভাবে চলে গেলেন।

ঊর্মিলা অশ্রুভরা চোখে দাঁড়িয়ে রইলেন বিষাদ প্রতিমা হয়ে। কতক্ষণ কে জানে। তারপর একসময় চেতনা হারিয়ে নীচে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

* * *

দিনের পর দিন কেটে যায়। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। নিঝুম প্রসাদের নির্জন কক্ষে ঊর্মিলার বিনিদ্র প্রহরগুলি কেটে যায় শুধ্ অস্থির অবুঝ কান্নার মধ্যে। রানী সুমিত্রা এসে বধূর পাশে নীরবে বসে থাকেন। ঊর্মিলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, কাঁদিস নে মা। সবই ভাগ্য, তোর স্বামী ঠিক ফিরে আসবে। দেখিস।

ঊর্মিলা কঁাদতে কাদতে শাশুড়ীর কোলে মুখ লুকোন।

—মিথিলায় পিতৃগৃহে গিয়ে কিছুকাল থাকবি?

—না মা। আমি এই প্রাসাদ ছেড়ে কোথায় যাবো না। তিনি আমাকে এখানেই থাকতে বলে গেছেন।

—তাই থাক্ মা। অনেকগুলো বছর তো কেটে গেল। বাকী কয়েকটা বছরও কেটে যাবে দেখতে দেখতে।

* * *

দেখতে দেখতেই কেটে গেল বাকী কয়েকটা বছর। রামচন্দ্র রাবণ বধ করে বিজয়ী বেশে ফিরে এলেন অযোধ্যায়। অযোধ্যার রাজা

হলেন তিনি। লক্ষ্মণ তাঁর ছায়াসঙ্গী। শুধু ছায়াসঙ্গী নয়, তাঁর সকল আদেশের আজ্ঞাবহ।

রামচন্দ্রের আদেশে সতীলক্ষ্মী জেনেও তিনি সীতাকে বনবাস দিয়ে এলেন।

দিদির জন্য উর্মিলা অঝোরে কেঁদেছিলেন। লক্ষ্মণও তার সাথে কেঁদেছিলেন। কিন্তু করার কিছু ছিল না। রামরাজ্যে রামের পরিজন বা আপনজনেরাই শুধু কাঁদবে, অন্য সকলে হাসবে।

এরই মাঝে উর্মিলা মা হলেন। কোলে এল চন্দ্রকেতু আর অঙ্গদ—দুই ফুটফুটে শিশু। এবার দূর হল উর্মিলার নিঃসঙ্গতা। ছেলে দুটিকে নিজের মনের মতো করে মানুষ করে তুললেন।

ধীরে ধীরে ছেলে দুটি বড় হল।

রামচন্দ্র দুভাইকে দুটি রাজ্যের রাজা করে দিলেন। অঙ্গদকে দেওয়া হল মল্লরাজ্যের শাসনভার। চন্দ্রকেতুকে দেওয়া হল অশ্বদেশের শাসন দায়িত্ব। ছেলেরা রাজা হল। রাজ্য পেয়ে যে যার নিজের রাজ্যে চলে গেল।

উর্মিলার জীবনে আবার নেমে এল এল নিঃসীম একাকীত্ব। তবে এই একাকীত্ব—এই নিঃসঙ্গতা এখন আর তাকে স্পর্শ করে না। স্বামীকে দিনান্তে একবার হয়তো ক্ষণিকের জন্য দেখতে পান, কি পান না, এই তার সুখ। এই সুখটুকু নিয়েই তার জীবন। কিন্তু এই সুখটুকুও তার একদিন মিলিয়ে গেল।

কালপুরুষ এসে নিভৃতে কথা বলছেন রামচন্দ্রের সঙ্গে। দ্বারে প্রহরায় আছেন লক্ষ্মণ।

দুর্বাসা মুনি এসে বললেন, আমি রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

—সম্ভব নয় প্রভু। লক্ষ্মণ বিনীত কণ্ঠে বললেন, এখন কোনক্রমেই সাক্ষাৎ সম্ভব নয়।

—কি! এত বড় স্পর্ধা! দুর্বাসা ক্রোধে কেঁপে উঠলেন, সাক্ষাৎ করতে না দিলে এক্ষুনি অভিশাপ দিয়ে অযোধ্যা নগরী দগ্ধ করে দেবো। একটি প্রাণীও নিষ্কৃতি পাবে না।

লক্ষ্মণ পড়লেন বিপদে। এখন রামচন্দ্রকে সংবাদ দিলে রামচন্দ্র তাকে বর্জন করবেন; এইরূপ সত্য করেছেন কালপুরুষের নিকট। একদিকে তার বর্জন, অন্যদিকে সমস্ত অযোধ্যাবাসীর জীবন। বরঞ্চ তার জীবন যাক, অযোধ্যাবাসীর জীবন থাক্।

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে দুর্বাসার আগমন সংবাদ দিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বর্জন করলেন সত্য পালনের জন্য। লক্ষ্মণ পরদিন প্রাণপ্রিয় দাদা আর অযোধ্যাবাসীর কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে সরযূ নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিলেন। যেন তার জীবনটা শুধু তারই—উর্মিলার সেখানে কোন অধিকার নেই।

লক্ষ্মণ চিরতরে চলে গেলেন।

পিছনে রেখে গেলে উর্মিলাকে, এক করুণ হাহাকার-শূন্যতা আর চির উপেক্ষার মধ্যে।

—০—

মানদায়িনী মাণ্ডবী

রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ।

তার আদরিণী দুই কন্যা মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি। কুশধ্বজ অনেক ভেবে চিন্তেই কন্যার নাম রেখেছেন মাণ্ডবী। মাণ্ডবীর সব কিছুই শ্রীমণ্ডিত সৌন্দর্যময়ী। বিশেষ করে তার আচার আচরণ।

রামানুজ ভরতের সাথে বিবাহের পর মাণ্ডবী খুব সুখী। একদিনেই তিনি বুঝে নিলেন যে সবার থেকে এই মানুষটি একেবারে স্বতন্ত্র। এ রাজপুত্র হয়েও রিক্ত বৈরাগী।

বিবাহ বাসরে রাম সীতাকে ঘিরে কত আনন্দ উল্লাস, কত উৎসব। তাতে কিন্তু মাণ্ডবীর মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই। তিনি জানেন রাম-সীতা এত বড় এত উচ্চ পর্যায়ের যে তাদের ঘিরে ওই আনন্দ উৎসব স্বাভাবিক। যারা অত্যন্ত মানী তাদের তো মান দিতেই হবে।

চারদিকের উজ্জ্বল উচ্ছল উৎসব ঘনঘটার মধ্যে ভরতের শান্ত স্নিগ্ধ সংযত স্বভাব মাণ্ডবীর মনে বড় শান্তি বড় তৃপ্তি এনে দিল।

তিনি বুঝতে পারলেন অশেষ পুণ্যবলে তিনি লাভ করেছেন ভরতের মতো স্বামী যে স্বামী সবার থেকে স্বতন্ত্র।

* * *

কৈকেয়ী মা হয়ে পুত্রকে চিনতে পারেননি। তাই তার জন্যে রামকে বঞ্চিত করে রাজ্য চেয়ে বসেছিলেন।

এই সংবাদ শুনবার পর মাণ্ডবীর মন আশংকায় ভরে গিয়েছিল। এবং সেই সঙ্গে বিস্ময়েও। মা কি জানেন না পুত্রের চরিত্র? ভরত কতখানি নির্লোভ, কতটা সাত্ত্বিক, কতখানি বিষয় অনাসক্ত, তা কি কৈকেয়ী মা হয়েও বুঝতে পারেননি?

মাণ্ডবী জানতেন, এই বিষয়টি নিয়ে শেষকালে হবে মহা অনর্থ। আর শেষ পর্যন্ত তাই হল।

ভরত তো রাজ্য নিলেনই না, উপরন্তু এই জঘন্য কার্যের জন্য মাকে হত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিলেন।

অমন শান্তশিষ্ট স্নিগ্ধ মানুষটার সে কি ভয়ংকর রূপ! ঘরে এসে ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, আজ থেকে আমি মাকে পরিত্যাগ করলাম।

মাণ্ডবী স্বামীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, তোমাকে বোঝাতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা। তবু বলব, মার সম্বন্ধে অমন কথা বলতে নেই। মা সর্বাবস্থায় মা-ই।

—মা যদি অন্যায় করে, তবে মাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়।

—মা অন্যায় করলে মা সেটা নিজেই বুঝতে পারবেন। এবং তার জন্যে অনুশোচনাও তিনি করবেন।

—অনুশোচনা করলেই প্রতিকার হয় না। অন্যায়ের প্রতিকারও তো মাকেই করতে হবে।

—মাকেই করতে হবে কেন? মাণ্ডবী একটু হেসে বললেন, পুত্রও তো করতে পারে।

—কিরূপে? ভরত আগ্রহ নিয়ে তাকালেন মাণ্ডবীর পানে।

—তুমি দাদার রাজ্য দাদাকে ফিরিয়ে দাও।

—ঠিক বলেছ। ভরত উৎসাহ ভরে উঠে দাঁড়ালেন, আমি আত্মীয় পরিজন সমস্ত অযোধ্যাবাসিকে নিয়ে যাব দাদার কাছে। তার পায়ে ধরে মার্জনা চেয়ে তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দেব।

ভরত চলে গেলেন প্রস্তুতিপর্ব সারতে। স্বামীর গৌরবে ভরে উঠল মাণ্ডবীর বুক।

তারপর কয়েকদিনের মধ্যে যা ঘটল, তাতে মাণ্ডবীর গর্বের আর গৌরবের সীমা রইল না।

ভরত দাদাকে অযোধ্যায় নিয়ে আসতে পারলেন না. নিয়ে এলেন তার ধূলিধূসরিত পাদুকাযুগল।

সেই পাদুকাযুগল সিংহাসনের উপর স্থাপন করে নিজে রিক্ত বৈরাগীর বেশে নীচে বসে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন দাদার নামে। সর্বত্র প্রচার করে দেওয়া হল অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র, ভরত তার প্রতিনিধি মাত্র। পরনে তার বৃক্ষ বল্কল, শিরে জটা, আসন কৃষ্ণসার চর্ম। সারাদিন ধরে রাজকার্য পরিচালনা করে দিনান্তে সামান্য সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করেন। জীবনচর্যা পুরোপুরি মহাযোগীর। মাণ্ডবীও স্বামীর সঙ্গে ওই একই জীবন বেছে নিয়েছেন।

ভরত মাঝে মাঝে মাণ্ডবীকে বলেন, দাদার দাসানুদাস হিসাবে আমি রাজ্যের দেখাশুনা করছি, অনুক্ষণ লক্ষ্য রাখছি কোন প্রজার যাতে সামান্যতম অসুবিধা না হয়!

—তোমার শাসনে প্রজারা খুব সুখী।

—আমার শাসন কোথায় মাণ্ডবী? ভরত মৃদুকণ্ঠে বলেন, দাদাই তো সর্বক্ষণ আমার মধ্যে থেকে সব কিছু করাচ্ছেন। রাজদরবারে দাদার পাদুকাযুগলের নীচে বসে আমি দাদার রূপ ধ্যান করতে করতে সর্বকার্য সম্পাদন করি। বড় দুরূহ দায়িত্ব মাণ্ডবী, দাদা এলে তবেই এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি।

—নিষ্কৃতি নিয়ে তখন কি করবে?

—এখন অর্ধযোগী হয়ে আছি, তখন পূর্ণযোগী হতে পারব। সাধন ভজন জপ তপ আর মানব কল্যাণ এই নিয়ে থাকব। কিন্তু তুমি তখন কি করবে মাণ্ডবী?

—আমি তোমার সাথে পূর্ণযোগিনী হব।

ভরত মুখে যা বললেন, কার্যেও তাই করলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এলে ভরত তাঁর পায়ে পরিয়ে দিলেন পাদুকা-যুগল।

রামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা হলেন। ভরত সেই আগেকার মতো সাধক জীবন যাপন করতে লাগলেন।

মাণ্ডবী দুই পুত্রের জননী হলেন। তক্ষ ও পুষ্কর নাম রাখা হল তাদের। বাল্যকাল থেকেই তারা ধনুর্বিদ্যায় দক্ষ।

গন্ধর্বরাজ শৈলুষ কেকয় রাজ্যের উপর অত্যাচার শুরু করেছেন। কেকয়রাজ শত্রুজিৎ সম্পর্কে ভরতের মাতুল। রামচন্দ্রের নিকট গন্ধর্ব রাজের অত্যাচারের সংবাদ পাঠালে রামচন্দ্র ভরতকে বললেন এর প্রতিবিধান করতে।

ভরত দুইপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গন্ধর্বরাজ শৈলুষকে দমন করলেন। গন্ধর্বরাজ্য অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত হল। রামচন্দ্র গন্ধর্বরাজ্যকে দুভাগ করে তক্ষকে এক অংশের রাজা করলেন। তার নাম হল তক্ষশীলা। পুষ্করকে করলেন আর এক অংশের রাজা। তার নাম পুষ্করাবতী।

লক্ষ্মণ বর্জনের পর রাম ভ্রাতৃশোকে কাতর হয়ে পড়লেন।

ভরতকে ডেকে বললেন, ভাই, লক্ষ্মণ ছিল জীবনে আমার অনুগামী। এবার মরণে আমি তার অনুগামী হব। সরযুর জলে আমি দেহত্যাগ করব। তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর।

ভরত করজোড়ে বললেন, দাদা, আমি জীবনে লক্ষ্মণের মতো তোমার অনুগামী হতে পারিনি, কিন্তু মরণে পারব। তুমি রাজ্যভার নিতে আমাকে অনুরোধ কর না। শত্রুঘ্নকে এ ভার দাও।

রামচন্দ্র ভরতকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বেশ, তবে তাই হোক।

ভরত দাদাকে প্রণাম করে মাণ্ডবীর কাছে গেলেন।

মাণ্ডবীর এখন বয়স হয়েছে। শ্রীমণ্ডিত শ্রদ্ধেয়া সৌম্যরূপিণী।

—মাণ্ডবী, বিবাহের পর থেকে সুখে দুঃখে তুমি আমার পার্শ্ববর্তিনী। এবার বন্ধন ছিন্ন করবার সময় এসেছে।

—কি হয়েছে প্রভু? মাণ্ডবী উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

—দাদা সংসার থেকে বিদায় নিয়ে সরযু জলে দেহত্যাগ করবেন

আমিও তার অনুবর্তী হবো। তুমি অনুমতি না দিলে তো আমার ইচ্ছাকে কার্যে রূপায়িত করতে পারি না।

—তুমি বন্ধন ছিন্ন করতে চাইছ। মাণ্ডবীর মুখে স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠল, কিন্তু আমাদের বন্ধন কি ছিন্ন হবার ? তুমি ভ্রাতৃঅনুগামী হবে, এর জন্য আমার অনুমতির প্রয়োজন কি ?

—বাঃ ! প্রয়োজন নেই ? তোমার দেহ মনে যেমন আমার অধিকার, আমার দেহ মনের উপরও তোমার সম অধিকার।

মাণ্ডবী এবার করজোড়ে বললেন, তাহলে সেই অধিকার নিয়েই এই প্রার্থনা জানাই, আমি মরণেও তোমার অনুগামিনী হব। তোমার জন্যই তো আমার জীবন ধারণ। তোমার দেহত্যাগের পর আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি।

—বেশ, তবে তাই হোক। দাদার সাথে সাথে শেষ হোক আমাদের সবার জীবনলীলা।

মাণ্ডবী এবার নত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন স্বামীকে। অনেকক্ষণ পর যখন মুখ তুললেন, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। গলবস্ত্রে করজোড়ে বললেন, আজ শুধু তোমার কাছে এই বর চাইব, তোমাকেই যেন জন্ম জন্মান্তরে আমি স্বামীরূপে পাই।

ভরত মণ্ডবীর মাথায় হাত রেখে বললেন, তাই হবে মাণ্ডবী।

—o—

শুচিসুন্দরী শ্রুতকীর্তি

রাজর্ষি জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাংকাশ্যার রাজা কুশধ্বজের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রুতকীর্তি। আচার আচরণ স্বভাব যেন এক নির্মল শুচিতায় উদ্ভাসিত। দশরথপুত্র শত্রুঘ্নের সাথে বিবাহের পর অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে এসে শ্রুতকীর্তি সবার মন জয় করেছেন।

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে চারবোন এসেছেন বধূ হয়ে। চারজনের জগৎ হয়ে পড়েছে আলাদা।

দিদি সীতা প্রাসাদের মধ্যমণি। তাঁকে কেন্দ্র করে প্রাসাদের যত উৎসব আনন্দ।

উর্মিলা থাকেন নিজের মহলে নির্জনে। দিদি মাণ্ডবীর জগৎ স্বামীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

শ্রুতকীর্তি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র—রাজপ্রাসাদের সকলের সংবাদ নেন, অভাব অভিযোগ করলে তার সাধ্যমতো প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। দেবদ্বিজে অগাধ ভক্তি।

শত্রুঘ্ন একদিন বলেই ফেললেন, তুমি সার্থকনামা শ্রুতকীর্তি। সকলেই তোমার প্রসংশায় পঞ্চমুখ।

—আমি তো কোন প্রশংসার যোগ্য নই। শ্রুতকীর্তি লজ্জা পেয়ে বলেন, দিদি সীতা ছাড়া অন্য কেউ প্রশংসার যোগ্য হতে পারে, তা আমি মনে করি না।

—তুমি তোমার দিদির চেয়ে কম প্রশংসনীয় নও। শত্রুঘ্ন হেসে বললেন, তবে নক্ষত্রের যত জ্যোতিই থাক, আকাশে চন্দ্র থাকলে তার জ্যোৎস্নায় সব কিছু ঢাকা পড়ে যায়।

—অমন কথা বলো না। দিদির পার্শ্বে আমরা ক' বোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ খদ্যোৎ।

—ঠিক আমাদেরই মর্তো। দাদার পার্শ্বে আমরা ক ভাই যেমন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।

শ্রুতকীর্তি করজোড়ে রামচন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে চোখ বুঁজে অনেকটা আপন মনে বলেন, দাদা স্বয়ং বিষ্ণু অবতার। তাঁর পার্শ্বে তো সকলেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তিনি অনন্ত অতুলনীয়।

—অথচ গ্যাখ, সকলের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা—সকলের কল্যাণের জন্য সদাব্যস্ত। কি মনে করে শত্রুঘ্ন একটু হেসে ফেললেন, অবশ্যই ভাইদের মধ্যে লক্ষ্মণকেই দাদা সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন।

—যেমন ভরত দাদা তোমাকে ভালোবাসেন। শ্রুতকীর্তির মুখে কৌতুকের হাসি, নিজের থেকেও তোমার চিন্তাই তাঁর বেশী।

—সে ঠিকই বলেছ। শত্রুঘ্নর মুখে মৃদু হাসি, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছি, একত্র খেলাধূলা আহার শয়ন! এখন কত বড় হয়েছি, তবু দাদার কাছে আমি যেন সেই ছোটই আছি।

—মায়ের কাছে ছেলে, দাদার কাছে ছোট ভাই কি কখনো বড় হয়?

—আর বড়দিদির কাছে ছোট বোন?

—ও তো একই ব্যাপার, শ্রুতকীর্তি হেসে বলেন, সীতা দিদির কাছে আমি সেই ছোট্টটি আছি।

এই সময় দেবালয়ে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। শ্রুতকীর্তি চঞ্চল হয়ে বললেন, দেবার্চনার সময় হল বুঝি। আমি এখন যাই। এক ঝলক শুচিতার সুগন্ধ ছড়িয়ে শ্রুতকীর্তি চলে গেলেন।

শ্রুতকীর্তি সদাব্যস্ত কর্মতৎপর।

রাজপ্রাসাদের আত্মীয় পরিজন পরিচারক পরিচারিকাদের সুখ সুবিধার দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শ্বশুর শ্বাশুড়ী দিদিদের তত্ত্ব নেওয়া তাদের প্রয়োজনের দিকেও তার সজাগ দৃষ্টি।

এর উপর আছেন স্বামী। শত্রুঘ্ন অনেকটা খেয়ালী প্রকৃতির। ভরত থাকেন নিজের মনে। বাল্যকালে তিনি আগলে রাখতেন শত্রুঘ্নকে। কিন্তু বড় হবার পর শত্রুঘ্ন অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। মহাবীর তিনি। কোথায় কোন রাক্ষস কার উপর উপদ্রব করছে, সংবাদ পেলেই তিনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাক্ষস বধের জন্য যাত্রা করেন। রাক্ষস বধ না করা পর্যন্ত তার ঘুম থাকে না। এসন ক্ষেত্রে স্বামীকে সামলে রাখার দায় শ্রুতকীর্তির।

শ্রুতকীর্তি কাউকে দুঃখ দেন না, কারো দুঃখ তিনি সহ্য করতে পারেন না।

রামচন্দ্রের বনগমনের সংবাদ শুনে তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। অযোধ্যা রাজ্যের সুখের সংসারে যেন বিপর্যয়ের দাবানল জ্বলে উঠল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিয়ে চলে গেলেন বনে। দশরথ শোকে দুঃখে প্রাণত্যাগ করলেন। ভরত তপস্বীর বেশ ধারণ করে রাজ্য-শাসন করতে লাগলেন। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ যেন অন্ধকার শ্মশানপুরী। ঘরে ঘরে শুধু কান্না আর হাহাকার। কৌশল্যা দিবারাত্র শোককাতর। কৈকেয়ী স্তব্ধবাক পাষাণ প্রতিমা। সুমিত্রা শোক বিহ্বলা। উর্মিলা পতি বিরহবেদনায় নীরব। রাজপ্রাসাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অলিন্দে অলিন্দে ছড়িয়ে আছে বিষণ্ণতার শ্বাসরুদ্ধকারী বাতাস।

শ্রুতকীর্তি এ সময়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন প্রাসাদের সর্বত্র। সকলের পাশে গিয়ে সান্ত্বনার বাণী শোনান—সাধ্য সাধনা করে সবার মুখে তুলে দেন আহার্য দ্রব্য।

রামচন্দ্র রাবণবধের পর ফিরে এলে শ্রুতকীর্তি আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন। রামচন্দ্রের পাশে দিদি সীতাকে দেখে তার যেন আশা মেটে না। ওদের তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী নারায়ণরূপেই পূজা করেন।

ধীরে ধীরে শ্রুতকীর্তির কোলে এল দেবশিশুর মতো দুটি পুত্র

সুবাহু আর শত্রুঘাতী। পিতা শত্রুঘ্নর মতোই তারা অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করল।

মথুরা নগরীর আশেপাশে মধুদৈত্যের পুত্র লবণের উপদ্রব খুব বেশী হয়ে পড়েছে। মহামুনি ভার্গব রামচন্দ্রের কাছে বললেন, রামচন্দ্র, রাবণের ভাগ্নে মধুদৈত্যের পুত্র লবণের অত্যাচারে তো আর বাস করা যায় না। রাবণের মতোই দুর্ধর্ষ রাক্ষস এই লবণ রাক্ষস।

রামচন্দ্র ভাইদের পানে তাকাতে শত্রুঘ্ন বললেন, দাদা, তুমি অনুমতি দাও, আমি লবণকে বধ করে আসি।

রামচন্দ্র বললেন, যাও। আমার আশীর্বাদে তুমি জয়ী হবে।

শত্রুঘ্ন শ্রুতকীর্তির কাছে এসে বললেন, এবার তুমি অনুমতি দাও। আমি মথুরা অঞ্চল থেকে লবণের উপদ্রব দূর করি। লবণের অত্যাচারে সেখানকার মানুষ অতিষ্ঠ।

শ্রুতকীর্তি বললেন, তুমি মহাবীর। রাক্ষসের উপদ্রব থেকে মানুষকে রক্ষা করাই তো তোমার ধর্ম।

শত্রুঘ্ন বললেন. লবণ বড় দুর্ধর্ষ রাক্ষস। তাকে বধ করে কতদিনে ফিরতে পারব জানি না।

শ্রুতকীর্তি বললেন, আমি জানি, শত্রু বধ করে তুমি ফিরে আসবে বিজয়ীর বেশে। আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব।

শত্রুঘ্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লবণ বধ করতে চলে গেলেন। লবণের প্রধান অস্ত্র ছিল এক ভয়াবহ শূল। এই শূল হাতে নিয়ে যুদ্ধ করলে তার সাথে কেউ যুদ্ধে পেরে উঠত না।

মহামুনি ভার্গব এ তথ্য শত্রুঘ্নকে জানিয়ে দিলেন। লবণ শূলটি দেবপূজার ঘরে রেখে মৃগয়া করতে বেরিয়েছিল, এই ফাঁকে শত্রুঘ্ন সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেবপূজার ঘর ঘিরে ফেললেন।

লবণ মৃগয়া থেকে ফিরে শত্রুঘ্নকে দেখে ক্রোধে অস্থির। দুইজনে

শুরু হল ভীষণ যুদ্ধ। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে লবণাসুর বলল, আমি ক্ষুধার্ত। দেব পূজার ঘর থেকে আমাকে কিছু খেয়ে নিতে দাও।

শত্রুঘ্ন বললেন, আমিও ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্তের সঙ্গে ক্ষুধার্ত-এর যুদ্ধই তো উত্তম।

দুই জনে শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। শত্রুঘ্ন বিষ্ণু অস্ত্র প্রয়োগ করে লবণকে বধ করলেন।

তারপর বারো বৎসর ধরে মথুরা শাসন করে রামচন্দ্রের আহ্বানে ফিরে এলেন অযোধ্যায়।

শ্রুতকীর্তি ধৈর্য ধরে স্বামীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি আবার ফিরে আসবে আমি জানতাম।

শত্রুঘ্ন ম্লান হেসে বললেন, ফিরে এলাম চিরতরে চলে যাবার জন্য। দাদার সাথে আমরা সরয়ূ নদীতে দেহত্যাগ করব।

শ্রুতকীর্তি মৃদুকণ্ঠে বললেন, স্বয়ং বিষ্ণু অযোধ্যা রাজ্য থেকে চলে যাবেন। আমাদের আর থাকবার প্রয়োজন কি? আমরাও তো একই সাথে যাব।

শত্রুঘ্ন ধীরে ধীরে বললেন, এই যাওয়াই তো ভালো—আমরা সকলে এক সাথে যাচ্ছি একই জায়গায়। কেউ কারো জন্যে শোকার্ত হয়ে পড়ে থাকবো না।

শ্রুতকীর্তি স্বামীর পায়ে নত হয়ে প্রণাম করে বললেন, এবার তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর।

শত্রুঘ্ন বললেন, যুগে যুগে তোমার শুচিতার কীর্তি সর্বত্র ঘোষিত হোক।

—০—

শান্তি স্বরূপিণী শান্তা

রাজা দশরথ সম্ভোগী পুরুষ।

যখন যে রাজ্য জয় করেছেন, সেই রাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যাদের নিজের রাজ্যে নিয়ে এসে রাজপ্রাসাদে রেখেছেন। এদের কখনো মহিষীর মর্যাদা দেননি।

দুর্ভাগ্য দশরথের। এত রাজকন্যা এনেও তিনি সন্তানের পিতা হতে পারেননি। পিতা হবার সাধ তাঁর প্রবল। অথচ কোন রাজকন্যা তাকে সন্তান উপহার দিতে পারেননি।

অবশেষে ভার্গব রাজার কন্যা তাঁর সে সাধ পূরণ করলেন। রাজকন্যা প্রসব করলেন অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যা। সোনার মতো গায়ের রঙ। সুগঠনা সুলক্ষণা শান্তা।

দশরথ সন্তানের পিতা হয়ে আনন্দিত হবার পরিবর্তে হলেন ক্ষিপ্ত-প্রায়। তিনি মনপ্রাণ দিয়ে চেয়েছেন পুত্র। সূর্যবংশের উত্তরাধিকারী। অথচ পেলেন তার বদলে কন্যা

স্বর্ণবর্ণ দেহকান্তি। তাই কন্যার নামকরণ করা হল হেমলতা। শান্ত প্রকৃতির কন্যা বলে আর এক নাম শান্তা।

কন্যা হওয়ায় দশরথ বিরক্ত। শান্তা পিতৃ সমাদর থেকে বঞ্চিতা। দশরথ কন্যার দিকে ফিরেও তাকান না। তার মনে সর্বক্ষণ পুত্রচিন্তা।

বিরক্ত হয়ে স্থির করলেন, শান্তাকে কোন ব্যক্তির হাতে লালন পালনের জন্য তুলে দেবেন।

শান্তাজননী এসে কেঁদে পড়লেন, মহারাজ, শান্তাকে তুমি প্রাসাদ থেকে দূর করে দিও না। এই বিশাল প্রাসাদের এক কোণে আমাদের থাকতে দাও।

দশরথ বললেন, তুমি থাকবে, কিন্তু শান্তা থাকবে না।

—ওইটুকু শিশুর অপরাধ কি ?

—অপরাধ—ও মেয়ে হয়ে জন্মেছে।

—জন্মের উপর তো ওর কোন হাত ছিল না মহারাজ। শান্তা-জননীর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল, ও জন্মাবধি পিতার স্নেহ পায়নি। এবার কি মাতার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হবে ?

—আমি যেখানে ওর রাখবার ব্যবস্থা করব, সেখানে ও ভাল ভাবেই থাকবে। দশরথ গম্ভীর মুখে বললেন, এ নিয়ে তুমি বৃথা চিন্তা করো না।

অঙ্গরাজ্যের রাজা লোমপাদ ছিলেন নিঃসন্তান। তিনিই সাগ্রহে শান্তাকে নিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদে। কন্যার স্নেহে তাকে মানুষ করতে লাগলেন।

শান্তা আপন পিতাব কাছ থেকে যে স্নেহ পায়নি, পালক পিতার কাছে সেই স্নেহ পেয়ে বড় হতে লাগল।

শান্তা যেন মূর্তিমতী শান্তি। সুন্দরী লাবণ্যময়ী। তার সৌন্দর্যের মধ্যে রয়েছে চাপা বিষণ্ণতা। এই বিষণ্ণতা যেন তাকে আরও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তুলেছে।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পেরেছে, নিছক কন্যা হবার জন্যই তার বিশ্বখ্যাত পিতা দশরথ তাকে ত্যাগ করেছেন। রাজা লোমপাদ তাকে কন্যার মতো স্নেহ করেন, কিন্তু আসলে সে এখানে আশ্রিতা মাত্র। রাজকন্যার মর্যাদা সে কখনো পায়নি।

শান্তা থাকে আপন মনে। সকলের সব কাজে সাহায্য করে। কারো কাছে তার কিছু চাওয়ার নেই।

রাজা লোমপাদ মাঝে মাঝে তাকে বলেন, মা শান্তা, তোমার কিছু চাইবার থাকে তো বলো।

শান্তা হেসে বলে, না বাবা, আমার তো কিছু চাইবার নেই। আপনি তো না চাইতেই আমাকে সবকিছু দিয়েছেন।

—বাবা মাকে দেখতে ইচ্ছে করে ?

—না বাবা। এখানে আপনারাই তো আমার বাবা মা।

রাজা লোমপদ আর কিছু বলেন না। তিনি কিছু কিছু বুঝতে পারেন শান্তার দুঃখ। দশরথ সেই যে মেয়েকে তার কাছে রেখেছেন, আর কোনদিন মেয়ের খোঁজ খবর নেননি।

অঙ্গরাজ্যে শুরু হল দারুণ খরা। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। নদী নালা সরোবর শুকিয়ে গেল। চারিদিক যেন রোদের তাপে ঝলসে যায়। গাছপালা পুড়ে ছাই। এক ফোঁটা জলের জন্য সর্বত্র করুণ হাহাকার।

কে পারে এই খরা দূর করতে ? কে পারে যজ্ঞ করে খরার রাজ্যে বৃষ্টি আনতে ?

ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ বললেন, বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি পারেন যজ্ঞ করে খরার রাজ্যে বৃষ্টি আনতে।

লোমপাদ বললেন, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কে ?

—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তরুণ ঋষি। মহাতেজস্বী বিভাণ্ডক ঋষি একবার উর্বশীকে দেখে কামাতুর হয়েছিলেন। ফলে দৈবনিবন্ধে এক হরিণীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। অপূর্ব সুন্দর কিশোর—শাস্ত্র পারঙ্গম।

—তাহলে তাকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করুন।

—সে অসম্ভব। বিভাণ্ডক ঋষি সর্বদা তাকে আগলে রাখেন। পুত্রকে আনলে তিনি অভিশাপ দিয়ে সব কিছু পুড়িয়ে দেবেন।

—ওসব আমি বুঝিনা। যে ভাবেই হোক, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার রাজ্যে বর্ষণ চাই।

ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনবার জন্য অনেকগুলি সুন্দরী বারাঙ্গনাকে নিয়োজিত করলেন।

তারা কয়েকটি সুন্দর নৌকা সাজিয়ে নানারকম লোভনীয় খাদ্যবস্তু ও ফল নিয়ে বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে চলে গেল। বিভাণ্ডক মুনি

আশ্রমে ছিলেন না। বারাঙ্গনার দল আশ্রমে যেয়ে নানা ছালকলায় কিশোর ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলিয়ে ফেলল। ঋষ্যশৃঙ্গ এর আগে কোন নারী দেখেননি। সুন্দরী বারাঙ্গনার দল তাকে কাছে টেনে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দিল। সেইসঙ্গে খেতে দিল সুন্দর খাদ্যবস্তু ও ফলমধু।

ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন, তোমরা নিশ্চয় দেবতা। আমি বহুপুণ্য বলে তোমাদের দেখা পেলাম। তোমরা আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

বারাঙ্গনা বলল, বেশ তো। তুমি প্রস্তুত হয়ে থেকো। আমরা কাল এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

বারাঙ্গনার দল আসলে দেখতে চেয়েছে, বিভাণ্ডক মুনি এসে সব কথা শুনে কি করেন।

বারাঙ্গনার দল ঋষ্যশৃঙ্গকে আদর করে নৌকায় ফিরে গেল। সন্ধ্যাবেলা বিভাণ্ডক মুনি ফিরে এলে ঋষ্যশৃঙ্গ বলল, পিতা, আজ স্বর্গলোক থেকে দেবতারা আশ্রমে এসেছিলেন। কি তাদেব রূপ! কি কোমল তাদের দেহ! আমাকে যখন আদর করল, মনে হল স্বর্গসুখ পাচ্ছি।

বিভাণ্ডক বললেন, বাবা, ওরা দেবতা নয়। দেবতারা আশ্রমে আসেন না। নিশ্চয় কোন রাক্ষসীর দল তোমাকে ভোলাতে এসেছিল, খুব সাবধান থাকবে। ওরা ডাকলেও কাছে যাবে না।

—আমার যে ওদের সাথে চলে যেতে ইচ্ছে করছে পিতা।

—না বৎস, যেও না। ওদের সঙ্গে গেলে বিপদ হবে।

—আমার যে যেতে ইচ্ছে করছে পিতা।

—যেওনা বৎস।

বিভাণ্ডক মুনি পরদিন সকালে আবার সাধনায় চলে গেলেন। পুত্রকে পাহারা দিয়ে বসে থাকলে তার চলবে না।

বিভাণ্ডক মুনি চলে যেতেই বারাঙ্গনার দল আবার এসে উপস্থিত।

ঋষ্যশৃঙ্গ ওদের কাছে এসে বললেন, তোমরা এসেছ আমি তোমাদের সাথে যাব। পিতাকে বলেছি।

বারাঙ্গনার দল আর বিলম্ব করল না। ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে নৌকায় তুলে সোজা অঙ্গরাজ্যে এসে হাজির হল।

ঋষ্যশৃঙ্গ এর আগে কখনো জনপদে আসেননি। রাজধানীতে রাজ প্রাসাদ জাকজমক চারধারে সুবেশ সুসজ্জিত মানুষজন দেখে তিনি তো মুগ্ধ।

রাজপ্রাসাদে স্বয়ং রাজা লোমপাদ তাকে অভ্যর্থনা করে পাদ্য অর্ঘ্য দান করলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ অবাক হয়ে বললেন, আপনি কি দেবরাজ ইন্দ্র?

লোমপাদ হেসে বললেন, না সুভদ্র, আমি অঙ্গরাজ্যের রাজা লোমপদ।

ঋষ্যশৃঙ্গ বলল, আমাকে যে দেববৃন্দ স্বর্গলোকে যাবার নাম করে নিয়ে এলেন।

লোমপদ করজোড়ে বললেন, হে ঋষিকুমার, আমার রাজ্য অনাবৃষ্টিতে ধ্বংস হবার মুখে। তুমি যজ্ঞ না করলে এখানে দেবরাজ ইন্দ্র বৃষ্টি দেবেন না। তাই তোমাকে কিঞ্চিৎ ছলনার আশ্রয় নিয়ে এখানে আনা হয়েছে। আমি সেজন্য মার্জনা চাইছি। তোমাকে যজ্ঞকার্য সমাধা করতে হবে।

ঋষ্যশৃঙ্গ সরলস্বভাব। রাজার বিনম্র আচরণে খুশি হয়ে বললেন, বেশ। আমি যজ্ঞকার্য সমাধা করব। আপনি আয়োজন করুন।

রাজা লোমপদ বিশাল যজ্ঞের অয়োজন করলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মুনিঋষির কাছে নিমন্ত্রণলিপি নিয়ে দূতের দল চলে গেল।

রাজপ্রাসাদের সুসজ্জিত মহলে ঋষ্যশৃঙ্গের বাসের ব্যবস্থা হল।

শান্তাকে ডেকে লোমপাদ বললেন, মা, ঋষ্যশৃঙ্গকে কি ভাবে এখানে ভুলিয়ে আনা হয়েছে সব তো তুমি জান। আমার ইচ্ছা, এবার তুমি তার পরিচর্যার ভার নাও।

—আমি কি পারব পিতা?

—একমাত্র তুমিই পারবে মা। লোমপাদ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, ঋষ্যশৃঙ্গ সমগ্র রাজ্যের রক্ষাকর্তা, তার উপরই নির্ভর করছে রাজ্যের জীবনমরণ। তার যাতে এতটুকু অসুবিধা না হয়, সে তুমি ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না।

—বেশ। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব পিতা।

শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গের পরিচর্যায় মনপ্রাণ ঢেলে দিল। দুদিনেই বুঝতে পারল, এ কিশোর বনের হরিণের মতোই সরল সহজ ও সুন্দর। ঋষ্যশৃঙ্গের উপর অদ্ভুত একটা মায়া জন্মে গেল। অপর পক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনেও এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে তিনি যে সব বারাঙ্গনা নারী দেখেছিলেন, তাদের সাথে এর আকাশ পাতাল পার্থক্য। এ কাছে এসে অঙ্গের স্পর্শে পাগল করে তোলে না, কথাবার্তা ভাবভঙ্গীর মধ্যে নেই কোন কুশ্রী ইঙ্গিত—এ যেন স্নিগ্ধ শান্ত মমতাময়ী সত্যিকার এক সৌন্দর্য দেবী।

ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে বসে শান্তা যখন দেবপূজার জন্য ফুলের মালা গাঁথে, তখন মনটা যেন জুড়িয়ে যায়।

শান্তার অধিকাংশ সময় কেটে যায় ঋষ্যশৃঙ্গের পরিচর্যায়। তাঁর যাতে এতটুকু অসুবিধা না হয়, যেদিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ঋষ্যশৃঙ্গ খুব সুখী। এতদিনে তিনি লোকালয়ের রীতিনিয়ম অনেক জেনে গেছেন। নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন।

একদিন রাজা লোমপাদকে বললেন, মহারাজ, আপনার যজ্ঞ আমি সমাপ্ত করব। তবে একটি শর্ত, আপনার কন্যা শান্তাকে আমি পত্নীরূপে পেতে চাই।

—মুনি কুমার, শান্তা আমার কন্যা নয়। অযোধ্যারাজ দশরথ তার পিতা। কন্যা বিবাহে তাঁর অনুমতি প্রয়োজন।

শান্তা একটু দূরে বসে চন্দন ঘষছিল। এবার উঠে এসে বিনম্র কণ্ঠে বলল, যে পিতা জন্মের পর আমাকে ত্যাগ করলেন, আমার কোন সন্ধান রাখলেন না, সে পিতার অনুমতি মূল্যহীন। এ ক্ষেত্রে আপনার অনুমতিই যথেষ্ট পিতা।

—আমি হৃষ্টচিত্তে অনুমতি দিচ্ছি মা। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি রাজকন্যা, রাজার গৃহে বড় হয়েছ। তুমি কি পারবে মুনিকুমারের দরিদ্র সাধারণ জীবনযাত্রাকে মেনে নিতে?

—পারব। শান্তা মৃদুকণ্ঠে বলল, রাজকন্যার এ মিথ্যা পরিচয় ত্যাগ করে এবার আমি সাধারণ পরিচয়ে পরিচিত হতে চাই পিতা, এতেই আমার সুখ, এতেই আমার শান্তি। রাজা দশরথের কন্যা পরিচয় আমার মধ্যে থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাক।

শান্তা রাজা লোমপাদকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। রাজা লোমপাদ হাত তুলে বললেন, তোমরা দুজনে সুখী হও।

—০—

বিদ্যুৎ বহ্নি বেদবতী

একি আশ্চর্য কাণ্ড।

সদ্যোজাতা কন্যার কণ্ঠে ক্রন্দনের বদলে অপূর্ব সুললিত বেদগাঁথা। সুমিষ্ট সংগীতের মতো বৈদিক মন্ত্র ভেসে আসছে সদ্যোজাতা কন্যার কণ্ঠ থেকে।

সূতিকা গৃহের মধ্যে কন্যার মা সদ্য প্রসূতি মালাবতী বিস্ময়ে স্তম্ভিত। অন্যান্য পুরনারী নির্বাক।

ওদিকে বহিরঙ্গনে ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজও বিস্মিত স্তম্ভিত। যে বৈদিক মন্ত্র বহুযত্নে বহু আয়াসে আয়ত্ত করতে হয়, তা কি রূপে তার কন্যার কণ্ঠে উদগীর্ণ? তবে কি স্বয়ং লক্ষ্মী তার গৃহে আবির্ভূতা হলেন? কুশধ্বজ দীর্ঘকাল তপস্যা করেছেন লক্ষ্মীকে কন্যারূপে পাবার জন্য? তবে কি লক্ষ্মী এতদিনে সন্তুষ্ট হলেন?

কুশধ্বজ দ্রুতপায়ে চলে গেলেন পিতা মহর্ষি বৃহস্পতির কাছে। বৃহস্পতি তপোসিদ্ধ। বার্ধ্যকহেতু এখন তপোবন নিবাসী।

কুশধ্বজ পিতার কাছে গিয়ে বললেন, পিতা, এ কি অলৌকিক কাণ্ড! সদ্যোজাতা কন্যার কণ্ঠে বেদমন্ত্র!

বৃহস্পতি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বৎস কুশধ্বজ, তুমি মহাসৌভাগ্যবান। স্বয়ং লক্ষ্মী আবির্ভূতা তোমার গৃহে।

—আপনি কিরূপে জানলেন পিতা?

—তপঃ প্রভাবে বহুকাল পূর্বেই আমি জানতে পেরেছিলাম, আমার বংশ লক্ষ্মীদেবীর অবির্ভাবে ধন্য হবে। স্বয়ং লক্ষ্মদেবী তোমার কন্যারূপে জন্ম নিয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর

আবির্ভাবের কথা। কণ্ঠে বেদগাঁথা নিয়ে আবির্ভূতা এই কন্যার নাম রেখো বেদবতী।

* * *

বেদবতী ধীরে ধীরে বড় হচ্ছেন।

আশ্চর্য তাঁর রূপলাবণ্য। তপ্তকাঞ্চন দেহবর্ণ, অপূর্ব সুগঠনা সুলক্ষণা কন্যা। যে ছাখে সেই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। একন্যা শুধু রাজগৃহেই শোভা পায়।

বেদবতীর মা মালাবতী কন্যাকে আদর করে বলেন, তোকে আমি রাজপুত্রের সাথে বিয়ে দেব মা।

বেদবতী বলেন, রাজপুত্র কেন মা? রাজপুত্রের চেয়েও যিনি অনেক অনেক বড়, তার সাথে আমার বিয়ে দিও।

—রাজপুত্রই তো পরে রাজা হবে। তুই হবি রাজরাণী।

—আমি রাজরাণী হতে চাইনা মা, বেদবতী মৃদু হেসে বলেন, রাজাদের যিনি রাজা, যার উপর আর কেউ নেই, তাঁরই রাণী হতে চাই আমি।

—সে রকম রাজা কি আছেন?

—আছেন মা আছেন, বেদবতী যেন নিজের মনে বলেন, রাজাদেরও যিনি রাজা, দেবতাদেরও যিনি দেবতা, যার উপর আর কেউ নেই, তিনি আছেন।

—কে সে?

—তিনি ভগবান বিষ্ণু। আমি তাঁকেই স্বামিরূপে পেতে চাই।

—ভগবান বিষ্ণুকে কি স্বামিরূপে পাওয়া যায়? মালাবতী বিস্মিত কণ্ঠে বললেন।

—কেন পাওয়া যাবে না মা? স্বামিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করলে তবেই পাওয়া যায়। কঠোর তপস্যায় তিনি ধরা দেবেন।

—তুমি এসব সংকল্প ত্যাগ কর মা। মালাবতী কন্যার পিঠে হাত

বুলিয়ে বললেন, আমরা দরিদ্র তপোবনবাসী। শুধুমাত্র সৎপাত্র পেলেই আমরা সন্তুষ্ট। ভগবান বিষ্ণু আমাদের কল্পনার বাইরে।

—কল্পনার বাইরে কেন মা? কঠোর তপস্যায় সিদ্ধি অনিবার্য। আমি পুষ্করতীর্থে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুকে স্বামিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করব।

* * *

বেদবতী সত্যিসত্যি পুষ্করতীর্থে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। মালাবতী ও কুশধ্বজ শঙ্কিত আতঙ্কিত। এই অল্পবয়েসী অপূর্ব রূপবতী কন্যা নির্জন দুর্গম পুষ্করতীর্থে একাকিনী তপস্যা করবে, কত বিপদ আপদ ঘটতে পারে। এ কি করে হয়?

কুশধ্বজ কন্যাকে বোঝালেন, মা, তুমি পুষ্করতীর্থে গিয়ে তপস্যার সংকল্প ত্যাগ কর। পুষ্করতীর্থ যেমন দুর্গম তেমনি নির্জন স্থান। শুনেছি ভয়ংকর বিপদসংকুলও বটে।

—বাধা বিঘ্ন বিপদের মধ্যে তপস্যা করে শ্রেয়লাভই তো শ্রেষ্ঠ তপস্যা পিতা।

—কন্যা, তুমি বুঝতে পারছ না। নারীর বিপদ পদে পদে। নারীর দেহই তার প্রধান শত্রু এবং প্রধান বাধা। এই বাধার জন্যই নারীর পক্ষে তপস্যা করা সম্ভব হয় না।

—এই বাধা আমি জয় করব পিতা।

—নির্জন স্থানে তুমি তপস্যা করবে, কত দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ তোমাকে আক্রমণ করতে আসবে। তুমি কি করে আত্মরক্ষা করবে?

—আমার সাধনা দিয়ে। আমার চারধারে শুচিতা আমার বর্ম হয়ে অগ্নিবলয়ের মতো আমাকে ঘিরে রাখবে। কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

—কন্যা, আমি তোমাকে মিনতি করছি, পুষ্করতীর্থে তপস্যা করার

সংকল্প ত্যাগ করে তুমি তপোবনের মধ্যেই বিষ্ণুলাভের জন্য তপস্যা কর।

—তপোবনের নিরাপদ আশ্রয়ের তপস্যায় ভগবান ধরা দেন না পিতা। বেদবতী হেসে বলেন, কঠোর সাধনার মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়, সে তো আপনি জানেন। আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

কুশধ্বজ আর কিছু বলতে পারেন না। কন্যার সংকল্প অপরিবর্তনীয়, তা তিনি বুঝতে পারলেন। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, বেশ, আমি অনুমতি দিলাম। তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক।

বেদবতী চলে গেলেন পুষ্করতীর্থে।

শুরু করলেন বিষ্ণুর উদ্দেশে কঠোর তপস্যা। দিন নেই রাত নেই, শুধু বিষ্ণুধ্যান।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। বেদবতী আপন তপস্যায় অনড় অচঞ্চল। অকস্মাৎ একদিন আকাশ থেকে দৈববাণী ভেসে এল: বেদবতী, তোমার তপস্যায় ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট। তুমি জন্মান্তরে তাঁকে স্বামিরূপে লাভ করবে। তুমি গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে এবার তাঁর ধ্যান কর।

বেদবতী এবার গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে বিষ্ণুর ধ্যানে মগ্ন হলেন। অন্তরে তার মহাসুখ। জন্মান্তরে তিনি বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করবেন। এ জন্ম যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়, ততই ভালো। বেদবতী এ জন্ম শেষ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। গন্ধমাদন পর্বত পুষ্করতীর্থের চেয়ে আরও অনেক অনেক বেশী নির্জন এবং বিপদসংকুল। চারধারে অসংখ্য বন্য জন্তু ও দৈত্য দানবের বাস।

বেদবতী নির্জনস্থানে একাকিনী তপস্যামগ্ন। আশ্চর্য! বন্য শ্বাপদ বহু দূর থেকেই সরে যায়। কিন্তু শ্বাপদের চেয়েও ভয়ংকর রাক্ষস মাঝে মাঝে উপদ্রব করতে আসে।

বেদবতী তপঃসিদ্ধা যোগিনী। তাঁর রূপলাবণ্য পূর্বের চেয়ে

অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্যামল বনানীতে পর্বতমালার মধ্যে উজ্জ্বল বিদ্যুতের দীপ্তি নিয়ে তিনি বিরাজমানা। তার অলৌকিক রূপ যৌবন লাবণ্যের কথা লঙ্কেশ্বর রাবণের কানে গেল।

রাবণ ভোগী রাজা। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জয় করে সর্বশ্রেষ্ঠ কন্যাদেরও তিনি জয় করেছেন।

নির্জন পর্বতবাসিনী তপস্বিনী বেদবতীর কথা শুনে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। লঙ্কা ত্যাগ করে সৌম্যদর্শন এক ঋষির ছদ্মবেশে তিনি উপস্থিত হলেন গন্ধমাদন পর্বতে। তপস্যারতা বেদবতীকে দেখে তিনি বিস্মিত। এই আশ্চর্য রূপবতী যুবতী এখানে কিসের তপস্যা করছে? কাকে চায় সে? একে ভোগ না করতে পারলে জীবনই তো বৃথা। রাবণ দেব দানব নরগৃহে অনেক কন্যা দেখেছেন, কিন্তু এত অলৌকিক রূপলাবণ্যময়ী কন্যা দেখেননি। একে যে করেই হোক, অধিকার করতে হবে।

রাবণ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—অতিথি সমাগত!

রাবণের কণ্ঠস্বরে বেদবতী চোখ খুলে রাবণকে দেখতে পেলেন।

রাবণের সৌম্যশান্ত ঋষিরূপ দেখে বললেন, কে আপনি সুভদ্র?

—আমি তপোবনবাসী ঋষি। ক্ষুধার্ত অতিথি। অতিথি আপ্যায়নের আয়োজন কর।

—আপনি এখানে উপবেশন করুন। বেদবতী রাবণকে বসবার জন্য আসন দিয়ে বললেন, আমি বন থেকে আপনার জন্য কিছু ফলমূল আহরণ করে আনি।

—তুমি এই নির্জন পর্বতে কিসের তপস্যা করছো সুন্দরি?

—ভগবান বিষ্ণুকে পতিরূপে পাবার জন্য আমি তপস্যা করছি।

—ভগবান বিষ্ণু তো শুনেছি অতিবৃদ্ধ। তাঁকে স্বামীরূপে পেয়ে তোমার কি লাভ হবে?

—ও কথা বলবেন না মহাভাগ। বেদবতী নম্রকণ্ঠে বললেন, ভগবান

বিষ্ণু চিরপ্রবীণ চিরনবীন অনন্ত করুণাকর পরমগতি। তাঁকে পতিরূপে পেলে আমার জীবন ধন্য হবে।

এই বলে বেদবতী ফলমূল আনবার জন্য বাইরে যেতে উদ্যত হলে রাবণ অকস্মাৎ তার হাত ধরে সবলে কাছে টেনে নিলেন। বেদবতীর দেহ মুহূর্তের মধ্যে কঠিন নিশ্চল হয়ে পড়ল। কঠিন কণ্ঠে বললেন, একি অশিষ্ট আচরণ আপনার ঋষিবর ?

—ঋষিবর ! হা-হা-হা। অট্টহাসি হেসে রাবণ এক টানে তার ছদ্মবেশ অপসারণ করে বললেন, ঋষিবর কে ছ্যাখ। আমি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণ। তুমি আমার ভোগ্য নারী। এস আমার বক্ষে এস।

বেদবতী এক ঝটকায় রাবণের হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গেলেন। ধক ধক করে জ্বলতে লাগল তার বিশাল সুন্দর আয়ত আঁখি। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দেহ যেন বিদ্যুৎতের মতো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসে বক্ষ আন্দোলিত হতে লাগল।

রাবণ তাকে ধরবার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দিলেন।

কঠিন কণ্ঠে গর্জন করে উঠলেন বেদবতী, পাষণ্ড দুরাচারী রাক্ষস ! তিষ্ঠ।

সঙ্গে সঙ্গে রাবণ যেন জরাগ্রস্ত হয়ে গেলেন। তার দু' হাত ওই ভাবে সামনের দিকে বাড়ানোই রয়ে গেল। পা দুটো যেন কেউ মাটির সঙ্গে গেঁথে দিল। এক নিমেষে রাবণ যেন পাথরের মূর্তি। তার আর বিন্দুমাত্র নড়বার ক্ষমতা নেই।

—তোমার এত স্পর্ধা, যে দেহ বিষ্ণুভোগ্য, সেই দেহকে তুমি রাক্ষস হয়ে স্পর্শ করবার সাহস ধর। তুমি ওইভাবে প্রস্তরীভূত হয়ে থাক।

রাবণ ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন, এ তপস্বিনী অসাধারণ। এর তপঃপ্রভাবে তাকে এভাবে চিরকাল প্রস্তর হয়ে থাকতে হবে।

তাই তিনি এবার স্তুতি শুরু করলেন, দেবী, আমার অন্যায় হয়েছে,

তুমি আমাকে মার্জনা কর। আমাকে এ প্রস্তরীভূত অবস্থা থেকে মুক্তি দাও। আমাকে কৃপা কর।

বেদবতী বললেন, তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও জানিয়ে রাখছি, জন্মান্তরে আমি যার পত্নী হব, তার হাতেই তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। তুমি এবার চলে যাও।

মুক্তি পেয়ে রাবণ সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন।

বেদবতী আশ্রমের সামনে কাঠের উপরে কাঠ সাজালেন। সেই কাঠে অগ্নিসংযোগ করলেন। দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগল রক্তিম লেলিহান শিখা নিয়ে।

এবার বেদবতী অগ্নি প্রদক্ষিণ করে করজোড়ে বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন, এ দেহ রাক্ষসের স্পর্শে হয়েছে অপবিত্র, তাই এ দেহ আমি রাখতে চাই না। জন্মান্তরে যেন তোমাকে পতিরূপে পাই, এই প্রার্থনা নিয়ে আমি অগ্নিতে দিচ্ছি আত্মাহুতি।

এই বলে বেদবতী ধীর শান্ত পদক্ষেপে তার সেই বিদ্যুৎদীপ্ত বহ্নিরূপ নিয়ে লেলিহান বহ্নিশিখার মধ্যে প্রবেশ করে তার সাথে একাকার হয়ে গেলেন।

—০—

শ্রদ্ধা শ্রেয়সী শবরী

চারধারে উঁচু উঁচু পাহাড়। ঘন বন জঙ্গল।

তার মাঝে শবর পল্লী। শবর জাতি শিকার প্রিয়। দিনের বেলা বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তারা নানা জীবজন্তু শিকার করে। রাতের বেলা মদ খেয়ে নাচগানে মেতে ওঠে।

শবর সমাজের জীবন ধারা সহজ সরল স্বাভাবিক। বনজঙ্গল পাহাড়ের মতোই তাদের জীবনে কোন আবরণ নেই। কোন লুকোচুরি নেই। প্রেম ভালোবাসা কামনা বাসনা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রোধ ক্ষোভ বন্য জীবজন্তুর মতোই স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক।

এই শবর পল্লীর যৌবনোচ্ছল যুবতী শবরী। সুন্দর সুঠাম শরীরে উদগ্র যৌবনের মদিরতা।

শবরী শবর যুবক্‌দের কাম্যকন্যা। শবর পল্লীর সেরা শবর যুবকও শবরীকে পাবার জন্যে ব্যাকুল।

শবরী মোহময়ী যুবতী। পুরুষ মানুষের মন সে ভালোমতই জানে। তাকে দেখলে বুড়ো গুড়ো পুরুষরা কিরূপ পতঙ্গের মতো তার দিকে ছুটে আসে, তা সে সব সময়ই ছাখে। পুরুষদের নাচিয়ে শবরী খুব মজা পায়।

এই বয়সে সে বহু পুরুষের ভোগ্যা হয়েছে, কিন্তু কোন পুরুষের কাছে সে ধরা দেয়নি। কত শবর যুবক তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছে, শবরী কারো ঘরণী হতে চায়নি। সে স্বেচ্ছাবিহারিণী স্বাধীনা।

বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক দেখে মোহজাল বিস্তার করে তার বহুপাশে ধরা দেয়। তাও ক্ষণিকের জন্য।

শববীর মধ্যে কোন গোপনতা নেই। কোন কৃত্রিমতা নেই। মন যা চাই তাই সে করে।

পুরুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার কি এক তীব্র নেশায় সে যেন দিনরাত জ্বলে।

মাঝে মাঝে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে পাহাড়গুলোর দিকে। পাহাড়ের ও ধারে আছে জনপদ। সেখানে থাকে উচু জাতির মানুষ। সুন্দর তাদের বেশভূষা, বিচিত্র তাদের কথাবার্তা। শবরী ভালোমতই জানে ওই সব মানুষরা তাদের মতো নীচু জাতিকে ঘৃণা করে। তাদের ছায়া স্পর্শ করলে ওরা আবার স্নান করে। মুখোমুখি পড়ে গেলে অসভ্য ইতর বলে গালাগাল দেয়।

আবার ওই সব সুন্দর সুবেশ মানুষরাই রাতের আঁধারে তার কাছে ছুটে আসে তাকে একটু পাবার জন্যে। রাতের আঁধারে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে তার দয়া চায়।

শবরীর জীবনে এরূপ অভিজ্ঞতা অনেক হয়েছে। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তো তার মনের জ্বালা এত ভয়ংকর হয়ে পড়েছে।

শবরী কোনদিন কি ভুলতে পারবে সেই ঘটনার কথা?

কৈশোর উত্তীর্ণা নিষ্পাপ বালিকা সে। মনের মধ্যে কত আশা কত কল্পনা।

সখিদের সঙ্গে জনপদে যায় বনের ফলমূল জীবজন্তুর চর্ম ও মাংস বিক্রির জন্য।

জনপদের এক সম্পন্ন গৃহস্থ গৃহিণী প্রতিদিন তার কাছ থেকে ফল মূল কিনতেন।

তার সুন্দর কিশোর পুত্রকে দেখে শবরীর ভালো লেগে গেল। শববীর মনে মনে ইচ্ছে হয়, দু' দণ্ড তার কাছে বসে বসে সে গল্প করে।

কিন্তু গৃহিণী বাড়ীতেই তাকে ঢুকতে দেননা। ফলমূল নিয়ে মূল্য দিয়ে পথ থেকেই তাকে বিদায় করে দেন।

একদিন গৃহিণী আসেননি। সেই কিশোর বালক এল ফল নিতে। শবরীর বুকের রক্তে জাগল শিহরণ। কিশোরের হাতে ফলগুলি দিয়ে একটি সুমিষ্ট ফল সে তুলে দিল কিশোরের মুখে। আর সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চীৎকার।

কিশোরের চীৎকারে ছুটে এলেন গৃহিণী গৃহকর্তা আর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র। পুত্রের মুখে সব কথা শুনে সেই পথের উপরই গৃহকর্তা আর পুত্র তাকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেললেন। কিশোরের দাদার মারটাই বেশী। ব্রাহ্মণ বালকের মুখে ফল তুলে দেওয়ায় তার নাকি জাতি নাশ ঘটেছে। ছোট জাতের মেয়ে শবর কন্যার এত বড় স্পর্ধা! ব্রাহ্মণ কিশোরের মুখে ফল তুলে দেয়।

আর আশ্চর্যের কথা, তাকে মারতে দেখে একটি মানুষও তাকে বাঁচাতে আসেনি। বন থেকে অনেক শবর যুবকও যায় জনপদে জিনিসপত্র বিক্রি করতে। তারাও অনেকে সেখান দিয়ে যাতায়াত করছিল। তাদের মধ্যে কেউ তাকে বাঁচাতে ছুটে আসেনি। বরঞ্চ তারাও মজা পেয়ে হাসছিল।

প্রহারে জর্জরিত শবরী ফিরে এসেছিল চোখে আগুন নিয়ে। চোখে আগুন আর মনে জ্বালা।

সেই আগুন আর জ্বালা সে এ ক'বছরে ছড়িয়ে দিয়েছে পুরুষদের মাঝে।

যে শবর যুবকরা তাকে দেখে হাসাহাসি করেছিল, তারাই তার জন্যে জ্বলে পুড়ে মরেছে।

যে ব্রাহ্মণ কিশোরের জন্য তার এই দুরবস্থা, তার দাদাই তাকে ভোগ করবার জন্য পায়ে ধরেছে।

শবরী এদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে অদ্ভুত আনন্দ পায়। সে শুধু অপেক্ষা করে আছে সেই ব্রাহ্মণ কিশোরের জন্যে। তাকে সে যে ভাবেই হোক ধরবে।

ধরে জিজ্ঞাসা করবে, কেন তুমি সেদিন অমনভাবে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠেছিল? আমাকে অমনভাবে মারতে দেখেও তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে?

শবরী সেই কিশোরের প্রতীক্ষায় জনপদের সীমানায় দাঁড়িয়ে থাকে। সে জানে একদিন না একদিন তার দেখা মিলবেই।

এবং সত্যিই তা হল।

শবরী একদিন দেখল তাকে—সেই ব্রাহ্মণকুমারকে। সে আর এখন কিশোর নয়—বলিষ্ঠ সুন্দর যুবাপুরুষ।

শবরীর বুকের রক্তে আবার শিহরণ জাগে। সে তাড়াতাড়ি সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—চিনতে পারো?

—তুমি কে? ব্রাহ্মণ যুবকের কণ্ঠে বিস্ময়, তোমাকে তো চিনতে পারছি না।

—আমি শবরী। তোমাদের গৃহে আমি ফল নিয়ে যেতাম।

—বুঝেছি। যুবকের চোখে এবার ভ্রূকুটি, তুমি আমার পথ ছাড়। আমাকে যেতে দাও।

—আমি যেতে দেব না।

—কি চাও তুমি আমার কাছে?

—আমি কিছুই চাই না। আমি শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে নিয়ে বাঁচতে চাই।

—কি! এতবড় স্পর্ধা হীন শবরকন্যার? ব্রাহ্মণকুমারের মুখ রাগে রক্তিম হয়ে ওঠে, যার ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হয়, তার মুখে এত বড় কথা? একবার প্রহারেও শিক্ষা হয় নি?

ব্রাহ্মণকুমার ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই শবরী তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, ওগো, তুমি চলে যেও না।

—পাপিষ্ঠা! ধিক তোকে! ব্রাহ্মণকুমার সজোরে শবরীর মুখে এক পদাঘাত করে হন হন করে চলে গেল।

শবরী সেই জায়গায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। কতক্ষণ জানে না, হঠাৎ মাথায় কার স্পর্শে চোখ মেলে তাকাল।

মাথার কাছে বসে আছেন সৌম্যদর্শন এক তপস্বী। মাথায় লম্বা জটাজাল। সমস্ত মুখে অদ্ভুত এক প্রশান্তি।

শবরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

সৌম্যদর্শন তপস্বী শান্তকণ্ঠে বললেন, সামান্য মানুষ তোমাকে গ্রহণ করেনি বলে তুমি কাঁদছ মা, মানুষের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, দেবতাদেরও যিনি ঈশ্বর, সেই সর্বগুণমণি রামচন্দ্র তোমাকে গ্রহণ করবেন।

—তুমি কে বাবা? শবরী এবার উঠে বসল।

—মতঙ্গ মুনি বলেই লোকে জানে আমাকে। পম্পানদী তীরে অরণ্যের মধ্যে আমার আশ্রম।

—আমাকে তোমার সাথে নাও বাবা। আমি আর লোকালয়ে ফিরে যাব না।

—বেশ তো চল। আমার আশ্রমে থেকে তপস্যা করবে। একদিন রামচন্দ্র আসবেন। তার করুণালাভে তুমি ধন্য হবে।

—রামচন্দ্র কবে আসবেন বাবা?

—কবে আসবেন তা জানিনা মা। মতঙ্গ মুনি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, তবে তিনি যে অবশ্যই আসবেন তা আমি জানি। শুধু আমি কেন সমগ্র মুনি ঋষি সমাজ জানেন যে স্বয়ং বিষ্ণু মর্ত্যলোকে রঘুবংশে রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়ে পাপী তাপী সকলকে করুণা করবেন।

—আমি যাব বাবা তোমার আশ্রমে। প্রতীক্ষা করবো সেই মানুষের জন্য যিনি আমাকে ঘৃণা করবেন না, আমাকে সম্মান দেবেন।

শবরী মতঙ্গ মুনির সাথে চলে এল তাঁর আশ্রমে।

এখানে এসে তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। আশ্রমবাসী-দের সব কাজ সে নীরবে করে দেয়, এরই মধ্যে চলে তার একনিষ্ঠ সাধনা। মুখে তার অবিরত রামনাম। বুকের মধ্যে তার অপূর্ব সুন্দর নরোত্তমের রঙিন চিত্র।

শবরী প্রতীক্ষা করে থাকে, কবে সেই নরোত্তম রামচন্দ্র আসবেন, এসে তার করুণা ধারা বর্ষণ করবেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছরের পর বছর চলে যায়। শবরীর শরীর থেকে ঝরে যায় যৌবন। শবরী এখন বৃদ্ধা তপস্বিনী।

মতঙ্গ মুনিকে বলেন, বাবা, কবে আসবেন আমার রামচন্দ্র?

মতঙ্গ মুনি মৃদু হেসে বলেন, ধৈর্য ধর শবরী। রামচন্দ্র অবশ্যই আসবেন।

শবরী ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করে। এই আশ্রমে আসবার পর থেকেই সে ফলাহারী। যা ফল পায়, তার থেকে একটি করে রামের জন্য তুলে রেখে বাকী একটিমাত্র সে নিজে খায়। এইভাবে জমে উঠেছে ফলের পাহাড়। অনেক ফল নষ্ট হয়ে গেছে। শবরী প্রাণ ধরে সেগুলি ফেলে দেয় না। তার মনে স্থির বিশ্বাস, রামচন্দ্র আসবেন। রামচন্দ্র এলে সে তার জমানো ফলগুলি তাকে খেতে দেবে।

মতঙ্গ মুনি একদিন দেহরক্ষা করলেন। চারধারে কত পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু শবরীর প্রতীক্ষা আর শেষ হয় না।

অবশেষে সত্যি সত্যি একদিন সেই প্রতীক্ষার অবসান হল। শবরী আশ্রমে ধ্যান মগ্ন। হঠাৎ মনে হল, চারদিক যেন আলোয় আলোয় ভরে গেছে। শবরী চোখ মেলল।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এক অপূর্ব রূপবান যুবক নবদূর্বাদল শ্যাম। পদ্মের মতো আয়ত বিশাল চোখ, আর সেই চোখ দিয়ে বিচ্ছুরিত করুণার প্রস্রবণ। কাউকে কিছু বলে দিতে হল না, শবরীর মনই বলে দিল, এই সেই করুণাসাগর রামচন্দ্র যাঁর প্রতীক্ষায় শবরীর কেটে গেল

সারাটা জীবন। আহা কি মনোহর রূপ! কি করুণামাখা চোখ! সার্থক তার প্রতীক্ষা। এর জন্য একটি জন্ম কেন, জন্ম জন্ম প্রতীক্ষা করে থাকা যায়।

শবরীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল।

—শবরী, আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে দেবে না?

শবরী চমকে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। হাতে করে নিয়ে এল এক রাশ ফল।

—ফলগুলি তুমি আমাকে তুলে দাও শবরী।

শবরী তবু দাঁড়িয়ে থাকে। এগিয়ে যায় না।

—কি হল? দাও।

—প্রভু, আমি যে নীচু জাতীয়া নারী—তার উপর অনাচারে পাপী, আমার স্পর্শ করা ফল তোমাকে দেই কি করে? শবরী এবার কান্নায় ভেঙে পড়ল।

রামচন্দ্র এগিয়ে এসে শবরীর হাত থেকে কয়েকটা ফল নিয়ে মুখে পুরে খেয়ে ফেললেন। হেসে বললেন, এমন সুমিষ্ট ফল আমি বেশী খাইনি। তোমার স্পর্শে এ ফল অমৃতফল হয়ে পড়েছে শবরী।

—আমি যে নীচু জাতীয়া—পাপী অনাচারী—

—শবরী, আমার কাছে তুমি নারীকুলোত্তমা, তপস্বিনীশ্রেষ্ঠা, মহা পুণ্যবতী—এগিয়ে এস, তোমাকে আশীর্বাদ করি।

শবরী এগিয়ে এসে নতজানু হলেন।

রামচন্দ্র মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, বৈকুণ্ঠ লাভ করো।

এবার আনন্দে কেঁদে ফেলল শবরী।

কাঁদতে কাঁদতে বলল, প্রভু, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে বৈকুণ্ঠে পাঠাও।

রামচন্দ্র স্মিত হেসে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শবরী আশ্রমের সামনে রাশি রাশি কাঠ জড় করল। তারপর সেই কাঠে ধরিয়ে দিল আগুন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

শবরী রামচন্দ্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল অনেকক্ষণ ধরে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একদিন মানুষ আমাকে ঘেন্নায় লাথি মেরেছিল, আজ ভগবান আমাকে স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন। আমি ধন্য। আমি ধন্য।

এই বলে শবরী শান্ত স্নিগ্ধ মুখে সেই অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করল।

রামচন্দ্র হাত তুলে বললেন, ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি !

—০—

অনুপমেয়া অহল্যা

বিধাতার অনুপমা সৃষ্টি অহল্যা।

সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি দিয়ে বিধাতা তাকে সৃষ্টি করেছেন সৌন্দর্যের তিলোত্তমা করে।

অনুপমা অনুপমেয়া অহল্যা।

দেবরাজ ইন্দ্র তাকে পত্নীরূপে পাবার জন্য উন্মত্ত।

কিন্তু না, বিধাতা অহল্যাকে দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে সমর্পণ করলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র সম্ভোগী অসংযমী।

অহল্যা শুধু বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়, তার মানসকন্যাও বটে। তাই তিনি কন্যাকে এমন একজনের হাতে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন যিনি জিতেন্দ্রিয় সংযমী এবং চরিত্র বলে শ্রেষ্ঠ।

সবটাই বিধাতার একটা বিচিত্র পরীক্ষা।

যে তিলোত্তমা সুন্দরীর দিকে তাকালে দেব দানব নর তাকে পাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে, সেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠার সান্নিধ্যে থেকেও কে নিজেকে সংযত রাখতে পারে, বিধাতা তাই দেখতে চেয়েছেন।

কে আছেন এমন সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় চরিত্রবলে বলীয়ান পুরুষ ?

আছেন একজন। তিনি হলেন মহামুনি গোতম পুত্র গৌতম। গৌতম স্বয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ সংহিতাকার, কঠোর সাধন ভজনে মগ্ন থাকেন।

বিধাতা কিছুকাল অহল্যাকে রেখে দিলেন গৌতমের আশ্রমে।

ঋষি গৌতম নির্বিকার। অহল্যা তার অসামান্য রূপযৌবন নিয়ে গৌতম ঋষির চিত্তে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য আনতে পারলেন না। গৌতম ঋষি আগেকার মতো তার সাধন ভজনে মগ্ন নির্দিষ্ট সময়ান্তে বিধাতা অহল্যাকে ফিরিয়ে নিতে এসে বিস্মিত।

নিজের বিস্ময় গোপন না করে বিধাতা বললেন, আমি তোমার অসাধারণ সংযমে বিস্মিত গৌতম। এই অগ্নিশিখারূপিণী কন্যাকে তোমার আশ্রমে রাখার পর আমি কিছুটা চিন্তিত ছিলাম, সেকথা আমি স্বীকার করছি।

—এখন আপনার সে চিন্তা দূর হয়েছে তো বিশ্বস্রষ্টা ? গৌতম ঋষি মৃদু হেসে বললেন।

—শুধু যে চিন্তা দূর হয়েছে তা নয়, অহল্যা সম্পর্কে আমি সর্বচিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছি গৌতম।

—আপনার কথা আমার সম্যক বোধগম্য হচ্ছে না ধাতা।

—দ্যাখ গৌতম, অহল্যা আমার মানসকন্যা, আমার মনের সমস্ত মাধুরী দিয়ে ওকে আমি সৃজন করেছি। একজন সম্ভোগী অসংযমী ইন্দ্রিয়াসক্ত দেবতার হাতে আমি ওকে সমর্পণ করতে চাইনি। আমি ওকে সমর্পণ করতে চেয়েছি সত্যকার একজন আদর্শ পুরুষের হাতে, আর সে পুরুষ হচ্ছো তুমি।

—এ আপনি বলছেন কি পিতামহ! গৌতম ঋষি বিস্ময়ে হতবাক, দেবকুল গন্ধর্ব কুল নরকুলে কত শত শ্রেষ্ঠ বরেণ্য পুরুষ থাকতে আমার মতো দরিদ্র একজন ঋষিকে আপনি নির্বাচন করলেন অনুপমা অহল্যার পাত্র হিসাবে ?

—আমার নির্বাচন অভ্রান্ত গৌতম, বিধাতা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন। তুমি অহল্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর।

—আমি দরিদ্র, সাধন ভজন আর শাস্ত্রালোচনায় দিবারাত্র আমি মগ্ন থাকি। এমতাবস্থায় অহল্যর মতো অপরূপাকে আমি ঘরণী করবার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না। জগতের শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্তীর ঘরেই অহল্যার স্থান।

—তোমার ওই পর্ণকুটিরেই অহল্যার যথার্থ স্থান। অহল্যা এখানেই সুখী হবে।

—আপনি অহল্যার অভিমত জানেন ?

—অহল্যা আমার মানসকন্যা। আমার মনের অংশ নিয়েই ওকে আমি সৃষ্টি করেছি। ওর মন আমার চেয়ে কেউ ভাল জানে না। তোমার সংযম আর জিতেন্দ্রিয়তা ওকেও মুগ্ধ করেছে। তুমি আর দ্বিধা করো না গৌতম।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য পিতামহ।

গৌতম ঋষি অহল্যাকে বিবাহ করে নিজের আশ্রমে নিয়ে এলেন।

অহল্যা জগৎ স্রষ্টার আলয়ে সুখে সাচ্ছন্দ্যে বড় হয়েছে। দারিদ্র্য অভাব অসুবিধার সঙ্গে তার সামান্যতম পরিচয়ও নেই। এদিকে গৌতম ঋষির আশ্রমের পরিবেশ অতি সাধারণ। আহার পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। অভাব দারিদ্র্য এখানে প্রকট। কিন্তু গৌতম অভাব বা দারিদ্র্যকে আমল দেন না। তিনি তাঁর পুঁথিপত্র আর সাধন ভজন নিয়ে নিজের জগতে বাস করেন।

অহল্যাও এ জীবনকে খুসী মনেই মেনে নিয়েছেন। পরম পণ্ডিত স্বামী। কত মুনি ঋষি তার স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। পবিত্র বেদপাঠে আর স্তোত্রগানে আশ্রম পরিবেশ সর্বদা পবিত্র হয়ে থাকে।

অহল্যা খুশি মনে ঘর সংসার করেন। তার মনেও বিন্দুমাত্র কোন দুঃখ নেই। একদা তিনি ছিলেন বিশ্বস্রষ্টার সুরম্য প্রাসাদে, কত দেবতা গন্ধর্ব তার রূপ সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হতেন, তিনি যেন সে সব কথা ভুলে গেছেন।

অহল্যার মনে হয়, এই আশ্রমের সঙ্গে যেন তার জন্ম জন্মান্তরের নিবিড় সম্পর্ক। আশ্রমের তরুলতা পশুপাখী হরিণ এরা তার অতি আপনজন। অহল্যা নিজের হাতে আশ্রমিকদের পরিচর্যা করেন। সকলের দিকে তার সজাগ দৃষ্টি। স্বামীর সেবায় তিনি ক্লান্তিহীন।

সেদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে গৌতম ঋষি নির্জন সাধনার জন্য নিবিড় অরণ্যে চলে গেলেন। আগের দিন রাত্রেই তিনি অহল্যাকে তার সংকল্পের কথা বলে রেখেছিলেন। আশ্রমের মধ্যে ইদানীং তার সাধন ভজনের কিছু বিঘ্ন ঘটছে, তার চিত্ত স্থির থাকছে না। তাই নিবিড় অরণ্যে তিনি স্থিরচিত্তে সাধনা করতে চান। তাই রাত্রি শেষ হতে না হতে তিনি যাত্রা করলেন অরণ্য অভিমুখে।

অহল্যা আবার ঘরে গিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়লেন। রাত্রি শেষ হতে এখনও অনেক বিলম্ব।

একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল অহল্যার। অকস্মাৎ শরীরে কার কর স্পর্শে তিনি জেগে উঠলেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তার স্বামী গৌতম।

—কি ব্যাপার? তুমি আবার ফিরে এলে যে? অহল্যা শয্যা ত্যাগ করে উঠতে যেতে গৌতম ঋষি তাকে বাধা দিলেন, থাক্ থাক্ তোমাকে উঠতে হবে না। শুয়ে থাকো তুমি। বলে তিনি নিজেও শয্যার উপর বসলেন।

—আসলে কি জানো, যেতে যেতে তোমার কথা মনে পড়ায় আবার ফিরে এলাম। গৌতম নীচু হয়ে পত্নীর মুখে চুম্বনরেখা এঁকে দিলেন, বিবাহের পর তোমাকে একটু সময়ের জন্যও ছেড়ে থাকিনি তো।

—কিন্তু তোমার সাধন ভজন?

—সাধন ভজন তো অনেক করেছি। গৌতম ঋষি হাসলেন। এখন আমার একমাত্র সাধন ভজন তুমি।

—ওকথা বলো না নাথ। অহল্যা মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমি তো সামান্যা নারী। আমার জন্য তোমার সাধন ভজনে যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

—কোন ব্যাঘাত ঘটবে না প্রিয়ে, কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।

গৌতম এবার শয্যায় শুয়ে পড়ে অহল্যাকে জড়িয়ে ধরে আদরে সোহাগে অস্থির করে তোলেন।

অহল্যার মনেও যেন অপূর্ব পুলকানুভূতি। এযাবৎ স্বামীকে তিনি সংযমী স্বাভাবিক পুরুষ হিসাবেই দেখেছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আজ যে কোন কারণেই হোক, স্বামীর সংযমের বাঁধ ভেঙেছে, তাঁর শিরায় শিরায় এসেছে বাসনার বেগ।

অহল্যার যৌবনের বাঁধও যেন ভেসে গেল সেই বন্যায়। মিলন শেষে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে পরম তৃপ্তির মধ্যে তিনি শুয়ে রইলেন। হঠাৎ বাইরে কার কণ্ঠস্বর—অহল্যা অহল্যা!

অহল্যা চমকে ওঠে বসলেন। আর সেই সঙ্গে উঠে বসলেন গৌতম ঋষি।

—অহল্যা অহল্যা, দ্বার খোলো। আমি ফিরে এসেছি।

অহল্যা তাড়াতাড়ি উঠে দ্বার খুলতে গেলেন। তার হাত ধরে বাধা দিলেন ঘরের মধ্যে গৌতম ঋষি।

—অহল্যা, দ্বার খুলো না।

অহল্যা তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে দ্বার খুলে দিলেন। দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে গৌতম ঋষি।

ঘরের মধ্যে শয্যায় ভীত ভয়ার্ত মুখে বসে, আছেন আর একজন গৌতম ঋষি। নগ্ন নিরাবরণ নির্লজ্জ।

অহল্যার দিকে তাকালেন গৌতম। সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কঠিন অথচ সংযত কণ্ঠে দ্বারে দণ্ডায়মান গৌতম ঋষি ঘরের মধ্যেকার সেই ভয়ার্ত পুরুষের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কে?

—আমি দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্র একটানে তার গৌতম ঋষির ছদ্মবেশ খুলে ফেললেন।

—তুমি আমার ছদ্মবেশ ধরে এসেছো কেন?

—না হলে অহল্যাকে পাওয়া যেত না।

—অহল্যাকে তুমি পেতে চেয়েছো কেন ?

—অহল্যাকে আমি ওর বাল্যকাল থেকে ভালোবাসি। বিধাতার কাছে বহুবার ওকে আমি প্রার্থনা করেছি, বিধাতা আমার প্রার্থনা পূরণ করেননি। ওকে পাবার জন্য আমি উন্মত্ত হয়েছিলাম। সুযোগ করতে পারিনি। তাই অনন্যোপায় হয়ে আজ আমাকে এই পথ অবলম্বন করতে হয়েছে।

—ইন্দ্র, তুমি না আমার কাছে কিছুকাল বেদ অধ্যয়ন করেছো ?

—সে সবই অহল্যার জন্য ঋষিবর।

—দেবরাজ ইন্দ্র, তুমি অসংযমী পরস্ত্রী ভোগী। আমার অভিশাপে তোমার সকল দেহ ধারণ করে থাক তোমার কদর্য ভোগাকাঙ্ক্ষা আর অসংযমের পরিচয়। যাও এখান থেকে।

ইন্দ্র মাথা নীচু করে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

—অহল্যা, পরপুরুষ স্পর্শে নিজেকে কলংকিত করেছ তুমি। তুমি মানব দেহ ত্যাগ করে পাষাণ হয়ে থাক।

—নাথ, আমি তো সজ্ঞানে কোন পাপ করিনি। দেবরাজ ইন্দ্র তোমার আকৃতি নিয়ে এসেছিলেন। আমি স্বামী জ্ঞানে তাকে গ্রহণ করেছি। এতে আমার অপরাধ কোথায় ?

—তুমি সজ্ঞানে অপরাধ করনি তা সত্য, তবু তুমি কলংকিত। তোমার ওই সুন্দর দেহ পরপুরুষ ধর্ষিত এবং তোমার মনও কিছুটা বিধ্বস্ত।

—আমি কোন পাপ করিনি প্রভু। অহল্যা এবার কেঁদে ফেললেন।

—অহল্যা, মনের অগোচর কোন পাপ নেই, গৌতম এবার বিষণ্ণ হেসে বললেন, তোমার সমস্ত অবয়বে আজ গভীর পরিতৃপ্তির পরিচয়। ইন্দ্রের সঙ্গে মিলনে তুমি যে পরম তৃপ্তিলাভ করেছ তা তোমার সর্বাঙ্গ দর্পণ হয়ে আমায় বলে দিচ্ছে। তুমি তো ইতিপূর্বে আমার সাথেও

মিলিত হয়েছো, এক নিমেষের জন্যও কি তোমার মনে হয়নি, না এ আমার স্বামী নয়, এ অন্য কেউ, অন্য কেউ—

—মনে হয়েছিল প্রভু।

—তবে ? তোমার মন তোমার দেহের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অহল্যা।

অহল্যা নীরবে তাকিয়ে রইলেন। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল জলের ধারা।

—আমাকে কি চিরদিন এমনি পাষাণ হয়ে থাকতে হবে প্রভু ?

—না। চিরদিন তোমাকে পাষাণ হয়ে থাকতে হবে না। স্বয়ং বিষ্ণু রামচন্দ্র অবতারে তোমার কাছে আসবেন। তার পাদস্পর্শে তুমি ফিরে পাবে তোমার শুদ্ধ দেহ শুদ্ধ মন। আমি হৃষ্টচিত্তে তখন তোমাকে গ্রহণ করব।

—০—

শুচিস্মিতা স্বয়ংবরা

ব্রহ্মার মানস পুত্র পুলস্ত্য।

ব্রহ্মবিদ তপস্বী। ব্রহ্মা একে ব্রহ্মপুরাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। পুলস্ত্য সেই ব্রহ্মপুরাণ শিক্ষা দিলেন পরাশর মুনিকে। পরাশর মুনি ব্রহ্ম পুরাণ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন।

পুলস্ত্য সুমেরু পর্বতের কাছে একটি নির্জন স্থানে দিবারাত্র তপস্যায় মগ্ন থাকেন। তপস্যা এবং অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই।

পুলস্ত্যের সাধনভূমির একটু দূরেই তৃণবিন্দু মুনির আশ্রম। তৃণবিন্দু মুনি গৃহস্থ তপস্বী। স্ত্রী কন্যা আত্মীয় পরিজন ও শিষ্যবৃন্দ নিয়ে তাঁর আশ্রম।

তৃণবিন্দু মুনির কন্যা স্বয়ংবরা অপরূপ লাবণ্যবতী প্রাণ চঞ্চলা যুবতী।

আশেপাশের গন্ধর্ব অপ্সরা কন্যারা তার সখী। গন্ধর্ব আর অপ্সরা কন্যারা দল বেঁধে তার কাছে এসে নাচ গানে মাতিয়ে রাখে তাকে।

ওরা এলেই স্বয়ংবরা ওদের সাথে নাচগানে মেতে উঠে। গন্ধর্ব কন্যাদের গানের সুরে, অপ্সরা কন্যাদের নাচের ঝংকারে আশ্রম পরিবেশ মুখর হয়ে ওঠে।

ওরা এলেই পুলস্ত্যের সাধন ভজনে ব্যাঘাত ঘটে। তার মনঃসংযোগ বারবার খণ্ডিত হয়।

গন্ধর্ব কন্যাদের গানের সুর পুলস্ত্য মুনির মনকে কেমন উন্মনা করে তোলে, অপ্সরা কন্যাদের লাস্য নৃত্য তার মনকে করে তোলে চঞ্চল।

পুলস্ত্য মুনি একদিন বিরক্ত হয়ে ওদের সামনে এসে বললেন, অয়ি

বরাঙ্গনাবৃন্দ, বন্ধ কর তোমাদের নৃত্য গীত। এতে আমার তপস্যার বিঘ্ন ঘটছে।

কিশোরী কন্যার দল পুলস্ত্য মুনির দাড়ি গোঁফ ঢাকা অদ্ভুত চেহারা দেখে আর তার কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ল। বন্ধ করল না নৃত্যগীত।

পুলস্ত্য মুনি এবার ক্রুদ্ধ হলেন। কঠিন কর্কশ কণ্ঠে বললেন, অয়ি চপলা বালিকাবৃন্দ, আমার বাক্য অমান্য করলে তোমরা খুব বিপদে পড়ে যাবে।

গন্ধর্ব আর অপ্সরা কন্যার দল এবারও পুলস্ত্য মুনির কথায় কান দিল না। বরঞ্চ তারা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নাচগানে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠল।

গন্ধর্ব কন্যাদের গানের সুরে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বনভূমি। অপ্সরা কন্যারা একে একে ত্যাগ করতে লাগল তাদের দেহাবরণ। চোখের সামনে এরূপ নির্লজ্জতা দেখে ক্ষেপে গেলেন পুলস্ত্য মুনি। তিনি চেঁচিয়ে হাত তুলে বললেন, আমি ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য, আমি তোদের অভিশাপ দিচ্ছি, এরপর যে এখানে নাচগান করবে, সে গর্ভবতী হয়ে যাবে।

গন্ধর্ব অপ্সরা কন্যারা মুনির অভিশাপকে ভয় করে। অভিশাপের কথা শুনে তারা মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

রয়ে গেল শুধু স্বয়ংবরা।

সে এতক্ষণ সব কিছু বেশ উপভোগ করছিল। গন্ধর্ব আর অপ্সরা কন্যার দল পালিয়ে যেতে তার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল।

গন্ধর্ব আর অপ্সরা কন্যার দল অভিশাপকে ভয় করলেও তার মনে অভিশাপের কোন ভয় নেই। কেননা সে নিজে মুনিকন্যা। সে জানে মুনিরা অভিশাপ দেন বটে, কিন্তু সব অভিশাপ ফলে না।

আর পুলস্ত্যের এ অভিশাপ তো ফলবেই না। কারণ গর্ভসঞ্চারের

রহস্য স্বয়ংবরা জানে। পুরুষ সংসর্গ ছাড়া কখনোই গর্ভসঞ্চার হতে পারে না। পুলস্ত্য ভয় দেখাবার জন্য এ অভিশাপ দিয়েছেন, তা সে বুঝতে পেরেছে।

তাই অভিশাপের কথায় স্বয়ংবরা মনে মনে হাসছিল।

পুলস্ত্য মুনি আবার ফিরে গিয়ে বসলেন তার সাধন স্থানে। ব্রহ্ম পদে মনোনিবেশ করে চোখ বন্ধ করলেন।

ঠিক সেই সময় তার কানে ভেসে এল অপূর্ব গানের সুর, নূপুর নিক্কনে বনভূমি হয়ে উঠল মুখরিত।

পুলস্ত্যের ধ্যান ভেঙে গেল। ধ্যান ভাঙতে তিনি চোখ মেলে তাকালেন। কার এত দুঃসাহস যে তার নিষেধবাণী অমান্য করে? কে এমন দুঃসাহসিকা যে তার অভিশাপকে ভয় করে না? চোখ মেলে তিনি দেখতে পেলেন নৃত্যরতা সুঠাম স্বয়ংবরাকে। পেলব লীলায়িত অঙ্গভঙ্গিমায় নেচে চলেছে স্বয়ংবরা, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির মধুরিমা।

পুলস্ত্য মুনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে চীৎকার করে উঠলেন, দেবী মানবী দানবী গন্ধর্বী অপ্সরা যেই হোস তুই, আমার অভিশাপে এই মুহূর্তে তুই গর্ভবতী হবি।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে পুলস্ত্য মুনি চলে গেলেন তার সাধন আসনে। স্বয়ংবরার নৃত্যে এতটুকু ছেদ পড়ল না।

সে লীলায়িত ভঙ্গীতে নেচে চলল। তার ঠোঁটের কোণে সেই সুস্মিত কৌতুক হাসির রেখা।

অকস্মাৎ স্বয়ংবরার শরীরে যেন রাজ্যের ক্লান্তি নেমে এল। সকল দেহে অদ্ভুত এক অবসন্নতা। শরীরটা যেন ভেঙে ভেঙে পড়তে চাইছে। স্বয়ংবরা নৃত্য পটীয়সী যুবতী। দীর্ঘকাল সে স্বচ্ছন্দভাবে নাচতে পারে। নাচে তার কখনও এমন ক্লান্তি আসে না। কিন্তু এখন এত ক্লান্তি আসছে কেন?

স্বয়ংবরার নাচের ছন্দে পতন ঘটল। তার পা পড়তে লাগল এলোমেলোভাবে। অসহায় করুণ মুখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ তার বুকের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ জাগল। স্তনের মধ্যে অসহ্য ব্যথা। স্বয়ংবরা একটানে খুলে ফেলল তার বক্ষবন্ধনী। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে ভয়ার্ত বিস্মিত আর্ত চীৎকার বেরিয়ে এল, —মাগো! তার শ্বেতশুভ্র স্তনযুগল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে দুধের ধারা।

স্বয়ংবরা মুহূর্তকাল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দুহাতে স্তনযুগল চেপে ছুটতে ছুটতে চলে গেল নিজেদের আশ্রমে।

আশ্রমঘরে ঢুকে সোজা মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—কি হয়েছে মা? এমন করছিস কেন? স্বয়ংবরার মা ব্যস্ত হয়ে মেয়েকে তুলে ধরলেন। আর তুলে ধরেই বিস্মিত স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের বুকের পানে। দুধের ধারায় ভেসে যাচ্ছে মেয়ের সারা বুক।

—এ কি সর্বনাশ? এ অবস্থা হল কি করে তোর?

—পুলস্ত্য মুনির অভিশাপে মা। স্বয়ংবরা কাঁদতে কাঁদতে বলল।

—পুলস্ত্য মুনি? স্বয়ংবরার মা বলে উঠলেন, ব্রহ্মর্ষি উনি, বিধাতার মতো ওর ক্ষমতা। কি করেছিলি তুই?

—আমি ওর নিষেধবাণী অমান্য করে ওর আশ্রমের সামনে নাচগান করে ওর ধ্যানভঙ্গ করেছিলাম। তাতে উনি অভিশাপ দিয়েছেন।

—কি অভিশাপ দিয়েছেন?

—মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে যা লজ্জার—কুমারী কালে গর্ভবতী হওয়া।

—সর্বনাশ হয়েছে। স্বয়ংবরার মা ভয়ে কেঁদে ফেললেন। পুলস্ত্য মুনির অভিশাপ বড় ভয়ংকর। কুমারী কালে তুই সন্তানের মাতা হলি। চিরদিন থেকে যাবে তোর কলংক। লোকে এ অভিশাপের কথা মানবে না, তারা এর অন্য ব্যাখ্যা করবে।

স্বয়ংবরা এবার মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। স্বয়ংবরার মা চলে গেলেন স্বামী তৃণবিন্দুর কাছে। তাকে বললেন সব কথা।

তৃণবিন্দুর কপালে ফুটে উঠল চিন্তার রেখা। তিনি বললেন, পুলস্ত্য মুনিকে চটিয়ে সর্বনাশ করেছে তোমার মেয়ে।

—তুমি মেয়েকে নিয়ে চলে যাও মুনির কাছে। মেয়ে মুনির পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইবে। দ্যাখো মুনির মন গলে কিনা।

—বলছো যখন, নিয়ে যাচ্ছি মেয়েকে মুনির কাছে।

তৃণবিন্দু স্বয়ংবরাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন পুলস্ত্যের কাছে।

বললেন, ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্য, মেয়ে আমার যৌবন চাপল্য বশত অপরাধ করেছে। ওকে ক্ষমা করুন।

—কর্মফল ওকে ভোগ করতে হবে। পুলস্ত্য গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

—আপনি অন্য যে কোন শাস্তি ওকে দিন, ও মাথা পেতে নেবে, কিন্তু কুমারী কালে সবচেয়ে লজ্জাজনক যে শাস্তি, তা থেকে ওকে অব্যাহতি দিন।

—অভিশাপ তীরের মত, একবার নিক্ষিপ্ত হলে তা আর ফেরানো যায় না মুনিবর।

—এই কন্যাকে নিয়ে আমি এখন কি করব? কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী কন্যা সংসারে সকলের ঘৃণার পাত্রী।

—এ ক্ষেত্রে আমার কিছু করণীয় নেই মহাভাগ।

—করণীয় আছে মুনিবর। আপনি আমার কন্যাকে গ্রহণ করুন।

—আপনার কি মতিভ্রম হয়েছে? পুলস্ত্য মুনি বললেন, আমি তপস্বী। আমি এ কন্যাকে কিরূপে গ্রহণ করতে পারি?

—আপনার পক্ষে সবই সম্ভব। কন্যাকে এখানে রেখে আমি বিদায় নিচ্ছি।

স্বয়ংবরাকে পুলস্ত্য মুনির আশ্রমে রেখে তৃণবিন্দু চলে গেলেন।

* * *

এবার শুরু হল স্বয়ংবরার এক কঠোর সাধনা। তাকে আশ্রমে ওইভাবে একাকী রেখে যাবার জন্য পুলস্ত্য তাকে অনেক কটুকথা বললেন। স্বয়ংবরা গায়েই মাখল না।

সে পুলস্ত্যের সেবার কাজে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিল। পুলস্ত্যের জন্য বন থেকে ফলমূল আহরণ করা, তার সামনে আহার্য দ্রব্য ধরে দেওয়া, তার আশ্রম সংস্কার করা, তার শয্যা প্রস্তুত করা, তার জন্য ঝরণা থেকে জল আনা প্রভৃতি নানা কাজে সে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখল। পুলস্ত্যের যাতে সামান্য কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে সর্বক্ষণ তার সজাগ সতর্ক দৃষ্টি।

পুলস্ত্য প্রথমে স্বয়ংবরার প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু তার ওই প্রাণঢালা সেবায় ও পরিচর্যায় সে বিরূপতা ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। আগে নানা খুটিনাটি কাজ করতে গিয়ে তার অধ্যয়ন ও সাধন ভজনে বিঘ্ন হত। কিন্তু এখন স্বয়ংবরা আসবার পর তাকে আর কোন কাজ করতে হয় না। তিনি নিশ্চিন্তমনে অধ্যয়ন আর সাধন ভজন করেন।

স্বয়ংবরার সাথে তিনি কোন কথা বলেন না। স্বয়ংবরাও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। বুদ্ধি এবং অনুভূতি দিয়ে সব কিছু বুঝে নিয়ে সে নীরবে পুলস্ত্যের সেবা করে যায়।

এ এক অদ্ভুত অবস্থা। এক আশ্রমে দুজনের বাস। অথচ দুজন যেন দুই জগতের বাসিন্দা।

একজন তার অধ্যয়ন আর সাধন ভজন নিয়ে দিবারাত্র মগ্ন। আর একজন নীরবে তার সেবার সাধনায় ব্যস্ত।

কিন্তু এদিকে স্বয়ংবরার শরীরও ধীরে ধীরে যে অচল হয়ে আসছে। তার শরীরের মধ্যে ভ্রূণের অস্তিত্ব সে সর্বক্ষণ অনুভব করে। তাকে বলে দেবার কেউ নেই, অথচ সে বুঝতে পারে, তার প্রসব সময় আসন্ন। এই নির্জন নিঃসঙ্গ নির্বান্ধই স্থানে প্রসবকালে তার কি অবস্থা

পাতা মুদ্রিত হবেন না।

হবে, তা সে জানে না। হয়তো তার মৃত্যু হবে, আর মৃত্যু এসে তাকে নিষ্কৃতি দেবে সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে।

স্বয়ংবরা আর এ অভিশাপের বোঝা সইতে পারে না। পুলস্ত্য মুনির সেবায় সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে, কিন্তু কবে তার করুণা পাবে, কিংবা আদৌ পাবে কিনা তাও সে জানে না। স্বয়ংবরার এখন একমাত্র প্রার্থনা এ অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি।

স্বয়ংবরা সেদিন দূরের ঝরণা থেকে জল বয়ে আনছিল। সারা পথ কষ্ট করে এসে আশ্রম দ্বারে এসে আর পা চলে না। ভারী জলপাত্র নিয়ে সোপান বেয়ে উঠতে গিয়ে তার পা গেল পিছলে। সে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর। জলপাত্র ছিটকে পড়ল নীচে।

আর সেই শব্দে পুলস্ত্য মুনি চোখ মেলে তাকালেন। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল ব্যাপারটা বুঝে নিতে। তিনি তাড়াতাড়ি চলে এলেন স্বয়ংবরার কাছে। স্বয়ংবরা আচ্ছন্নের মতো পড়ে ছিল।

পুলস্ত্য তার হাত ধরে তুলে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, খুব দুর্বল হয়ে পড়েছ।

এই প্রথম কথা। স্বয়ংবরা মুনির দিকে নিমেষের তরে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নিল।

—ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

—আমি আবার জল আনতে যাব। স্বয়ংবরা জলপাত্র তুলে নেবার জন্য পা বাড়াতেই পুলস্ত্য তাকে বাধা দিলেন, যাও ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

—জল বিনা আপনার কষ্ট হবে।

—জল আমি এনে নেব।

—আপনার কষ্ট হবে।

—তা না হয় একটু হল। পুলস্ত্যের মুখে মৃদু হাসি, তুমি আমার জন্য তো অনেক কষ্ট করেছ।

—আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছি। স্বয়ংবরা মৃদুকণ্ঠে বলল।

—কেন ?

—যদি আপনার দয়া হয়, যদি দয়া করে আপনার অভিশাপ থেকে আমাকে মুক্তি দেন।

—আমার অভিশাপ থেকে তো মুক্তি নেই।

—তবে কি আমাকে চিরদিন এই কলংকের বোঝা বইতে হবে, কুমারী অবস্থায় সন্তানের জননী হতে চলেছি আমি। একি অভিশাপ ! স্বয়ংবরার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

—এই অভিশাপ এবার আশীর্বাদ হোক। পুলস্ত্য স্বয়ংবরার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার গর্ভে যে সন্তান আসছে, সে আমার মানসপুত্র। বিশ্বখ্যাত ঋষি হবে সে। আজ থেকে তোমাকে পত্নীরূপে আমি গ্রহণ করলাম। ঘরে চল, পুরুষ সংসর্গ বিনা গর্ভসঞ্চারের যে লজ্জা, যে বেদনা, সেই লজ্জা ও গ্লানি থেকে তোমাকে মুক্তি দেব আজ।

পুলস্ত্য স্বয়ংবরাকে নিয়ে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন।

—০—

অবহেলিতা অঞ্জনা

মলয় পর্বত শিখরে ঘুরে বেড়াছেন অঞ্জনা।

তার রূপে যেন চারদিকে আলোকিত। বসন্তকালে মলয় পর্বতে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। পর্বতের গাছগাছালির ফুল থেকে ভেসে আসছে সুগন্ধ। অঞ্জনা আপন মনের খুশিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্বত শিখরে।

হঠাৎ বাতাসের গতি বেড়ে গেল ভীষণ ভাবে। একটা প্রবল দমকা বাতাস এসে অঞ্জনাকে এলোমেলো করে দিল। অঞ্জনা কিছুতেই নিজের দেহাবরণ ধরে রাখতে পারলেন না। ঝড়ো বাতাস তার কাপড় চোপড় কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর সেই ঝড়ো বাতাস যেন সহস্র বাহু দিয়ে অঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরে নীচে শুইয়ে দিল। শুইয়ে দিয়ে তাকে দলিত মর্দিত ধর্ষিত করে ফেলল। অঞ্জনা বিবশ অবস্থায় শুয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর ঝড়ো বাতাস মিলিয়ে গেল। আবার বইতে লাগল লাগল মৃদুমন্দ বাতাস। কপালে কার স্নিগ্ধ স্পর্শ পেয়ে অঞ্জনা চোখ মেললেন। তার পাশে শুয়ে আছে পরম রূপবান এক যুবক।

অঞ্জনা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, কে তুমি ?

—আমি পবনদেব। যুবক মৃদু হেসে বললেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বায়ু-কুলকে আমিই চালনা করি।

—তাহলে ক্ষণকাল পূর্বে যা ঘটে গেল, তা তোমারই কীর্তি।

—আমি তোমার রূপে আত্মহারা হয়েছিলাম অঞ্জনা। পবন স্নিগ্ধ-কণ্ঠে বললেন, তাই আমি নিজেকে সংযত করতে পারিনি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

—আমি বানররাজ কেশরীর পত্নী, অঞ্জনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, তবু তুমি আমাকে কেন ধর্ষণ করলে পবনদেব ? এই কি দেবোচিত কাজ ? এখন আমার উপায় কি হবে ?

—তুমি রাগ করো না সুন্দরি। পবনদেব অঞ্জনার কপালে চুম্বন দিয়ে বললেন,তোমার গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হবে, সে হবে সর্বযুগের মহাবীর ভক্তশ্রেষ্ঠ।

—আমি আমার স্বামীর সাথে ছলনা করতে চাইনা, অঞ্জনা বললেন, তুমি আমার সতীধর্ম নাশ করেছ, এ পুত্রের পরিচয় হবে তোমার পরিচয়ে।

—তথাস্তু। পবনদেব হেসে বললেন, তোমার এ পুত্রের পিতা বলে পরিচয় দিলে আমারও গৌরব বাড়বে। আমি অলক্ষ্যে থেকে সর্বদা রক্ষা করব তোমার পুত্রকে। যাও এবার ঘরে ফিরে যাও। আমাকে স্মরণ করলেই আমি দেখা দেব।

অঞ্জনা গাত্রাবরণ কুড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে এলেন রাজ-প্রাসাদে। স্বামী তাকে খুব ভালোবাসেন। স্বামীর সাথে তিনি লুকোচুরি করতে পারবেন না। স্বামীকে তিনি সব কথা খুলে বলবেন। তারপর যা হয় হবে। স্বামী তাকে ত্যাগ করলে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

প্রাসাদে এসে অঞ্জনা স্বামীকে সব খুলে বললেন। ভেবেছিলেন, কেশরী শুনে খুব রেগে যাবেন। কিন্তু একি ? রাগের বদলে কেশরীর মুখে স্নিগ্ধ হাসি। কেশরী স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি ভাগ্যবতী অঞ্জনা। স্বয়ং পবনদেব তোমাকে গ্রহণ করেছেন এবং মহাবীর পুত্র-লাভের বর দিয়েছেন, এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে !

—পরপুরুষ আমাকে ধর্ষণ করল, এতে তোমার ক্রোধ হচ্ছে না ?

—ক্রোধ কেন হবে অঞ্জনা, আনন্দই হচ্ছে। কেশরী হেসে বললেন,

তুমি জান, আমি পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। তোমাকে পুত্র দিতে পারিনি, এই দুঃখ আমাকে সর্বদা পীড়ন করত। তোমার মুখ দেখে আমার খুব কষ্ট হত। এবার তুমি সুখী হবে।

—আমি সুখী হব। অঞ্জনা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু অন্যের ঔরসজাত পুত্র আমার গর্ভে এলে তুমি কি করে সুখী হবে স্বামী ?

—আমি সুখী হবো অঞ্জনা, কেশরী পত্নীকে কাছে টেনে নিলেন, তোমার সুখেই আমার সুখ। তুমি মা হতে পেরেছ, তাতেই আমার সুখ। তুমি আমাকে ভালবাস এতেই আমার সুখ।

অঞ্জনা এবার স্বামীর বুকে মুখ গুঁজলেন সুখে।

আঠার মাস পর অঞ্জনা সন্তান প্রসব করলেন। পরম রূপবান পুত্র। বানর গোষ্ঠীর সঙ্গে তার আকৃতির কিছুটা মিল থাকলেও দেব-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলই খুব বেশী। বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, মুখে চোখে সরলতা পবিত্রতা। পুত্রের নামকরণ করা হল, হনুমান।

অঞ্জনা ও কেশরী পুত্রের আকৃতি দেখে খুব খুশি। কিন্তু ওই পুত্রের যে কি প্রচণ্ড ক্ষমতা ও শক্তি, তা তারা বুঝতে পারেননি তখনও।

অঞ্জনা পুত্রকে স্তন্যপান করাচ্ছেন, সেই সময় হনুমানের চোখ পড়ল নবোদিত সূর্যের পানে। পূর্বাকাশ আলো করে একটি রক্তগোলকের মতো সূর্য শোভা পাচ্ছিল।

হনুমানের মনে দারুণ ইচ্ছা জাগল ওই রক্ত গোলবাটি নেবার জন্য। সে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পথে দিল বিরাট এক লাফ। সূর্যকে ধরবার জন্য। সেদিন ছিল সূর্য গ্রহণ। রাহু তখন সূর্যকে গ্রাস করবার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। বিশাল দেহ হনুমানকে সূর্যের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে ভয়ে পালিয়ে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে।

রাহু কেঁদে বলল, আপনি আমাকে বছরে একদিন সূর্যগ্রাসের অধিকার দিয়েছেন। কোথা থেকে আর একটা অসুর এসেছে সূর্যগ্রাসের জন্য। সূর্যগ্রাস করে সে তো পরে স্বর্গও গ্রাস করবে।

ইন্দ্র ভয় পেয়ে বেরিয়ে পড়লেন বজ্র নিয়ে। সূর্যের কাছে গিয়ে হনুমানকে দেখে তার মাথায় করলেন বজ্রাঘাত। বজ্রের আঘাতে হনুমান অজ্ঞান হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেলেন মা অঞ্জনার সামনে।

অঞ্জনা হনুমানের ওই অবস্থা দেখে ক্রোধে ফুঁসে উঠলেন। চীৎকার করে বললেন, কোথায় আছো পবনদেব? দেখে যাও তোমার পুত্রের কি অবস্থা হয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে পবনদেব এসে দাঁড়ালেন অঞ্জনার সামনে। অঞ্জনা দুচোখে আগুন ছড়িয়ে বললেন, তুমি যদি হনুমানকে পুত্র বলে স্বীকার কর, তাহলে তোমাকে এর প্রতিকার করতে হবে।

পবনদেব বললেন, তুমি উতলা হয়ো না অঞ্জনা। দেখি কার এমন সাহস আমার পুত্রের শরীরে আঘাত করে। ত্রিলোক জানে হনুমান আমারই প্রিয় পুত্র।

মুহূর্তের মধ্যে অগণিত বায়ুতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল চারধারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতের ফলেই হনুমানের এই অবস্থা।

পবনদেব ক্ষোভে ক্রোধে বললেন, স্বর্গমর্ত্যের আমি প্রাণবায়ু। মুহূর্তের জন্য আমি কাজ বন্ধ করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হবে। তবে তাই হোক।

পবনদেব কাজ বন্ধ করে দিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বায়ুর গতি গেল স্তব্ধ হয়ে। বিশ্বচরাচরের যেন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। গাছপালা শুকিয়ে গেল। নদী সমুদ্রের জল শুকিয়ে গেল। স্বর্গমর্ত্য পাতালে সকলের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। চারধারে শুধু মৃত্যুর হাহাকার।

দেবতারা ছুটে গেলেন ব্রহ্মার কাছে।

—পিতামহ, আপনি পবনদেবকে সন্তুষ্ট করুন।

—হনুমান জীবন ফিরে না পেলে পবনদেব তুষ্ট হবে না। ব্রহ্মা বললেন।

—আমি হনুমানের জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছি। যমরাজ বললেন।

—বেশ, তোমরা সবাই চল হনুমান মাতা অঞ্জনার কাছে। পবনদেব সেখানেই আছেন।

দেবতারা ব্রহ্মার সাথে উপস্থিত হলেন অঞ্জনার সামনে। অঞ্জনা বসে আছেন অজ্ঞান পুত্র হনুমানকে কোলে করে। সামনে দাঁড়িয়ে বিমর্ষমুখ পবনদেব।

ব্রহ্মা সহ দেবগণকে দেখে অঞ্জনা উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে প্রণাম করলেন।

সর্বাগ্রে এগিয়ে এলেন ব্রহ্মা। অঞ্জনাকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, মা অঞ্জনা, পুত্রের জন্য তোমার ব্যাকুলতা স্বর্গভূমিকে আলোড়িত করে তুলেছে। তুমি অভ্রংলিহা; তোমার পুত্রও হবে তোমার মতো অভ্রংলিহ। আমার বরে হনুমান হবে অজেয় অমর।

—কিন্তু আমার পুত্র যে এখনও নিঃস্পন্দ অচেতন।

—আমার বরে তোমার পুত্র জীবন ফিরে পাবে। এবার এগিয়ে এলেন যমরাজ। হনুমানের গায়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করতেই হনুমান তার বিশাল শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ইন্দ্র বললেন, অঞ্জনা, হনুমানের শরীরে বজ্রাঘাতের জন্য আমি লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। আমার আশীর্বাদে বজ্রতুল্য হবে ওর শরীর।

অগ্নি বললেন, আমার আশীর্বাদে হনুমানের শরীর কখনও অগ্নিতে পুড়বে না।

বরুণদেব বললেন, আমার বরে হনুমান কখনও সাগরজলে ডুববে না।

প্রতি দেবতাই যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী হনুমানকে বর দিয়ে স্বর্গভূমিতে ফিরে গেলেন।

হনুমান বললেন, মাগো, তুমি আমাকে কি আশীর্বাদ করলে ?

অঞ্জনা পুত্রের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, আমার আশীর্বাদে তুমি হবে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। যতদিন সৃষ্টি থাকবে, সর্বলোকে ভক্ত-শ্রেষ্ঠ দেবতা হিসাবে তুমি পূজা পাবে।

এবার এগিয়ে এলেন পবনদেব। পুত্রের মাথায় হাত রেখে বললেন, হনুমান, তুমি আমার গৌরব, তুমি আমার গর্ব। ঝড়ের চেয়ে দ্রুত হোক তোমার গতি, জগতের শ্রেষ্ঠতম বীরের চেয়েও বড় বীর হও তুমি—বীরসমাজে তুমিই হবে একমাত্র মহাবীর। ভগবান বিষ্ণু মর্ত্যলোকে যখন নরলীলা করবেন, তুমি হবে তার বক্ষের ধন।

হনুমান পিতা মাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

—০—

তিমির তপস্বিনী তারা

বানর সমাজের মহাবৈদ্যের নাম সুষেণ। তিনি বিশাল এক বানর সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীপতি। তার আদরিণী কন্যা তারা রূপে গুণে অদ্বিতীয়া।

এমন কন্যা রাজার ঘরণী হবার উপযুক্ত। সুষেণ তাই কিস্কিন্ধ্যা রাজ্যের বানররাজ বালির সঙ্গে তারার বিবাহ দিলেন।

সমগ্র বানর সমাজে বালির চেয়ে প্রতাপশালী রাজা আর কে আছে? বল বীর্য পরাক্রমে বালি অদ্বিতীয়। শুধু তাই নয়। তার মতো ধার্মিক রাজাও বিরল। প্রতিদিন চার সাগর জলে তর্পণ করে তিনি ধর্মকৃত্য করেন। লঙ্কেশ্বর রাবণকে পর্যন্ত তিনি জব্দ করেছিলেন। স্বর্গমর্ত্য পাতাল জয় করে বালির সাথে যুদ্ধ করতে এসেছিলেন রাবণ। বালি তাকে লেজে বেঁধে চার সাগরের জল খাইয়ে এবং আকাশ পথে ঘুরিয়ে আধমরা করে ছেড়েছিলেন। রাবণ হাতে পায়ে ধরে সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করেছিলেন।

এ হেন মহাবীর ধার্মিক স্বামী পেয়ে তারার মনে সুখের শেষ নেই।

মহাবলী বালিও তারাকে খুব ভালোবাসেন। আদর করে তারাকে বলেন, তুমি হলে আমার জীবনের ধ্রুবতারা।

—ধ্রুবতারা কেন? তারা হেসে বলেন।

—দ্যাখ, আমি কাঠখোট্টা জীব। যুদ্ধ, হত্যা এসব ভালো বুঝি। ন্যায় নীতি এসব ভালো বুঝি না। তুমি ধ্রুবতারার মতো আমাকে ঠিক পথে চালনা করছ, ন্যায় নীতি তুমিই অনেক সময় বলে দাও।

—আমি তোমার শুধু তারা। স্বামীর বুকে মুখ রেখে তারা বলেন, তোমার ধর্মপত্নী, তোমার সেবিকা।

—তুমি আমার প্রাণাধিকা। বালি তারাকে আদর করে বলেন, আমার প্রাণ একসময় চলে যাবে, কিন্তু তবু সেই চলে যাওয়া প্রাণের মধ্যেও তুমি বেঁচে থাকবে।

তারা স্বামীর মুখ চেপে বলেন, ও কথা বলো না। মৃত্যুর কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।

—তবু তো আমাকে একদিন মরতেই হবে। তখন ?

—তখন আমার এই দেহটি হয়তো শুধু থাকবে একটা শুকনো শক্ত কাঠের মতো। আমার হৃদয় মন আত্মা সবই তোমার সাথে ধ্বংসহয়ে যাবে।

* * *

মহিষাসুর দানব এসে কিস্কিন্ধ্যারাজ্য তোলপাড় করে দিচ্ছে। হাজার হাজার বানরকে সে হত্যা করছে, অসংখ্য গাছপালা ফলমূল নষ্ট করে ফেলছে।

বালি ভাই সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। মহিষাসুর এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল। বালিও ঢুকে পড়লেন সেই গুহায়।

ভাই সুগ্রীবকে বলে গেলেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এই গুহার মুখে বসে থাকো। যদি আমি না ফিরে আসি, তুমি যাবে মহিষাসুরকে দমন করতে।

বালি গুহার মধ্যে ঢুকে মহিষাসুরকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করলেন। সুরু হল দুজনের মরণপণ যুদ্ধ। দিনের পর দিন কেটে গেল। যুদ্ধ আর শেষ হয় না, কেউ কম যায় না।

এদিকে সুগ্রীব ভাবলেন, দাদা নিশ্চয় মারা গেছেন, তিনি আর ভিতরে না ঢুকে চলে গেলেন কিস্কিন্ধ্যা নগরে। দাদার মৃত্যুর খবর প্রচার করলেন। তারপর নিজেই রাজা হয়ে বসলেন।

রাজা হয়ে তিনি বললেন, রাজ্য পেয়েছি। এবার রাণীকে চাই। দাদার স্ত্রী এখন আমার স্ত্রী।

তারার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। রাজা মারা গেলে পরবর্তী রাজা তার স্ত্রীকে গ্রহণ করবে, এটা রাজ্যের প্রথা। কিন্তু তিনি কি করে এই প্রথা মানবেন? তার দেহমন যে তার স্বামীর উদ্দেশে উৎসর্গিত। কিরূপে তিনি অন্যের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবেন?

সুগ্রীব তারাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন, কিন্তু তারার কাছ থেকে কোন সাড়া আসে না। শেষটায় সুগ্রীব জোর করে তারাকে নিজের মহলে এনে আটকে রাখলেন।

তারপর তারার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাকে ভোগ করতে লাগলেন।

সুগ্রীবের পাশব পীড়নে তারা অসহায় নিঃস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকেন। ঠিক যেন একটা মৃতদেহ। আর একটা মৃতদেহকে কতক্ষণ ভোগ করা হায়। সুগ্রীব একসময় বিরক্ত হয়ে চলে যান।

এর মধ্যেই একদিন মহিষাসুরকে দমন করে ফিরে এলেন বালি। ভাইয়ের কাণ্ড দেখে তিনি রেগে আগুন। রাজ্য থেকে দূর করে দিলেন ভাইকে।

তারাকে খুসিমনে তিনি আবার গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তারার কোন দোষ নেই। সুগ্রীব জোর করে তাকে অধিকার করেছিলেন।

* * *

রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সাথে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন ঋষ্যমূক পর্বতে। সুগ্রীব, হনুমান সেখানে বাস করেন।

সুগ্রীব বললেন, প্রভু, আমার দাদা বালি আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য থেকে। তুমি আমার রাজ্য উদ্ধার করে দাও।

রামচন্দ্র বললেন, দিতে পারি যদি তুমি সীতা উদ্ধারে আমাকে সাহায্য কর।

বালি বললেন, আমি রাজ্য ফিরে পেলে আমার বানর বাহিনী নিয়ে সীতাকে উদ্ধার করে দেব।

রামচন্দ্র বললেন, বেশ, তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও। তোমাকে দেখলে বালি যখন তেড়ে আসবে, তখন আমি বালিকে বধ করব।

সুগ্রীব বললেন, মনে রেখো প্রভু, বালি কিন্তু যেমন তেমন বীর নয়। বালি অসাধারণ বীর। দুর্ধর্ষ রাবণকে পর্যন্ত হার মানতে হয়েছিল তার কাছে।

রামচন্দ্র মৃদু হাসলেন সে কথা শুনে।

পরদিন সুগ্রীব কিস্কিন্ধ্যানগরে গিয়ে গর্জন করতে লাগলেন। সে গর্জন শুনে বালি তেড়ে এসে ভাইকে ধরলেন। দু'ভায়ের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড লড়াই।

রামচন্দ্র ধনুর্বাণ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গাছের আড়ালে। কিন্তু বাণ ছুঁড়বেন কি করে ? দুভাইকে দেখতে এক রকম। দূর থেকে বালি সুগ্রীবকে আলাদা করে চেনা যায় না। রামচন্দ্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ওদিকে বালি সুগ্রীবকে ধরে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিলেন। অন্য কেউ হলে প্রাণে মেরে ফেলতেন। নেহাৎ ভাই বলে আধমরা করে ছেড়ে দিলেন। সুগ্রীব প্রাণ নিয়ে কোনমতে পালিয়ে এলেন।

রামকে বললেন, বালি আমাকে এমনভাবে মারল, তুমি দাড়িয়ে শুধু দেখলে ?

রামচন্দ্র বললেন, কি করব বল ? তোমরা দুজনেই দেখতে একরকম। আমি বাণ ছুঁড়ব কার গায়ে ? বাণ ছুঁড়লে যদি তোমার শরীরে আঘাত লাগত ? তুমি এবার শরীরে কোন চিহ্ন দিয়ে যাও, যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি।

লক্ষ্মণ সুগ্রীবের গলায় এবার ঝুলিয়ে দিলেন একটি মালা। সেই মালা পরে সুগ্রীব রাজধানীর ভিতর গিয়ে তর্জন গর্জন শুরু করে দিলেন।

তা শুনে বালি রেগে বললেন, দাঁড়া, আমি আসছি। আজ আর ভাই বলে কোন খাতির করব না।

তারা বললেন, তুমি আজ লড়াই করতে যেও না নাথ।

—কেন ? যাব না কেন ?

—সুগ্রীব কাল অত মার খেয়ে পালিয়ে গেছে। কি সাহসে সে আবার যুদ্ধ করতে এসেছে ? নিশ্চয় ওর পিছনে কেউ আছে যার কাছে সাহস পেয়ে ও আবার এসেছে।

—কার কাছে ও আবার সাহস পাবে ? বালি তাচ্ছিল্য করে বললেন।

—আমি শুনেছি রঘুবংশের রামচন্দ্র রাজ্য হারিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বনে বনে ঘুরছেন। নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে সুগ্রীবের দেখা হয়েছে। রামের কাছে সাহস পেয়েই সুগ্রীব লড়াই করতে এসেছে। তোমার কোন ক্ষতি করবার সাধ্য সুগ্রীবের নেই। রামচন্দ্রই তোমার ক্ষতি করতে পারেন।

—রামচন্দ্র আমার ক্ষতি করবেন কেন ? বালি অবাক হয়ে বললেন, শুনেছি তিনি খুব সদাশয়। করুণায় ভরা তার মন। আমার সাথে তো রামের শত্রুতা নেই। রামচন্দ্র আমার কোন ক্ষতি করবেন না।

—তা না করুন, তুমি আজ লড়াই করতে যেও না। তারা স্বামীর হাত ধরে বললেন, বরঞ্চ তুমি ভাইয়ের সাথে একটা মিটমাট করে নাও। ভাইকে রাজ্যের একটা অংশ ছেড়ে দাও। দুভাই রাজত্ব কর।

—কিছুতেই না। বালি ক্রোধে বললেন, সুগ্রীবকে আজ আমি বেঁধে নিয়ে এসে তোমার পায়ের উপর ছেড়ে দেব। হতভাগা তোমার উপর জোর খাটায় !

—সুগ্রীবের ধর্ম সুগ্রীব রেখেছে, তোমার ধর্ম তুমি রাখ। তুমি লড়াই করতে যেও না।

—আমাকে যেতে হবেই তারা। ওই শোন সুগ্রীবের চীৎকার। আমি না গেলে লোকে আমাকে ব্যঙ্গ করবে।

তারাকে সরিয়ে বালি চলে গেলেন লড়াই করতে। সুগ্রীবের কাছে গিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এক চড়ে সুগ্রীবকে মাটিতে ফেলে দিলেন। রামচন্দ্র আড়াল থেকে ছুঁড়লেন ঐষিক বাণ। দশ দিক আলো করে সেই বাণ ছুটে এসে বালির বুকে আঘাত করল। বালি ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে গেলেন।

সুগ্রীব আর রাম দৌড়ে এলেন বালির কাছে।

রামকে দেখে বালি বললেন, এ তুমি কি করলে রাম? বিনা দোষে আমাকে হত্যা করলে? শুনেছি তুমি ধর্ম অবতার। এই কি তার নমুনা? আমার পাপী ভাইকে আমি শাস্তি দিচ্ছিলাম, তুমি আড়াল থেকে ভয়ংকর বাণ মেরে আমাকে মেরে ফেললে!

রামচন্দ্র বললেন, আমাকে ক্ষমা কর বালিরাজ। আমার হাতে মৃত্যু তোমার নিয়তি। তুমি এবার স্বর্গে যাও।

বালি বললেন, তুমি আমার পুত্র অঙ্গদকে দেখো। আর তারাকে সুগ্রীব যেন কষ্ট না দেয়। বলতে বলতে বালির মৃত্যু হল।

উন্মাদিনীর মতো ছুটে এলেন তারা। স্বামীর বুকের উপর লুটিয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে বললেন, রাম, বিনা দোষে তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করেছ। আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করবে, কিন্তু তাকে পাবে না। তুমি আমাকে যেভাবে কাঁদালে সীতার জন্য তোমাকেও সেভাবে কাঁদতে হবে। কর্মফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে রাম।

এই বলে তারা লুটিয়ে পড়লেন স্বামীর দেহের উপর।

—০—

মঞ্জু মনোহরা মন্দোদরী

নিবিড় অরণ্যের মধ্যে হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাবণ। নিবিড় অরণ্যের শ্যাম ছায়ায় এ আবার কোন সোনার হরিণী? গভীর আয়ত কালো চোখ অনুপম ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রূ, পীনোন্নত বক্ষ, চাঁদের মতো মুখ। কে এই মঞ্জু মনোহারিণী? রাবণ মুগ্ধ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

রাবণের দৃষ্টির চুম্বক সেই মঞ্জু মনোহরাকে আকৃষ্ট করল। তিনিও চকিতে ফিরে তাকালেন। তার দৃষ্টিতেও বিস্ময় চমক এবং মুগ্ধতা। নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কে এই শালপ্রাংশু পুরুষ শ্রেষ্ঠ?

রাবণ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

—কে তুমি নিরুপমা তিলোত্তমা সুন্দরি!

—আমি দানব সমাজের প্রধান স্থপতি মহাশিল্পী ময়দানবকন্যা মন্দোদরী। আমার মাতা হেমা অপ্সরা।

—তোমার পিতা মহাশিল্পী অথচ এই অরণ্যে তোমাদের বাস কেন?

—ত্রিলোকের অসংখ্য মহানগরীর মহাস্রষ্টা আমার পিতা এই আরণ্যক পরিবেশে থাকতেই ভালোবাসেন। তিনি বলেন যে চারপাশে এই বৃক্ষরাজি, এই পর্ণকুটির হল শ্রেষ্ঠ বাসস্থান।

—তোমার পিতাকে এখানে মানালেও তোমায় তো এখানে মানায় না সুন্দরি।

—কোথায় আমাকে মানায়? মন্দোদরীর ঠোঁটে মৃদু হাসি।

—তোমাকে মানায় ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠতম রাজপ্রাসাদে।

—কোথায় সেই রাজপ্রাসাদ ?

—স্বর্ণলংকায়। রাবণ এবার মৃদু হেসে বললেন, আমি লঙ্কেশ্বর রাবণ। আমার স্বর্ণলংকার স্বর্ণপ্রাসাদে স্বর্ণপ্রতিমা নেই। তুমি হবে সেই স্বর্ণপ্রতিমা।

এবার মন্দোদরীর মুখে লজ্জার রক্তিম আভা ফুটে উঠল। মৃদুকণ্ঠে বললেন, ওই দেখা যাচ্ছে আমার পিতার কুটির। আপনি আমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করুন।

এই বলে মন্দোদরী স্বর্ণহরিণীর মতোই কোথায় চকিতে মিলিয়ে গেলেন।

রাবণ ধীরে ধীরে উপস্থিত হলেন ময়দানবের কুটিরে। সৌম্যদর্শন মহাশিল্পী রাবণের পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন।

—তুমি মহামুনি বিশ্বশ্রবার জ্যেষ্ঠপুত্র। আপন সাধনা ও পরাক্রমে তুমি স্বর্ণলংকার অধিকারী হয়েছো, এ কথাও আমি শুনেছি।

—আপনার কন্যা মন্দোদরীকে আমি বিবাহ করতে চাই।

—তুমি তো ত্রিলোক জয় করে অসংখ্য দেবকন্যা দানবকন্যা গন্ধর্বকন্যাকে বিবাহ করেছ। তবু তোমার এ প্রার্থনা কেন ?

—দেব দানব ও গন্ধর্বলোক জয় করবার পর সেখানকার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে পতিত্বে বরণ করেছে। এরা মহিষী, কিন্তু প্রধানা মহিষী নয়। আপনার কন্যাকে দেখার পর আমার মনে হয়েছে তিনিই আমার প্রধানা মহিষী হবার একমাত্র উপযুক্ত। কৃপা করে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।

—উত্তম। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম। ময়দানব হেসে বললেন।

রাবণ মন্দোদরীকে বিবাহ করে লংকাপুরীতে নিয়ে গেলেন। মন্দোদরী শুধু অসমান্য রূপবতী নন, অশেষ গুণবতীও। দেব দানব

গন্ধর্বের মহাত্রাস লংকেশ্বর দুর্ধর্ষ রাবণকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করে ফেললেন।

রাবণের মহিষী অগণ্য। কিন্তু রাবণ মন্দোদরী ছাড়া আর কাউকে জানেন না। মন্দোদরীকে তিনি সম্মান করেন, মন্দোদরীকে তিনি ভয়ও করেন। যে রাবণের ভয়ে ত্রিলোক কম্পিত, সেই রাবণ একজন ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরীকে সকল ব্যাপারে সমীহ করে চলেন, একথা সকলে জানে।

মন্দোদরী রাবণকে মেঘনাদের মতো বীরপুত্র উপহার দিয়েছেন।

মন্দোদরীকে বিবাহ করার পর থেকে রাবণ নিজেকে অনেক সংযত করেছেন।

তবু দৈবের নির্বন্ধ। শূর্পণখার প্রতি রামচন্দ্রের অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পঞ্চবটী থেকে সীতা হরণ করতে বাধ্য হলেন।

সীতাহরণের পর থেকেই রাবণের মনের মধ্যে আবার পাশব প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি সীতাকে পাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

মন্দোদরী অতি বুদ্ধিমতী। তিনি সীতার প্রতি স্বামীর দুর্বলতার কথা ভালোভাবেই জানতেন। সীতার মতো অগ্নিশিখারূপিণী নারীর প্রতি দুর্ধর্ষ পুরুষের আকর্ষণ যে স্বাভাবিক, তাও তিনি জানতেন। তাই তিনি স্বামীর কোন দোষ না ধরে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, তুমি সীতাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে এস। সীতার জন্য শেষ পর্যন্ত লংকার সর্বনাশ হবে, এ আমি বুঝতে পারছি।

—সীতাকে আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দেব না। রামচন্দ্র সামান্য মানুষ হয়ে আমার ভগ্নীর নাসিকাকর্ণ ছেদন করেছে, এত বড় স্পর্ধা তাঁর!

—তোমার ভগ্নী শুনেছি সীতাকে গ্রাস করতে গিয়েছিল। তার ফলেই তো তার এই দুর্দশা। সীতা নিরপরাধ, তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও। এই আমার অনুরোধ।

—মন্দোদরী, মহারাণি, তোমার সব অনুরোধ আমি রক্ষা করি, কিন্তু এই অনুরোধ রক্ষা করতে পারবো না।

মন্দোদরী স্বামীর প্রতি রাগ করেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, রাবণকে এখন ভাল কথা বলা বৃথা। এখন সীতাকে রক্ষা করাই তার একমাত্র কর্তব্য।

তিনি অশোকবনে সীতাকে আড়াল থেকে পাহারা দেন। রাবণ এসে সীতার উপর যাতে কোন অত্যাচার না করতে পারেন, সে দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখেন।

রাবণ এসে দিনের পর দিন সীতার্ কাছে প্রেম নিবেদন করছেন। সাধ্য সাধনা করছেন তাকে পাবার জন্য। সীতা অবিচল অনমনীয়।

শেষে একদিন রাবণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। বিশাল এক খড়্গ নিয়ে এলেন সীতাকে কেটে ফেলবার জন্য।

—তুমি আমার কথা যেমন শুনলে না। তোমাকে আজ আমি কেটেই ফেলব।

প্রচণ্ড রাগে রাবণ সীতাকে কাটবার জন্য খড়্গ তুললেন। মন্দোদরী আড়ালে ছিলেন। ছুটে এসে রাবণের হাত ধরলেন, এ তুমি করছো কি? শেষকালে নারীবধ করবে তুমি!

রাবণ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমি সহ্যের শেষ সীমায় এসেছি। আমি সীতাকে হত্যা করবো। রাবণ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

—সীতাকে হত্যা করবার পূর্বে তুমি আমাকে আগে হত্যা কর। মন্দোদরী সীতার সামনে গিয়ে তাকে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

রাবণ তখন রাগে আত্মহারা। মন্দোদরীকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি সীতার উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠলেন মন্দোদরী, নলকুবেরের অভিশাপের

কথা তুমি ভুলে গেলে ? নারীর উপর বল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে। এমন কাজ তুমি করোনা।

এতক্ষণে রাবণের চৈতন্য হল। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মন্দোদরী এবার রাবণের হাত ধরে বললেন, চল, এবার শয়ন কক্ষে চল।

মন্দোদরীর পিছু পিছু রাবণ শয়ন কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মন্দোদরী বুঝতে পারছিলেন যে রাবণের পাপে এবার লংকাপুরীর বিনাশ অনিবার্য। মেঘনাদ যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তাকে প্রণাম করতে এলে তিনি পুত্রকে বললেন, এখনও সময় আছে পুত্র, তোমার পিতাকে ফিরিয়ে দিতে বল সীতাকে। তোমার পিতা সীতাহরণ করে অন্যায় করেছেন। সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে তার প্রতিবিধান করতে বল তুমি। মেঘনাদ বললেন, তা হয় না মা। আমার পিতা মহাবীর। সীতাকে ফিরিয়ে দিলে তিনি সবার কাছে ছোট হয়ে যাবেন। তুমি আমাকে এবার যুদ্ধযাত্রায় অনুমতি দাও মা।

—তুই আজ যুদ্ধে যাসনে বাবা। আমার মন বলছে, এযুদ্ধে মঙ্গল হবে না।

—আমি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করে যুদ্ধযাত্রা করব মা। তোমার আশীর্বাদ আর ইষ্টদেবের বরে আমি জয়ী হব। মাকে প্রণাম করে মেঘনাদ চলে গেলেন। সেই যাত্রাই তার শেষ যাত্রা। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের হাতে তার মৃত্যু হল।

পুত্রশোকে মন্দোদরী পাগলিনীপ্রায়। রাবণও প্রিয় পুত্রকে হারিয়ে উন্মত্ত। এবারও তিনি খড়্গ নিয়ে ছুটলেন সীতাকে বধ করবার জন্য। মন্দোদরী পুত্রশোক বুকের মধ্যে চেপে ছুটলেন স্বামীর পিছু পিছু।

রাবণকে তিনি পিছন থেকে জাপটে ধরে বললেন, এ কাজ তুমি করো না প্রভু। সীতাকে তুমি বধ করো না।

—তোমার প্রিয়তম পুত্র মেঘনাদকে লক্ষ্মণ অন্যায়ভাবে বধ করেছে, তুমি সীতাকে বাঁচাতে চাইছ ?

—হ্যাঁ, চাইছি। মন্দোদরীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা, নিরপরাধ সীতার এই দুঃখকষ্টের জন্যই আমার কপালে এই পুত্রশোক দহনজ্বালা।

—তুমি সীতাকে ক্ষমা করতে পারো, আমি ক্ষমা করবো না। রাবণ মন্দোদরীকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

মন্দোদরী এবার ক্রোধে ফুঁসে উঠলেন।

—তুমি না মহাবীর রাবণ? দেব দানব গন্ধর্ব তোমাকে না ভয় করে? অবলা এক নিরপরাধ নারী বধ করে তুমি বীরত্ব দেখাতে চাও? পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও তো যাও, রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ কর। দেখি কেমন তোমার ক্ষমতা!

মন্দোদরীর ভর্ৎসনায় রাবণ আহত কণ্ঠে বললেন, বেশ তাই হবে। রামলক্ষ্মণ বধ করেই নেব পুত্রহত্যার প্রতিশোধ।

রাবণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হলেন। মন্দোদরীর কাছে বিদায় নিতে এলে মন্দোদরী কেঁদে ফেললেন।

তিনি বুঝতে পারলেন, এই দেখাই হয়তো শেষ দেখা। কেননা তিনি আসন্ন সর্বনাশের নানা লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন, মনের মধ্যে শুনেছেন সর্বনাশের পদধ্বনি।

রাবণ মন্দোদরীর হাত ধরে বললেন, রামকে বধ করতে পারলে তবেই আমি বিজয়ীর বেশে ফিরে আসব, নচেৎ—

রাম রাবণের সেদিন যুদ্ধ হল বড় ভয়ংকর। দুজনেই মরণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু রাবণ শেষরক্ষা করতে পারলেন না। রামচন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে তার মৃত্যু হল।

খবর পেয়ে উন্মাদিনীর বেশে দৌড়ে এলেন মন্দোদরী। রণক্ষেত্রে বিশাল এক মহীরুহের মতো পড়ে আছেন দেব দানব গন্ধর্ব ত্রাস লঙ্কেশ্বর রাবণ। মন্দোদরী তার বুকের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে একসময় শান্ত হয়ে গেলেন তিনি। উঠে

দাঁড়িয়ে বললেন, ত্রিলোক যার ভয়ে শঙ্কিত থাকত, সেই রাবণকে যিনি বধ করেছেন, তাকে আমি একবার দেখবো।

চোখের জল মুছে সংযত বেশবাসে শান্তধীর পায়ে মন্দোদরী উপস্থিত হলেন রামচন্দ্রের সামনে। যুদ্ধশেষে রামচন্দ্র বসে আছেন সহচরদের মাঝখানে। মন্দোদরী এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, চিরায়তী হও।

মন্দোদরী ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে আয়তি রক্তরেখা। মাথার উপর অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ বিষণ্ণ রশ্মিমালা।

—আমি মন্দোদরী যার স্বামীকে আপনি সদ্য বধ করেছেন।

—আমার বাক্য কখনও ব্যর্থ হবে না। রাম বিষণ্ণ চোখে তাকালেন মন্দোদরীর পানে, রাবণের চিতার অগ্নি কখনও নির্বাপিত হবেনা, তুমি থাকবে চির আয়তী।

—০—

স্বয়ং শাসিতা সরমা

গন্ধর্বরাজ শৈলুষের সুন্দরী কন্যা সরমা।

পবিত্র মানস সরোবরের তীরে এই কন্যার জন্ম। জন্মের পর মানস সরোবরের জল ক্রমশ স্ফীত হয়ে সূতিকাগৃহ গ্রাস করতে উদ্যত হলে শৈলুষ পত্নী মন্ত্রোচ্চারণ করে নিষেধ করলেন: 'সরো মা বধর্তে, (হে সরোবর, আর এগিয়ে এসো না।) সরোবরের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। আর সেই থেকে কন্যার নামকরণ করা হল 'সরমা'।

সরমা সুন্দরী গুণবতী ধর্মশীলা। বাল্যকাল থেকেই ধর্মপথে তাঁর মতি। বিবাহও হল লংকেশ্বর রাবণের ভাই ধার্মিক বিভীষণের সঙ্গে।

লংকার রাজপ্রসাদে যথেষ্ট ভোগাচার আর বিলাসের মধ্যে বিভীষণ আর সরমা নিজেদের জন্য একটা শুদ্ধাচারের পরিমণ্ডল গড়ে নিয়েছিলেন।

রাবণ ছিলেন দুর্ধর্ষ ভোগাচারী। ভোগবিলাসেই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ। বিভীষণ তাকে ধর্মপথে থাকতে পরামর্শ দেন। রাবণ বিরক্ত হন শুনে। সীতাকে হরণ করে আনবার পর বিভীষণ বারবার সীতাকে ফিরিয়ে দিতে বলেছেন। রাবণ তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

বিভীষণ সরমাকে বললেন, দাদা আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলেন। আমার তো আর এখানে থাকা চলে না।

সরমা বললেন, কোথায় যাবে তুমি?

—রঘুকুলমণি রামচন্দ্রের কাছেই আমি আশ্রয় নেব। রামচন্দ্র পরম ধার্মিক।

—রামচন্দ্র পরম ধার্মিক হলেও রক্ষকুলের শত্রু। তার কাছে আশ্রয় নিলে যে সারাজীবন তোমার অপযশ থেকে যাবে।

—আমি নিরুপায় সরমা। অধর্মপথে থেকে অকলংকিত থাকার চেয়ে ধর্মপথে থেকে কলংকিত হওয়াকেই আমি শ্রেয় মনে করি।

—বেশ। তাহলে যাও। সরমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাকে তো এখানে থাকতেই হবে, এ আমার স্বামীর ঘর, এখানে আছে আমার পুত্র তরণীসেন। বিশেষ করে সীতার দেখাশুনা তো আমাকেই করতে হয়।

বিভীষণ চলে গেলেন রামচন্দ্রের আশ্রয়ে। সরমা সীতার সর্বক্ষণের সাথী। সীতার সাথে সুখ দুঃখের কথা বলেন। সীতা দুঃখে ভেঙে পড়লে তাকে সান্ত্বনা দেন।

সীতাকে বলেন, তুমি দুঃখ করো না, সময় হলেই তোমার দুঃখের অবসান ঘটবে। স্বামীর সাথে তোমার আবার মিলন হবে।

রাবণ বিদ্যুৎজিহ্ব রাক্ষসের সাহায্যে রামচন্দ্রের কাটা মুণ্ডু নির্মান করলেন। দেখে মনে হয় সদ্য সদ্য তরবারির আঘাতে রামচন্দ্রের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে, গলা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, বিষন্ন স্থির চোখে করুণ অসহায় দৃষ্টি।

রাবণ সীতার সামনে রামচন্দ্রের কাটা মুণ্ডু ধরে খুব আস্ফালন করলেন, এই ছাখ তোমার স্বামীর কাটা মুণ্ডু। এখন আর কার জন্যে তুমি বসে থাকবে? ভালোয় ভালোয় আমার কাছে চলে এস। রামের জন্যে অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই।

সীতা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তাকে শাসিয়ে রাবণ চলে গেলেন। সরমা আসতে সীতা বললেন, আমার আর এখন বেঁচে থেকে লাভ কি? আমি এই মুহূর্তে বিষ খাব।

সরমা বললেন, রামচন্দ্রকে কেউ বধ করতে পারে না। তুমি স্থির হও। আমি আসল ঘটনাটা জেনে আসি।

সরমা এদিক সেদিক ঘুরে জানতে পারলেন, রামচন্দ্র নিরাপদে আছেন। রাবণ তাকে রামের মায়ামুণ্ড দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছেন।

সরমা এসে সীতাকে সেই কথা বলতে সীতা যেন প্রাণ ফিরে পেলেন।

সরমা সীতার সখীর মতো। সীতা কাঁদলে তার চোখের জল মুছিয়ে দেন।

রামচন্দ্রের সাথে রাবণের এদিকে তুমুল যুদ্ধ চলছে। রামচন্দ্রের তীব্র আক্রমনে একে একে নিহত হচ্ছেন বড় বড় সেনাপতি, আত্মীয় পরিজন। প্রতিদিন যুদ্ধশেষে লংকাপুরীতে শোনা যায় ক্রন্দন হাহাকার।

একদিন সরমা এসে সীতার কাছে বসলেন। অন্য দিনের মতোই সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার কোন চিন্তা নেই সীতা। শীঘ্রই তোমার দুঃখের অবসান হবে। বড় বড় রক্ষবীর নিহত হচ্ছে।

—আজ কোন রক্ষবীর নিহত হল?

সরমা সীতার দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে।

—কি হল? আজ কোন বীর নিহত হল বললে না তো সখী।

—আজ তরণীসেন যুদ্ধে নিহত। সরমা মাথা নীচু করে বললেন।

—তরণীসেন? তোমার একমাত্র পুত্র? সীতা আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

—হ্যাঁ, আমার একমাত্র পুত্র তরণীসেন আজ তোমার স্বামীর অস্ত্রে নিহত। সরমার চোখ দিয়ে এবার জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল, মৃত্যু কালেও তার মুখে ছিল রামনাম।

—তবু আমার স্বামী তাকে বধ করলেন?

—বধ করতে চাননি। তরণীর মুখে অবিরত রামনাম শুনে তোমার স্বামী ধনুর্বাণ ত্যাগ করেছিলেন। শেষে আমার স্বামীই রামচন্দ্রকে উত্তেজিত করে তাকে বধ করালেন।

—পিতা হয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করালেন? কেন?

—রামচন্দ্রের হাতে মরলে অনন্ত স্বর্গবাস। কিন্তু আমি এখন কি নিয়ে থাকব?

সরমা অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে সীতার কোলে লুটিয়ে পড়লেন।

সীতা পরমা মমতায় তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে একে একে নিহত হলেন বীরবাহু, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ প্রভৃতি বড় বড় বীর। সবার শেষে মরণপণ যুদ্ধে নিহত হলেন রাবণ। রামচন্দ্র বিভীষণকে লংকার রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করে বললেন, রাজ্যের সঙ্গে রাজার রাণীকেও গ্রহণ করা রাজকীয় প্রথা। তুমি রাণী মন্দোদরীকেও মহিষীরূপে গ্রহণ করো।

বিভীষণ মন্দোদরীকে প্রধানা মহিষীরূপে গ্রহণ করলেন। মহা আড়ম্বরে বিভীষণ রাণী মন্দোদরীকে পাশে নিয়ে লংকারাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

সরমা নীরব দর্শক হয়ে শুধু তাকিয়ে দেখলেন।

রাজা হয়ে বিভীষণ সীতাকে রামচন্দ্রের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। সীতাকে সাজিয়ে দেবার ভার দিলেন সরমার উপর। সরমা সীতাকে উত্তম বেশভূষায় সাজিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, পতির সঙ্গে সুখে মিলিত হও।

সীতা অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, আমি তো সুখী হব, কিন্তু তুমি কি নিয়ে সুখী হবে?

—স্মৃতি নিয়ে। সরমা ধীরকণ্ঠে বললেন, আমার পুত্র নেই, আমার স্বামী নেই, আমার আছে শুধু স্মৃতি। সেই স্মৃতি নিয়েই আমি বেঁচে থাকবো।

—০—

চির প্রতিবাদিনী চিত্রাঙ্গদা

গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের কন্যা পরমা সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা।

রাবণ স্বর্গবিজয় কালে চিত্রাঙ্গদাকে হরণ করে লংকায় নিয়ে এলেন। প্রধান মহিষী হবার মতো সব যোগ্যতাই চিত্রাঙ্গদার আছে। তবু রাবণ তাকে প্রধানা মহিষী করলেন না।

লংকার বিশাল রাজপ্রাসাদের এক নির্জন মহলে চিত্রাঙ্গদা ক্ষুব্ধ অন্তরে দিন কাটাতে লাগলেন।

রাবণের মহিষী অসংখ্য। ত্রিলোক জয় করে যেখানে যত সুন্দরী কন্যা পেয়েছেন, সকলকে লংকাপুরীতে ধরে এনেছেন। তারা রাবণ পত্নী, এ ছাড়া তাদের কোন স্বতন্ত্র পরিচয় নেই।

চিত্রাঙ্গদা কিন্তু আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেননি। রাবণকে স্বামীরূপে মেনে নিয়েও তার ধর্মকে তিনি নিজের ধর্ম বলে মনে করেননি।

পুত্র বীরবাহুকে তিনি ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন। মায়ের প্রভাবে বীরবাহু পেয়েছেন দেবস্বভাব। ব্রহ্মার কাছে কঠোর তপস্যা করে বীরবাহু লাভ করেছেন ঐরাবতের মতো শক্তিশালী এক হস্তী। এই হস্তীর উপর চড়ে যুদ্ধ করলে তিনি যুদ্ধে অজেয়।

চিত্রাঙ্গদা পুত্র বীরবাহুকে রাবণের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পিতৃগৃহে গন্ধর্ব লোকে। রাবণের প্রাধানা মহিষী মন্দোদরী। কিন্তু আপন ব্যক্তিত্বে চিত্রাঙ্গদাও মন্দোদরীর সমকক্ষ। স্বয়ং রাবণ চিত্রাঙ্গদাকে সমীহ করে চলেন।

পুত্র বীরবাহু চিত্রাঙ্গদার গর্ব, তার গৌরব। রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করেও বীরবাহু বিষ্ণুভক্ত। রাবণ ঘোরতর বিষ্ণু বিদ্বেষী। স্বভাবতই বীরবাহুর বিষ্ণুভক্তিতে তিনি ক্রুদ্ধ। চিত্রাঙ্গদার কাছে তিনি এ নিয়ে

অনুযোগ করলে চিত্রাঙ্গদা বলেছেন, জন্মের উপর কারো হাত নেই, কিন্তু কর্মের উপর আছে। তুমি বিশ্বখ্যাত ঋষির সন্তান, অথচ ঋষির ধর্ম না নিয়ে রাক্ষসধর্ম নিয়েছো। আমার পুত্র রাক্ষস ধর্ম না নিয়ে ঋষির ধর্ম নিয়েছে। এতে দোষ কোথায়?

রাবণ আর কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

রামচন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রামকালে রাবণ বীরবাহুকে লংকায় ডেকে পাঠালেন। বীরবাহু লংকায় এলে তাকে সেনাপতি পদে বরণ করে যুদ্ধে পাঠালেন।

রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে বীরবাহুর মৃত্যু হল।

চিত্রাঙ্গদার জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন চলে গেল। চিত্রাঙ্গদা রাবণের কাছে এসে বললেন, বীরবাহুই ছিল আমার জীবন। তার অকালমৃত্যুর জন্য তুমিই তো দায়ী। তোমার জন্যই আমার এই দুরবস্থা।

—বীরবাহু দেশের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে, এ তো তোমার গৌরব রানী।

—গৌরব নয়, লজ্জা। চিত্রাঙ্গদা তীব্রকণ্ঠে বললেন, তুমি পরস্ত্রীকে হরণ করে এনেছো। পিতার এই পাপের প্রায়শ্চিত করেছে আমার পুত্র নিজের জীবন দিয়ে।

—আমার ভগিনী শূর্পনখার অসম্মানের প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি সীতাকে হরণ করেছিলাম।

—মিথ্যা কথা। গর্জে উঠলেন চিত্রাঙ্গদা। নিজের কাম লালসা চরিতার্থের জন্যই তুমি সীতাকে হরণ করেছো, আর তার অসহায় বলি হল আমার পুত্র।

———

প্রদীপ্তা বহ্নি প্রমীলা

যক্ষরাজ বিদ্যাধরের কন্যা প্রমীলা।

প্রমীলা যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী। তার রূপগুণের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সাহসিকতা। বাল্যকাল থেকেই প্রমীলা সাহসিকা। ভয় ডর কাকে বলে জানেন না।

যক্ষরাজ বিদ্যাধরের সঙ্গে প্রমীলা যুদ্ধে যান পুরুষের বেশে, কোমরে তরবারি, হাতে ধনুর্বাণ। ধনুর্বিদ্যায় অনেক বড় বড় বীরও তার কাছে পরাজিত।

লংকেশ্বর রাবণ বিশাল বাহিনী নিয়ে ত্রিভুবন জয় করতে বেরোলেন। তার প্রধান সহায় পুত্র মহাবীর মেঘনাদ।

যক্ষরাজ্যে এসে বিদ্যাধরের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ হল। বিদ্যাধর যুদ্ধে পরাজিত হলে এগিয়ে এলেন প্রমীলা। ঝাঁকে ঝাকে তীর ছুঁড়ে রাবণকে অস্থির করে তুললেন। আড়াল থেকে প্রমীলার বীরত্ব দেখে মেঘনাদ চমৎকৃত। ইঙ্গিতে পিতাকে সরে যেতে বলে তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার বীরত্বব্যঞ্জক কন্দর্পকান্তি রূপ দেখে প্রমীলা ক্ষণেকের জন্য আত্মহারা। সেই অবসরে মেঘনাদ অদ্ভুত কৌশলে তীর দিয়ে প্রমীলার হাতের ধনুক কেটে ফেললেন।

প্রমীলা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, একি ! আমার হাতের ধনুক কাটলে কেন তুমি ?

—তোমার ও ফুলের মতো কোমল হাতে কঠিন কর্কশ ধনু মানায় না সুন্দরি।

—মানায় কি না মানায় তা তো লংকেশ্বর রাবণ বুঝেছেন।

—শুধু পিতা কেন, আমিও বুঝেছি। মেঘনাদ হেসে বললেন, তোমার বীরত্ব দেখে আমি যথার্থ বিস্মিত এবং মুগ্ধও বটে।

—তুমি কে? প্রমীলার স্বরে বিস্ময়।

—আমি রাবণ পুত্র মেঘনাদ।

—তুমিই মহাবীর মেঘনাদ! প্রমীলার স্বরে এবার মুগ্ধতা, শুনেছি তুমি যুদ্ধে অজেয়।

—এতদিন তাই ছিলাম। মেঘনাদ হাসলেন, কিন্তু এবার মনে সেই সুনাম আর থাকবে না। অন্তত একজনের কাছে আমার পরজয়ের ইঙ্গিত পাচ্ছি।

—মহাবীর মেঘনাদ তো বাক্যেও মহাবীর দেখছি। প্রমীলার মুখে লাজ রক্তিমা।

—যক্ষরাজ্যে এসে মহাবীর মেঘনাদের পতন। তোমার পিতাকে নিশ্চিন্ত হতে বলো। আমরা তার কাছে দূত পাঠাচ্ছি।

* * *

রাবণের দূত মেঘনাদের সঙ্গে প্রমীলার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেল যক্ষরাজ বিদ্যাধরের কাছে। বিদ্যাধর তো খুব খুসী। মহাবীর মেঘনাদকে জামাতা হিসাবে পাওয়া তার কাছে তো স্বপ্ন। রাবণ দুর্ধর্ষ দুরাচারী, কিন্তু মেঘনাদ চরিত্রবান অকলঙ্ক। ত্রিলোক মেঘনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

মহা আড়ম্বরে মেঘনাদের সঙ্গে প্রমীলার বিবাহ হয়ে গেল।

বাসর রাতে মেঘনাদ প্রমীলার হাত ধরে হতাশ কণ্ঠে বললেন, কি দুর্দৈব। এসেছিলাম যক্ষরাজ্য জয় করতে, আর তা নয়, একজন যক্ষ কন্যাই আমাকে জয় করে নিল।

—না গো প্রিয়তম, যক্ষকন্যা তোমাকে জয় করেনি, তুমিই যক্ষ কন্যাকে জয় করেছ। প্রমীলা হেসে স্বামীর বুকে মুখ রাখলেন, এ তো তোমার আর একটি জয়।

—কে জানে কে কাকে জয় করেছে। মেঘনাদ প্রমীলার মুখে চুম্বন রেখা এঁকে দিলেন, এখন থেকে আজীবন আমি তোমার আজ্ঞাবহ।

—ও কথা বলো না। প্রমীলা গাঢ়স্বরে বললেন, আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবন।

—যদি কোনদিন যুদ্ধক্ষেত্রে এ জীবন চলে যায়?

—সেই মুহূর্তে আর একটি জীবনও চলে যাবে।

* * *

মেঘনাদের সঙ্গে প্রমীলা লংকাপুরীতে চলে এলেন। আপন গুণে বশ করলেন সকলকে।

লংকার রাজপ্রাসাদের তিনি প্রাণ স্বরূপিণী। স্বয়ং রাবণ পর্যন্ত তার বশীভূত।

রাবণ সীতাকে হরণ করে আনবার পর শুরু হয়ে গেল বিপর্যয়। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে একে একে নিহত হলেন লংকার বড় বড় বীর। এখন শেষ ভরসা মেঘনাদ। মেঘনাদ কয়েকবার যুদ্ধে যেয়ে রামচন্দ্রকে পরাজিত করলেন।

শেষবারের মতো তিনি মরণ আঘাত দিতে চাইলেন রামচন্দ্রকে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শুরু করে ইষ্টদেবের ধ্যান করবেন। প্রমীলার কাছে বলতে এলেন যজ্ঞের কথা।

প্রমীলা বললেন, আজ তুমি যজ্ঞ শুরু করো না স্বামী। আমি যেন মনের মধ্যে অমঙ্গলের বার্তা শুনতে পাচ্ছি।

—তোমার মতো বীরঙ্গনার মুখে একথা শুনব আশা করিনি। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপ্ত করে আমি রামচন্দ্রকে বধ করতে যাব। তখন তুমি আমাকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে দিও।

—তা দেব। প্রমীলা ম্লান হেসে বললেন, কিন্তু আজ কি যজ্ঞ না করলেই নয়? আজ যজ্ঞ স্থগিত রাখো।

—তা হয় না সুন্দরি। মেঘনাদ ধীরকণ্ঠে বললেন, লংকাপুরী

বিধ্বস্তপ্রায়। একটি মুহূর্তও এখন মূল্যবান। যজ্ঞ সাঙ্গ করে অবিলম্বে রামচন্দ্রের নিধন না করলে লংকাপুরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে। এবার বিদায় দাও।

প্রমীলা চোখের জল গোপন করে স্বামীকে বিদায় দিলেন। সেই তার শেষ বিদায়। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষণ বিভীষণের সঙ্গে এসে নিরস্ত্র অবস্থায় মেঘনাদকে হত্যা করলেন।

মেঘনাদের মৃত্যুতে সমগ্র লংকাপুরী শোকে আচ্ছন্ন। রাজকীয় আড়ম্বরে সাগরতীরে মেঘনাদের চিতা সাজানো হল। সমগ্র রাজ্যের রাক্ষসবৃন্দ ভিড় করেছে সাগরতীরে। সকলের চোখে অশ্রুধারা।

মেঘনাদের চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হল। প্রমীলা এসে দাঁড়ালেন রাবণ ও মন্দোদরীর সামনে। দুজনকে প্রণাম করে বললেন, আপনারা অনুমতি দিন, আমি পতির সঙ্গে সহমৃতা হব।

—সে কি! তুমি সহমৃতা হবে কেন মা? রাবণ চমকে উঠে বললেন, তুমি লংকার কুললক্ষ্মী।

—আমার স্বামী চলে গেছেন, আমাকেও এখন যেতে হবে পিতা।

—তুই চলে গেলে আমরা কাকে দেখে পুত্রশোক ভুলবো বাছা? মন্দোদরী কেঁদে প্রমীলাকে জড়িয়ে ধরলেন।

—পূত্রশোক প্রবল, কিন্তু পতিশোক যে তার চেয়েও প্রবল মা। প্রমীলা মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমার পতি ছিলেন আমার জীবন। কাজেই আমার এখন থাকা না থাকা একই ব্যাপার। আপনারা শান্তচিত্তে অনুমতি দিন।

রাবণ মন্দোদরী হতাশ নয়নে তাকিয়ে রইলেন সেই নববধূর সাজে সজ্জিত সুন্দরী পুত্রবধূর পানে।

প্রমীলা শান্তপদক্ষেপে স্বামীর চিতা প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর চিতায় উঠে শুয়ে পড়লেন স্বামীর পাশে।

নীরব নীহারিকা

নিকষা

দুর্ধর্ষ রাক্ষস হেতি বিবাহ করেছেন ব্রহ্মার কন্যা বিদ্যুৎকুমারীকে। তাদের পুত্রের নাম সুকেশ। সুকেশের আবার তিন পুত্র। মাল্যবান, মালী ও সুমালী। কঠোর তপস্যা করে তারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করলেন। ব্রহ্মা বললেন, তোমরা ত্রিভুবন জয়ী হও।

ব্রহ্মার বর পেয়ে তিনভাই স্বর্গ মর্ত্যে অত্যাচার শুরু করে দিলেন। বিশ্বকর্মাকে ধরে এনে বললেন, আমাদের জন্য এমন পুরী গড়ে দাও ত্রিভুবনে যার তুলনা থাকবে না।

বিশ্বকর্মা গড়ে দিলেন স্বর্ণলংকা। তিন ভাই সেখানে রাজত্ব করতে লাগলেন। শেষটায় তাদের হল দুর্মতি। বিষ্ণুর সঙ্গে তারা গেলেন যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাতালে আশ্রয় নিলেন। স্বর্ণলংকা শূন্য পড়ে রইল।

বিশ্বশ্রবা মুনিপুত্র কুবের ব্রহ্মার বরে ধনসম্পদের দেবতা হলেন। তিনি লংকায় রাজত্ব করতে লাগলেন। রাক্ষসরা এদিকে পাতালে বসে যুক্তি করতে লাগলেন, কি করে কুবেরকে লংকা থেকে তাড়ানো যায়।

মাল্যবানের কন্যা নিকষা পরমা সুন্দরী যুবতী। মাল্যবান তাকে বললেন, মা, তুমি বিশ্বশ্রবা মুনির কাছে গিয়ে তাকে পতিত্বে বরণ কর। একমাত্র তুমিই পারো আবার রাক্ষসদের মর্য্যাদা উদ্ধার করতে।

—কিভাবে পিতা ?

—বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র কুবের স্বর্ণ লংকায় রাজত্ব করছেন। বিশ্বশ্রবা মুনির ঔরসে তোমার পুত্র হলে সেও তখন দাবী করতে পারবে লংকার অংশ। তুমি মুনির নিকট অবিলম্বে যাও মা।

—বেশ, যাব।

* * *

বিশ্বশ্রবা মুনি একমনে দেবপূজা করে চলেছেন। সামনে জ্বলছে অগ্নিকুণ্ড। এমন সময় নিকষা এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। কমনীয় মুখে তার বিনম্র সৌন্দর্য।

বিশ্বশ্রবা মুখ তুলে বললেন, কে তুমি সুকন্যা?

—আমি রাক্ষসরাজ মাল্যবান কন্যা নিকষা।

—কি চাও তুমি?

—আপনাকে পতিরূপে পেতে চাই।

—কি উদ্দেশ্যে?

—সুযোগ্য পুত্রলাভের জন্য।

—তথাস্তু। বিশ্বশ্রবা অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিলেন। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে কিছুক্ষণ পরে তা আবার স্তিমিত হয়ে গেল।

বিশ্বশ্রবা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমার বরে তুমি দুই দুর্ধর্ষ পুত্রের জননী হবে যারা হবে ত্রিভুবনজয়ী দুর্ধর্ষ দুরাচারী রাক্ষস।

—এ আপনি কি বর দিলেন? নিকষা আর্তকণ্ঠে বললেন, আপনি মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্রেরা হবে দুরাচারী দুর্ধর্ষ রাক্ষস।

—সবই অদৃষ্টের নির্বন্ধ। বিশ্বশ্রবা বললেন, অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দানের সময় তুমি বর চেয়েছ, তাই তোমার পুত্রেরা হবে অগ্নিতুল্য দহনকারী। তাদের অত্যাচার দহনজ্বালায় ত্রিভুবন হবে অতিষ্ঠ।

—আপনি সুপুত্রের বর দিন প্রভু।

—ওই দ্যাখ অগ্নিকুণ্ড এখন নির্বাপিত। বিশ্বশ্রবা শান্তকণ্ঠে বললেন, তোমার তৃতীয় পুত্র হবে শান্ত সুশীল ধার্মিক।

* * *

নিকষা রয়ে গেলেন বিশ্বশ্রবা মুনির কাছে। কালক্রমে তার তিন পুত্রের জন্ম হল। জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মকালে গর্জন করে তার স্বভাব

জানিয়ে দিল বলে তার নাম রাখা হল রাবণ। দ্বিতীয় পুত্রের কর্ণদ্বয় কুম্ভের মতো বলে তার নাম রাখা হল কুম্ভকর্ণ। তৃতীয় পুত্রের নাম হল বিভীষণ।

রাবণ বড় হয়ে কঠোর সাধনায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে অসামান্য শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হলেন। কুবেরের কাছ থেকে কেড়ে নিলেন স্বর্ণলংকা।

নিকষার মনে সুখ নেই। পুত্রকে তিনি ধর্মপথে আনবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। রাবণের অত্যাচার দিন দিন সীমাহীন হয়ে পড়ছে।

সীতাকে হরণ করে আনবার পর নিকষা বুঝতে পারলেন পুত্র এবার সবংশে ধ্বংস হবে। স্বামীর কাছে তিনি শুনেছিলেন স্বয়ং বিষ্ণু নরলোকে জন্ম নিয়ে রাক্ষসবংশ ধ্বংস করবেন।

আসন্ন সর্বনাশের সম্ভাবনায় বিষণ্ণ দিনগুলি কাটতে লাগল লংকেশ্বর রাবণ মাতা নিকষার।

অনেক আশা নিয়ে তিনি স্বামীর কাছে পুত্রবর চেয়ে নিয়েছিলেন। পুত্রেরা বড় হলে ভেবেছিলেন, মা হিসাবে তিনি পাবেন অনেক সম্মান অনেক মর্য্যাদা। কিন্তু তার বদলে শুধু পেলেন অসম্মান আর অমর্য্যাদা।

অত্যাচারী ভোগাচারী দুধর্ষ পুত্রের মা হওয়া যে কতখানি জ্বালার, তা তিনি বুঝতে পারছেন। সকলে তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে ঃ এই সেই পাপিষ্ঠের মা। চোখের জলে বুক ভেসে যায় নিকষার।

একাকিনী আকাশের অন্ধকার নীহারিকার দিকে তাকিয়ে তিনি যেন খুঁজতে থাকেন নিজের ভাগ্যলিপি।

—০—

কুম্ভনসী

রাবণের সম্পর্কিত ভগিনী কুম্ভনসী। লংকার প্রাসাদে সকলের আদরিণী রাজকন্যা। কুম্ভনসী রাবণের ও স্নেহপাত্রী।

রাবণ স্বর্গলোক জয় করতে গেলেন। সেই অবকাশে মথুরার দৈত্যরাজ মধু লংকায় এসে কুম্ভনসীকে হরণ করে নিয়ে গেলেন।

স্বর্গ জয় করে লংকায় ফিরে এসে রাবণ সেই সংবাদ শুনে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই মুহূর্তে চললেন মথুরা পানে। বিশাল বাহিনী নিয়ে মথুরা অবরোধ করলেন।

মধুদৈত্য আস্ফালন করে স্ত্রী কুম্ভনসীকে বললেন, তুমি আমার শূল এনে দাও তো। আমি রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করব।

—তুমি কি উন্মাদ হয়েছ? স্বর্গমর্ত্যের দুর্ধর্ষ বীরবৃন্দ যার কাছে পরাজিত, তার সাথে তুমি করবে যুদ্ধ! এক নিমেষেই তুমি নিহত হবে। ভুলে যেওনা, তুমি সম্রাট রাবণের ভগিনীকে চুরি করে এনেছিলে।

—তাহলে উপায়?

—উপায় আমি দেখছি। কুম্ভনসী হেসে বলেন, আমি দাদাকে সব বুঝিয়ে বলবো। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বেশ। তাই কর।

কুম্ভনসী নির্ভয়ে স্বামীকে নিয়ে চলে গেলেন রাবণের শিবিরে। তার পায়ে প্রণাম করে বললেন, দাদা, আমার স্বামীকে তুমি ক্ষমা কর। তোমার কাছে আমার স্বামী ক্ষমা চাইতে এসেছে।

—ওর এত বড় সাহস, আমার ভগিনীকে ও হরণ করেছে।

—দাদা, ও আমাকে হরণ করেছিল সত্যি। কুম্ভনসী হেসে

বললেন, কিন্তু তারপর ওকেই আমি হরণ করেছি। এখন ও আমাকে ছাড়া কিছু জানে না। ওকে আমি ভালোবাসি। ওকে তুমি ক্ষমা কর দাদা।

—রাবণের ক্ষমা অত সহজে পাওয়া যায় না। রাবণ গর্জন করে বললেন, মধুদৈত্য আমার মর্য্যাদায় আঘাত করেছে, ওর নিস্তার নেই। ওর শাস্তি মৃত্যু।

—ওর মৃত্যু হলে আমি যে বিধবা হব দাদা।

—কোন ক্ষতি নেই। সর্বাঙ্গসুন্দর পাত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব আমি। কিংবা যদি চাও শূর্পণখার মতো স্বেচ্ছাবিহারিণী হবার স্বাধীনতা দেব তোমায়।

—ছিঃ। যিনি আমাকে বিবাহ করেছেন, জীবনে মরণে তিনিই আমার সব। তার মৃত্যু হলে আমিও সেই মুহূর্তে আত্মঘাতী হব। তোমার কোন শক্তিই আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না।

রাবণ বিস্মিত হয়ে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন কুম্ভনসীর পানে। তারপর বললেন, তুমি ভাল করে ভেবে দ্যাখো ভগিণী।

—আমি খুব ভালো করেই ভেবে দেখেছি। হয় তুমি ওকে ক্ষমা কর, তা না হলে তোমার সম্মুখে আমি মৃত্যু বরণ করব।

—বেশ। ক্ষমাই করলাম ওকে। রাবণ হেসে বললেন, ও যেমন তোমার অনুগত, তেমনি এখন থেকে আমার অনুগত হয়েও ওকে থাকতে হবে।

—০—

তাপিতা তারিণী ত্রিজটা

ত্রিজটা বৃদ্ধা রাক্ষসী।

অশোককাননে সীতার উপর চেড়ীদের অত্যাচার উৎপীড়ন দেখে তার প্রাণ কাঁদে। তিনি চেড়ীদের বলেন, আহা, ওর উপর অত উৎপীড়ন করিস না। এতে তোদের ভাল হবে না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। স্বয়ং রাবণ রাজার নির্দেশ আছে যেখানে সেখানে ত্রিজটার অনুরোধে কেউ কান দেয় না। শেষকালে ত্রিজটা এক কৌশল করলেন। খুব ভাল গল্প বলতে পারেন তিনি। ভাবলেন, গল্প বলে চেড়ীদের সীতার কাছে থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন।

সীতার কাছে বারবার প্রেমনিবেদন ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে একদিন রাবণ ধৈর্যের সীমা ছাড়ালেন। খড়্গ নিয়ে সীতাকে কাটতে গেলেন। মন্দোদরী তাকে নিবৃত্ত করলেন। রাবণ চেড়ীদের বলে গেলেন, ওর উপর যত পারো অত্যাচার করো।

চেড়ীরা শুরু করল নির্মম অত্যাচার। সীতার কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

ত্রিজটা তাড়াতাড়ি এসে বললেন, ওরে, তোরা করছিস কি? থাম্ থাম্। না হলে সর্বনাশ হবে।

—কিসের সর্বনাশ হবে? চেড়ীরা বলল।

—আয় বলছি। ত্রিজটা চেড়ীদের সরিয়ে নিয়ে এলেন সীতার কাছ থেকে। তারপর বললেন, আমি ভয়ংকর এক স্বপ্ন দেখেছি, লংকা একেবারে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। শুনবি তোরা সে স্বপ্নের কথা?

—শুনবো শুনবো।

—তাহলে চুপ করে বসে শোন।

ত্রিজটা বলে চলেন স্বপ্নের কথা। সীতাকে তিনি এই ভাবেই চেড়ীদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

—০—

অদ্বিতীয়া জননী জাহ্নবী

সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও সত্য পরাক্রম ইক্ষ্বাকুবংশজাত রাজা মহাভিষ সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করে স্বর্গে বসবাস করবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

তাঁর স্বর্গে বসবাসকালে একদিন দেবী জাহ্নবী ব্রহ্মার আলয়ে উপস্থিত হলে প্রবল বায়ু প্রবাহে হঠাৎ তাঁর বক্ষাঞ্চল স্খলিত হয়। মহারাজ মহাভিষ সেদিকে লোলুপ নেত্রে দৃষ্টিপাত করলে ব্রহ্মা ক্ষুব্ধ হয়ে মহাভিষকে বললেন—মহাভিষ! স্বর্গধাম তোমার মত রাজার উপযুক্ত নয়। তুমি আবার মর্তে ফিরে যাও। তবে, তুমি মর্তের যে রাজাকে তোমার পিতা রূপে কামনা করবে তাকেই পাবে।

তিনি তখন ঠিক করলেন যে, মর্তে মহারাজ প্রতীপের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবেন। ঠিক সেই সময় তিনি কয়েকজন বিকলেন্দ্রিয় দেব-শিশুকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কে?

—আমরা ভগবান প্রজাপতির পুত্র অষ্টবসু।

—প্রজাপতির পুত্র হয়ে তোমরা কি করে এমন দুরবস্থাগ্রস্ত হলে?

বসুগণ তাঁদের অভিশপ্ত হবার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন—দক্ষ প্রজাপতির সুরভি নামে এক কন্যা ছিল। সেই সর্বকামপ্রদা সুরভি জাতির হিতার্থে গাভীরূপ ধারণ করে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে মহাতপা বশিষ্ঠের হোমধেনু হন। সমস্ত মুনিগণ ঐ ধেনুর সেবা করতেন এবং ঐ ধেনু মুনিগণের দুধের যোগান দিত।

একদিন আমরা আটভাই আমাদের পত্নীদের নিয়ে মনোরম এক অভয়ারণ্যে বেড়াতে যাই, যা বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমের সন্নিকটে।

আমাদের ভাইদের মধ্যে একজনের পত্নী ঐ ধেনুটিকে তাঁর বান্ধবী রাজা উশীনরের কন্যার জন্য কামনা করলে আমরা কোনরূপ চিন্তা না করে ঐ হোমধেনুটি অপহরণ করি।

কিছু পরে তপোধন বশিষ্ঠ সেখানে এসে হোম ধেনুটিকে দেখতে না পেয়ে ধ্যানে বসলেন এবং তাঁর জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা সব জ্ঞাত হয়ে মন্ত্রপুতঃ জল হাতে নিয়ে আমাদের অভিশাপ দিলেন যে, আমরা মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়ে মর্তলোকে অবতীর্ণ হব।

—তোমাদের উদ্ধারের কি কোন উপায় নেই ?

—আছে। আমরা মানবশিশু রূপে জন্মগ্রহণ করব এবং আমাদের মধ্যে যে গরুটির গলায় দড়ি পরিয়েছিল, সে ছাড়া আর সকলের অচিরে স্বর্গলাভ হবে। আমরা অপেক্ষা করছি কার গর্ভে আমাদের জন্ম হবে ? কে আমাদের গর্ভে ধারণ করবে।

—দেখ, তোমরা জাহ্নবীর আরাধনা কর। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেব মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

এরপর অষ্টবসুগণ কাতর স্বরে জাহ্নবীর আরাধনায় লিপ্ত হলেন।

বসুগণের কাতর আহ্বানে জাহ্নবী তাঁদের কাছে এসে তাঁকে স্মরণ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

বসুগণ তাদের অভিশপ্ত জীবনের কাহিনী বর্ণনা করে বললেন—দেবি ! শুনেছি আপনিও অভিশপ্তা। অতএব আপনি যদি নব কলেবর ধারণ পূর্বক ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের জন্মান্তর ঘটাতে তৎপর হন, তাহলে দেবশিশু হয়ে আমাদের মানবীর গর্ভে জন্ম নেওয়ার ক্লেশ ভোগ করতে হয় না।

—বেশ, আমি না হয় তোমাদের গর্ভে ধারণ করলাম। কিন্তু মর্তধামে তোমরা কোন্ পুরুষকে তোমাদের জনক হবার যোগ্য বলে মনে কর ?

—দেখুন, রাজা মহাভিষ প্রতীপ রাজার ঘরে শান্তনু নামে জন্মগ্রহণ করবেন। আমরা সেই শান্তনুকে পিতারূপে পেতে চাই।

—বেশ, তোমাদের জন্য আমি সেই রাজার সহধর্মিনী হয়ে তোমাদের গর্ভে ধারণ করব।

—মা জাহ্নবী! যখন সন্তানদের মুক্ত করতে ত্যাগ স্বীকার করলেন, তখন আর একটি অনুরোধ রাখতে হবে।

—বল, কি তোমাদের অভিরুচি?

—আপনার পুত্রদের জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে সলিলে নিক্ষেপ করবেন। তাহলে মনুষ্যলোকে জীবিকা নির্বাহের যাতনা থেকে আমরা মুক্ত হব।

—কিন্তু যে পিতা সন্তানের জন্য আমাকে সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করবেন, তাঁর বংশ রক্ষার জন্য অন্ততঃ একটি পুত্রেরও তো বেঁচে থাকা উচিত।

—মা! আমরা আমাদের বীর্যের চতুর্থভাগের অর্ধাংশ প্রদান করব। তার দ্বারা যে পুত্র জন্মাবে সেই পুত্র তার হবে। তবে আপনার সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র অপুত্রক থাকবেন।

* * * *

বৃদ্ধ বয়সে রাজা প্রতীপের এক পুত্র জন্মাল। শান্তিপ্রিয় রাজার সন্তান বলে তার নাম হল শান্তনু।

শান্তনুকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করে রাজা প্রতীপ বাণপ্রস্থ নিলেন।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শান্তনু প্রতি বছর বিভিন্ন ঋতুতে বন থেকে বনান্তরে মৃগয়া করে বেড়াতেন। এইভাবে একদিন মৃগয়ায় গিয়ে লক্ষ্মীর ন্যায় উজ্জ্বল তনু পরমা সুন্দরী এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। শান্তনু বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—সুন্দরি! ত্রিভুবনের দেব—দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ—কিন্নর, মানবদের মধ্যে কাকে তুমি পতিত্বে বরণ করেছ? যদি তোমার অদ্যাবধি বিবাহ না হয়ে থাকে বা তুমি কারও বাগদত্তা না হও, তবে আমি তোমার পাণিগ্রহণ পূর্বক সৌভাগ্যবান পুরুষের দলভুক্ত হতে পারি।

—মহারাজ! আমি ত্রিলোকের কারও পত্নী নই। নহি বাগদত্তা। তাই আপনাকে পতিত্বে বরণ করতে আমার পক্ষ থেকে কোনরূপ বাধা নেই। কিন্তু আমার একটি শর্ত আছে।

—আমি তোমার যে কোন শর্ত মানতে রাজী আছি। বল. কোন্ শর্তে আমি তোমাকে পত্নীরূপে পেতে পারি?

—আমি আপনার মহিষী হয়ে সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম পালন করব, করব আপনার চিত্তানুবর্তন। কিন্তু আমি যা করব, তা ভালই হোক আর মন্দই হোক, সে বিষয়ে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না বা আমায় সেই কর্ম থেকে নিরস্ত হতে বলতে পারবেন না—এমন কি সেই কর্ম যদি অপ্রিয়ও হয়, আমায় তার জন্য অপ্রিয় বাক্য প্রদান করবেন না।। যদি আপনি আমার কৃত কর্মের ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমায় বিরক্ত করেন, তবে সেইদিনই আমি আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব।

মহারাজ শান্তনু সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য সম্পন্না স্ত্রীরত্ন পাবার বাসনা থেকে বিচ্যুত হতে না পেরে তাঁর শর্তে রাজী হয়ে তাঁর পাণিগ্রহণ করে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

জাহ্নবীকে পেয়ে মহারাজ শান্তনু তাঁর রাজকার্য, জপ-তপ, দান-ধ্যান, মৃগয়া, তীর্থভ্রমণ বিস্মৃত হলেন। কেটে গেল দিন রাত মাস বৎসর।

আর এরই মাঝে শান্তনুর ঔরসে জাহ্নবীর গর্ভে শান্তনুর পর পর সাতটি সন্তানের জন্ম হয়েছিল এবং জাহ্নবী তারা ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে সদ্যোজাত শিশুদের স্রোতস্বতীতে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শান্তনু পত্নীর কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন যে, তিনি তার কোন কাজে বাধা দেবেন না। তিনি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য স্ত্রীকে কোন কিছু বলতেন না। কিন্তু নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতেন।

প্রতিবারই জাহ্নবী রাজার মলিন মুখ দেখে বুঝতে পারতেন যে, রাজা তার আচরণে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তখন তিনি সান্ত্বনার ছলে বলতেন—মহারাজ! জানি আপনি আমার আচরণে ক্ষুব্ধ। কোন

স্বামীই তাঁর স্ত্রীর কাছে এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু আপনি নিরাশ হবেন না। আপনি যেমন আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন না, আমিও তেমনি কথা দিচ্ছি আপনাকে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রদান করব।

প্রতিবারই জাহ্নবী কর্তৃক এরূপ আশ্বস্ত হয়ে রাজা পুত্রশোক ভুলে যেতেন এবং নবজাতকের কামনায় কাতর হয়ে জাহ্নবীর সঙ্গে সহবাস করতেন।

সপ্তম পুত্রের সলিল সমাধি হবার পর অষ্টম পুত্রকেও যখন জাহ্নবী স্রোতস্বতীতে বিসর্জন দিতে এগিয়ে গেলেন—তখন পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর রাজা ধৈর্য হারিয়ে জাহ্নবীকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে?

শুচিস্মিতা জাহ্নবী সহাস্যে বললেন—কেন? আমি তোমার মহিষী। দেখ, তোমার এরূপ প্রশ্ন আমায় বিব্রত করছে। তুমি কিন্তু সত্য ভঙ্গ করছো।

—দেখ, আমার মনে কোন অন্যায়ের প্রশ্রয় নেই। কিন্তু কোন জননীকে আমি এভাবে সদ্যপ্রসূত সন্তান বিসর্জন দিতে দেখিনি বা শুনিনি। সন্তানকে বাঁচাতে মা অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, প্রাণ পর্যন্ত দেয়, কিন্তু পুত্রঘাতিনী হয়, একথা কখনও শুনিনি। তুমি কেন আমার আত্মজদের এভাবে বিনষ্ট করছো? দেখ পুত্র-হিংসা অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কিছুতেই নেই। শাস্ত্রে কথিত আছে পুত্রহত্যা মহাপাপ। আমি চাই না আমার মহিষী হয়ে অনুরূপ মহাপাপে লিপ্ত হও। রাজ্ঞী! এই গর্হিত নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বিরত হও।

—বেশ। আমি তোমার এই সন্তানকে নষ্ট করব না। কিন্তু তোমার সঙ্গেও আর সহবাস করতে পারব না, কারণ তুমি জ্ঞাত আছ আমি পূর্বেই তোমায় বলেছিলাম, আমার কোন কর্মে বাধা দিলে আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করব।

—আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ আছে। আর আজ আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে, তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। তবুও পুত্র কামনায় অধীর হয়ে আমি তোমায় বাধা দিলাম। কিন্তু আমি

এখনও জ্ঞাত হলাম না যে, তুমি কে ? কি তোমার সত্য পরিচয় ? কোন মানবীর পক্ষে তার সদ্যপ্রসূত সন্তানকে এভাবে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়। তারা যেখানে সন্তান বিয়োগ ব্যথায় কাতর হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, সেখানে তুমি তোমার আত্মজ সন্তানকে বিসর্জন দিয়ে হাসিমুখে আমার সঙ্গে বিহার করছ। হয় তুমি দেবী—নয় দানবী। মানবী কখনও নও।

—তোমার অনুমান ভ্রান্ত নয় রাজা। আমি জহ্নুমুনির কন্যা জাহ্নবী। মহর্ষি জহ্নুর কন্যাকে ঋষিরাও সেবা করে থাকেন। শুধুমাত্র দেবকার্য সাধনার্থে আমি তোমার সহধর্মিনী হয়েছিলাম। আর আমি যে সন্তানদের বিসর্জন দিয়েছি তারা কেউই মানবশিশু নয়। তারা প্রজাপতির পুত্র মহাতেজাঃ অষ্টবসু। মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে তারা মনুষ্যযোনিতে জন্মেছিল। সেই মহাতেজাঃ বসুগণের পিতা হবার যোগ্যতা এই মর্তলোকে আর কারও নেই। আর তাদের জননী হবার যোগত্যাও আমি ভিন্ন আর কার আছে ? আমি অভিশপ্ত অষ্টবসুদের জন্যই ধরাধামে মানবী হয়ে জন্মেছিলাম। আর তুমিও তাদের পিতা হতে পেরে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হলে। মহারাজ আমি এদের কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমার গর্ভে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের মনুষ্যলোক থেকে মুক্ত করব। তোমাকেও বলেছিলাম এক পরম মহাবল পুত্র প্রদান করব। সেই পুত্রকে আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ওর শিক্ষা সমাপনান্তে তোমার কাছে প্রেরণ করব।

এই কথা বলে দেবী জাহ্নবী তার অষ্টম সন্তানকে নিয়ে অন্তর্হিত হলেন। ইনিই হলেন সেই দেবব্রত যিনি আজীবন দার পরিগ্রহ করবেন না প্রতিজ্ঞা করো পিতা শান্তনু কর্তৃক ভীষ্ম আখ্যা পেয়েছিলেন।

মহাভারতের মা
সত্যবতী

সত্যবতীর জন্মও যেমন অদ্ভুত উপায়ে—জীবন ধারাও অভিনব।

পুরুবংশে বসু নামে এক ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তার উপাসনায় তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র তাকে একটি স্ফটিক নির্মিত আকাশগামী বিমান আর বৈজয়ন্তী নামে অম্লান পঙ্কজ মালা ও একখানি বেণু যষ্ঠী প্রদান করেন।

আকাশগামী বিমান দ্বারা বসুরাজ দেবতাদের মত উর্ধ্বমার্গে বিচরণ করতে পারতেন। বৈজয়ন্তী মালা গলায় দিয়ে যুদ্ধে গেলে তিনি বিজয়ী হতেন এবং বেণু যষ্ঠীর দ্বারা তার চেদীরাজ্য সুজলা সুফলা হত। উর্ধ্বমার্গে বিচরণ করতেন বলে তার আর এক নাম ছিল উপরিচর।

একদিন উপরিচর যখন মৃগয়ায় বের হচ্ছেন তখন তার পত্নী গিরিবালা গিরিকা ঋতুস্নাতা ও শুচি হয়ে পুত্র কামনায় রাজাকে আহ্বান করলে রাজা উপরিচর তা প্রত্যাখ্যান করে বনে মৃগয়ায় গেলেন। রমণীয় বসন্তকালে এক মনোরম উদ্যানে বসে মনোরম ফুলের শোভা দেখতে দেখতে বার বার পত্নী গিরিকার কথা মনে হতে থাকে। মদন বাণে জর্জরিত হয়ে তার চন্দ্রপাত হয়। তিনি তার সেই রেতঃ মন্ত্রপূতঃ করে এক শ্যেন পক্ষীকে দিয়ে বললেন—যাও, রাণী গিরিকাকে এটি প্রদান করে এস।

রেতঃ নিয়ে ঐ শ্যেন পক্ষী যখন যাচ্ছিলো তখন আর একটি শ্যেন পক্ষী খাদ্যবস্তু ভেবে তাকে আক্রমণ করে এবং ঐ রেতঃ নদীতে পতিত হয় এবং তা এক মৎসী ভক্ষণ করে। অচিরে সেই মৎসী জেলের

জালে ধরা পড়ে এবং তার গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা বের হয়। যমুনার জলে ঐ মৎসী পুত্র কন্যার জন্ম দিয়ে এক রমণীয় রমণী রূপ ধারণ করে এবং নিজেকে অদ্রিকা অপ্সরা রূপে পরিচয় দেয়। সে ব্রহ্মশাপে মৎসী হয়ে যমুনার জলে বিচরণ করছিল।

মৎস্যজীবিরা তখন ঐ পুত্র-কন্যা নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত হয়। রাজা পুত্রটিকে গ্রহণ করে আর কন্যাটিকে মৎস্যজীবিদের করে প্রদান করেন।

ঐ মৎসীপুত্র পরম ধার্মিক মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আর কন্যাটির নাম হ'ল মৎস্যগন্ধা।

মৎস্যগন্ধা যমুনা তীরে খেয়া পারাপার করার কাছে লিপ্তা ছিলেন।

বহু তীর্থ পর্যটন করে পরাশর মুনি সেই খেয়াঘাটে এলেন এবং অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মৎস্যগন্ধাকে দেখে মুগ্ধ হলেন।

তিনি বললেন—মৎস্যগন্ধা তুমি আমাকে ঐ দ্বীপে নিয়ে চল।

—কিন্তু প্রভু, ওপারে যে আমার জন্য বহুলোক অপেক্ষা করে আছে।

—থাকুক। আগে তুমি আমাকে পার কর।

মৎস্য গন্ধার সেই কার্যে অনীহা দেখে তিনি তমোময় কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করলেন এবং দৃষ্টি ভ্রমে মৎস্যগন্ধার তরী নির্জন যমুনা দ্বীপে ভিড়ল।

বাধ্য হয়ে মৎস্যগন্ধা সেই নির্জন দ্বীপে অবতরণ করলে পরাশর মুনি বললেন—সুন্দরি! আমি তোমাতে আসক্ত হয়েছি। তুমি আমার মনোরথ পুরণে ব্রতী হও।

লজ্জিতা ও বিস্ময়াবিষ্টা মৎস্যগন্ধা বলল—মুনিবর! আমি পিতার অধীন। অদ্যাবধি আমার বিয়ে হয়নি। আপনার সহযোগে আমার কুমারীভাব দূষিত হবে। আর কন্যাভাব দূষিত হলে সমাজে মুখ দেখাব কি করে?

—দেখ, আমি সর্ব শাস্ত্রজ্ঞ তাপস। আমার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত

হয়ে আমার মনস্কামনা পূরণ করলে তোমার কন্যাভাব দূষিত হবে না। আমি তোমাকে তোমার কুমরীত্ব ফিরিয়ে দেব। তুমি আমার কাছে তোমার আভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

মৎস্যগন্ধার গায়ে মাছের গন্ধ থাকায় মনে দুঃখ ছিল। তাই তিনি বললেন—যদি আমার গায়ের মাছের গন্ধ দূর হয়, আমি আবার কুমারী অবস্থা প্রাপ্ত হই এবং সমাজচ্যুতা না হই, তবে আপনার মনোরথ পূরণে আমার কোনরূপ আপত্তি নেই।

মুনি তথাস্তু বলায় এবং মৎস্যগন্ধার গাত্র থেকে মৎস্যের গন্ধ বিদূরিত হয়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ায় তিনি পরাশর মুনির কামানলে আত্মাহুতি দিলেন।

অতঃপর ঐ যমুনা দ্বীপে পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম হল। দ্বীপের মধ্যে জন্মেছিলেন বলে তাঁর নাম দ্বৈপায়ন। বর্ণ কালো ছিল বলে কৃষ্ণ এবং বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন বলে বেদব্যাস নাম হয়েছিল।

পাঁচ বছর সেই নির্জন দ্বীপে অতিবাহিত করে সন্তানের সুশিক্ষার জন্য তাঁকে পিতার করে অর্পণ করে তিনি আবার পিতার কাছে ফিরে আসেন। তখন তাঁর নাম হয় সত্যবতী।

* * *

মহারাজ শান্তনু একদিন যখন যমুনা তীরে মৃগয়ার্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এক সুমিষ্ট গন্ধ তাঁকে আকৃষ্ট করল। সেই সুমিষ্ট গন্ধকে অনুসরণ করে তিনি কিছুদূর এগিয়ে যেতে অমিত লোচনা দেবীরূপধারিণী এক কন্যাকে দেখতে পেলেন, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, ঐ সুমিষ্ট ঘ্রাণ ঐ কমনীয়া কামিনীর গাত্র থেকে আসছে। তিনি ঐ অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—তুমি কার পত্নী? এই নির্জন নদীকূলে এলে কি করে?

—আমি ধীবর কন্যা। অদ্যাবধি কারও পত্নী হবার সৌভাগ্য লাভ করিনি। পিতার আদেশে আমি এখানে খেয়া পারাপারের কাজে লিপ্ত আছি।

—তুমি আমাকে তোমার পিতার কাছে নিয়ে যেতে পার ?

—কেন পারব না—চলুন।

মহারাজ শান্তনুকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে আপ্যায়ন করে দাসরাজ বললেন—বলুন মহারাজ ! আমি আপনার কি সেবা করতে পারি ?

—দাসরাজ ! আমি তোমার কন্যার পাণি প্রার্থী। এ বিষয়ে তোমার মতামত জানতে চাই।

—মহারাজ ! আপনার মত ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যবাদী, রাজাকে কন্যা দিতে পারার মত সৌভাগ্যবান পিতা আর কে হতে পারে ? অতএব আমার এ বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠান হবার পূর্বে আমার একটি শর্ত আপনাকে মানতে হবে।

—বল, কি তোমার শর্ত ?

—মহারাজ ! আপনাকে অঙ্গীকার করতে হবে যে, আমার এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হবে, আপনার অবর্তমানে সেই পুত্রই রাজ সিংহাসনে বসবে।

রাজা শান্তনু সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন সত্য কিন্তু আত্ম-বিস্মৃত হয়ে ধর্মচ্যুত হননি। পুত্র দেবব্রতর কথা চিন্তা করে তিনি ফিরে এলেন রাজধানীতে।

কিন্তু একদিকে সত্যবতীর রূপ, অন্যদিকে পিতৃহৃদয় ব্যাকুলিত হল। দুইয়ের আবর্তে পড়ে তিনি দিন দিন হীনবল হয়ে পড়লেন।

পুত্র দেবব্রত পিতার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে সব জ্ঞাত হয়ে সেই ধীবর রাজের কাছে গিয়ে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে, তিনি পিতার অবর্তমানে রাজ্যভার গ্রহণ করবেন না। এমন কি বিবাহ পর্যন্ত করবেন না।

রাজা শান্তনু এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করবার জন্য দেবব্রতের নাম রাখলেন ভীষ্ম।

অতঃপর শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহে আর কোন বাধা

রইল না। শান্তনুর ঔরসে তার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই পুত্র জন্মাল।

বিচিত্রবীর্যের জন্মের কয়েক বছর পর শান্তনু পরলোকে যাত্রা করলেন এবং চিত্রাঙ্গদ সিংহাসনে বসলেন।

কৌরবরাজ চিত্রাঙ্গদ গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদের হস্তে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে মারা যান।

তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসিয়ে ভীষ্ম তাঁর হয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন এবং বয়ঃ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন কাশীরাজ দুহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে।

বিচিত্রবীর্যও ক্ষয় রোগাক্রান্ত হয়ে অচিরে দেহত্যাগ করেন।

ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে বড় কাতর হয়ে পড়লেন। মাতা সত্যবতীরও অনুরূপ অবস্থা। কিন্তু পতির বংশ রক্ষার চিন্তায় পুত্র শোকাতুরা জননী সত্যবতীর অশ্রু শুকিয়ে গেল। তাই পুত্রের প্রেতকার্যাদি সমাপনান্তে একদিন তিনি ভীষ্মকে ডেকে বললেন—ভীষ্ম। মহাযশাঃ ধর্মপরায়ণ শান্তনুকে জল পিণ্ড প্রদান করার, তুমি ছাড়া আর কেউই তো রইল না। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি বংশ রক্ষার্থে তোমার ভ্রাতৃজায়াদের গর্ভে অপত্যোৎপাদন কর।

—মা, আপনি যা বলছেন তা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার কথা কি বিস্মৃত হয়েছেন?

—না বৎস, আমি বিস্মৃত হইনি। কিন্তু আপৎকাল উপস্থিত হয়েছে বলে বাধ্য হয়ে, তোমায় অনুরূপ অনুষ্ঠানে রত হতে বলছি।

—মা, আমি ত্রিলোক পরিত্যাগ করতে পারি, পারি ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের চেয়েও দুর্লভ বস্তু ত্যাগ করতে, কিন্তু সত্য ত্যাগ করতে পারি না। জেনে রাখুন, পৃথিবী যদি গন্ধ পরিত্যাগ করে, বায়ু স্পর্শ, জল মধুরস, সূর্য-প্রভা, অগ্নি-উষ্ণতা, আকাশ-শব্দ, শীতরশ্মি-শীতাংশু,

ইন্দ্র-পরিক্রমা, ধর্মরাজ-ধর্ম, তথাপি ভীষ্ম সত্য পরিত্যাগ করবে না। কারণ ক্ষত্রিয়ের সত্য ভঙ্গ অতীব নিন্দনীয়। দেখুন, সনাতন ধর্মের কথা মনে রেখে ক্ষত্রিয় পত্নীরা ব্রাহ্মণদের নিকট যেতেন এবং তাঁদের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করতেন এবং সেই পুত্র পাণিগ্রহীতারই হোত। পুরাকালে এইভাবেই দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে অপুত্রক বলিরাজের পত্নী সুদেষ্ণার পাঁচটি পুত্র হয়েছিল। এদেব নাম ছিল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সূক্ষ্ম।

[এদেব নাম অনুসারে চারটি রাজ্য হয়। যাদের বর্তমান নাম বঙ্গ—(বঙ্গদেশ—পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) অঙ্গ অর্থাৎ বিহার, কলিঙ্গ—উড়িষ্যা, পুণ্ড্র (পাঞ্জাব) সূক্ষ্ম (সুরাট)]

তখন বংশ রক্ষার্থে ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি তার কুমারী কালের সন্তান ব্যাসদেবকে আহ্বান করেন এবং তিনি ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম দেন।

এই ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সত্যবতী এক নতুন পথেব দিশা দেখিয়েছিলেন। তিনি যদি নিয়ম না ভাঙ্গতেন তবে কুরুবংশের ইতিহাসেব পরে ওখানেই যবনিকা পড়ত।

বিদ্রোহিনী অম্বা

কাশীরাজের তিন কন্যা ছিল। তারা হলেন অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা।

জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বার মন দেওয়া নেওয়ার পালা সাঙ্গ হয়েছিল সৌভাধিপতি শাল্বের সঙ্গে।

কাশীরাজ তার তিন কন্যার স্বয়ংবর করলে মহারথী ভীষ্ম মাতা সত্যবতীর অনুমতি নিয়ে সেই রাজসভায় উপস্থিত হয়ে কাশীরাজকে বললেন—কাশীরাজ, আমি আমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য আপনার কন্যাদের চাইছি। বৃথা কেন আপনি স্বয়ংবরের আয়োজন করছেন ?

কাশীরাজ ভীষ্মের কথার মর্যাদা না দিয়ে সভার কাজ শুরু করতে বলায় ভীষ্ম সমস্ত নৃপতি এবং কন্যাদের পিতাকেও অগ্রাহ্য করে প্রথমে অম্বা পরে তার দু' বোন অম্বিকা ও অম্বালিকাকে নিজ রথে তুলে নৃপতিদের উদ্দেশ্যে বললেন—কেউ কন্যাকে বস্ত্রালংকারে আচ্ছাদিত করে ধন দান পূর্বক সম্প্রদান করেন, কেউ বা প্রতিশ্রুতি মত ধন দান করে। কারও কন্যা বলপূর্বক গ্রহণ করে। কেউবা রমণীর মনোরঞ্জন করে তার প্রণয়ী হয়ে কন্যাকে গ্রহণ করেন, কেউ কেউ প্রমত্তা নারীর পাণিগ্রহণ করেন, কেউ আর্য বিধিমতে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কেউ কন্যার পিতাকে প্রচুর ধন দিয়ে তুষ্ট করে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহ প্রথা প্রচলিত হবার পর থেকে এই আট প্রকার বিবাহের প্রথা সমাজ-স্বীকৃত। স্বয়ংবরও বিবাহের মধ্যে উত্তম পন্থা। আর রাজারা স্বয়ংবর বিবাহকেই অধিক মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আর পরাক্রম প্রদর্শনপূর্বক অপ্রস্তুত কন্যার

পনিগ্রহণকেও ধর্মবাদীরা ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অতএব আমি আমার শক্তির পরে পরম আস্থাবান হয়ে যে বিবাহকে ধর্মবাদীরা ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন সেই বিবাহের উদ্দেশ্যে এই কন্যাদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা যুদ্ধ অথবা যে কোন উপায়ে উদ্ধারে যত্নবান হও। আমি যুদ্ধে প্রস্তুত আছি।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং কাশীরাজ শাল্বরাজসহ দশ হাজার নৃপতি একযোগে ভীষ্মকে আক্রমণ করলেন।

ভীষ্মের বাণাঘাতে সেইসব নৃপতিদের অর্ধেকেরও বেশী সৈন্য সহ মারা গেলেন। বাকী প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

অমিতবিক্রম গঙ্গাসুত অরাতিকুলকে সমূলে উৎপাটিত করে বহু নদী উপবন অতিক্রম করে আপন রাজ্যে গিয়ে সত্যবতীর করে কন্যাদের অর্পণ করে ভাইয়ের বিবাহের তোড়জোড় শুরু করলেন।

যখন এই বিবাহের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তখন অম্বা সত্যবতীকে বললেন—মা, আমি ইতিপূর্বে মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করেছি। তিনিও আমার হস্তধারণপূর্বক আমায় স্বীকার করেছেন। আমার পিতারও এই বিবাহে সম্মতি ছিল। এখন আপনি ধর্মতঃ আমায় যা করতে বলবেন আমি তা করতে প্রস্তুত।

ভীষ্ম অম্বার এই কথা শুনে বিচলিত হয়ে বেদপরাগ ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে অম্বার বিষয়ে কি করণীয় তা জিজ্ঞেস করলে, তারা বললেন—অম্বা যখন শাল্ব রাজকে পতিত্বে বরণ করেছেন এবং তার করস্পর্শ করেছেন এবং তিনি তাঁকে স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তখন তার করেই অম্বাকে সমর্পণ করা উচিত।

অতঃপর ভীষ্ম ও সত্যবতী বিচিত্রবীর্যের, সঙ্গে অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহকার্য সম্পাদন করে অম্বার ইচ্ছানুযায়ী এক বৃদ্ধ সচিবের সঙ্গে তাকে সৌভাধিপতি শাল্বের কাছে প্রেরণ করলেন।

অম্বা গর্বভরে ভীষ্ম ও সত্যবতীকে বলেছিলেন যে, মহারাজ শাল্ব

তাঁকে সাদরে বরণ করে নেবেন। কারণ অম্বা তার বাগদত্তা। কিন্তু কার্যকালে অম্বার বিশ্বাসের মর্যাদা মিলল না। হিসাবে গড়মিল হয়ে গেল শাল্বের প্রশ্নে—কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন? আর অম্বাকেই বা পেলেন কোথা থেকে?

—মহারাজ! আমি হস্তিনার মহামন্ত্রী। ভীষ্মদেব আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।

—কেন?

—রাজকুমারী অম্বা যে আপনার বাগদত্তা তা তাঁর অজ্ঞাত ছিল! মা অম্বা যখন বললেন যে, তাঁর বিয়ে আপনার সঙ্গে শাস্ত্রসম্মত ভাবে স্থির হয়ে আছে তখন তিনি অন্য কাউকে বরমাল্য দিতে পারেন না। তাই আপনার কাছে আপনার গচ্ছিত রত্ন ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

—আপনি দেখছি বয়সেই প্রবীণ, বুদ্ধিতে এখনও অপরিণতের ছাপ রয়েছে। তা নয়তো কি করে আপনি ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনেন। ও যে রক্তে মাংসে গড়া মানবী। সত্যিই তো আর রত্ন নয়, যে ভুল করে আপনাদের ধন ভাণ্ডারে গেছে বা তস্করে চুরি করে নিয়েছিল, আপনারা তা পেয়ে ফিরিয়ে দিতে এসেছেন।

অম্বার বিস্ময়ের দরজায় করাঘাত হল। তিনি তবুও সংযত স্বরে শাল্বকে জিজ্ঞেস করলেন—মহারাজ! তুমি কি তোমার অম্বাকে আর কামনা কর না? পূর্বের মত ভালো বাস না? আমি কি তোমার বাগদত্তা নই? আমি বিশ্বাস করি ও মানি যে, তুমি আমার স্বামী। তাই তো ভীষ্মদেব ও মা সত্যবতীকে সব বলে, বড় গর্ব করে তোমার পরে আস্থা রেখে এখানে এসেছি।

—তুমি ভুল করেছ অম্বা। তুমি ভীষ্ম কর্তৃক অপহৃতা হয়েছ। একবার স্বয়ংবর সভা থেকে যে পুরুষ যে নারীর হস্ত ধারণ করে, শাস্ত্রীয় মতে সেই তার স্ত্রী। অপহৃতা নারীকে কখনও কোন ক্ষত্রিয়-সন্তান স্ত্রী বলে মেনে নিতে পারে না। তাছাড়া তুমি যে তোমার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা তার প্রমাণ কি!

—দেখ, ভীষ্মদেব দেবতুল্য নিষ্পাপ। তিনি আমার কোন অমর্যাদা করেননি। আমি তোমার বাগদত্তা একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমায় তাঁর সচিবের সংগে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—কি বিশ্বাস কর না ?

—তোমার কথা। যে ভীষ্ম অতগুলো ক্ষত্রিয় সমাজকে অগ্রাহ্য করে, তাদের পরাজিত করে বাহুবল দেখিয়ে তোমায় অপহরণ করতে পারে, সে তার বাসনা চরিতার্থ না করে, তোমায় এখানে পাঠাবে এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—চুপ কর, মনুষ্যত্বহীন ক্ষুধিত পশু—গর্জে ওঠেন অম্বা।—ভীষ্মদেব ব্রহ্মচারী। একথা বিশ্ব জানে যে, তিনি পিতার স্বার্থে নিজের যৌবনকে বিসর্জন দিয়েছেন। তোমার মত পুরুষত্বহীন পুরুষেরাই এরূপ কথা বলতে পারে। আমারই ভুল হয়েছে মনুষ্যত্ব-হীন একটা পশুকে মানুষ ভেবে। আমি চললাম। কিন্তু তোমারও মঙ্গল হবে না জেনো।

শাল্বরাজের কাছে অপমানিতা, লাঞ্ছিতা হয়ে নারীত্বের মর্যাদা রাখতে তিনি আবার ফিরে এলেন হস্তিনায়।

—একি মা অম্বা, তুমি ফিরে এলে যে বড় ?—ব্যাকুল কণ্ঠে সত্যবতী জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যা মা, আমার বিশ্বাস, আমার ঘৃণা, লজ্জা—মান-অপমানের মৃত্যু ঘটিয়ে আমি আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি। ভীষ্মদেব আমার হাত ধরেছেন বলে আমি শাল্বরাজ্যের কাছে অপাংতেয়—অশুচি।

একথা শুনে বিস্ময়ান্বিত হয়ে ভীষ্ম অম্বাকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি যে তবে বলেছিলে সে তোমার আবাল্য সখা—স্বামী—সব। কোন অবস্থাতেই সে তোমায় ত্যাগ করবে না। কেন তবে তার এ দুর্মতি ?

—আপনার জন্য, শুধু আপনার জন্য আজ আমি লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, বিতাড়িতা।

—আমিতো কোন অন্যায় করিনি।

—হয়তো আপনার কাছে আপনি অপরাধী নন। কিন্তু শাল্ব-রাজের কথায়—আপনি আমার যে হাত ধরেছেন, সে হাত তিনি আর স্পর্শ করবেন না। তা ধরলে অধর্ম হবে। ক্ষত্রিয়কুলের কলংক বলে তিনি সমাজচ্যুত হবেন।

—না-না এ হতে পারে না। নারীত্বের এ অবমাননা, এ লাঞ্ছনা আমি সইব না। চীৎকার করে উঠলেন নারীর গভীর গোপনে যিনি প্রবেশ করতে পারেন, সেই রাজমাতা সত্যবতী। বিচিত্রবীর্যকে তিনি আদেশ দিলেন—বিচিত্রবীর্য, তুমি এখুনি শাল্বরাজকে বন্দী করে আন। দেখি সে কেমন করে আমার মেয়েকে প্রতিশ্রুতি মত বিয়ে না করে পারে।

তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় অম্বার কণ্ঠে—না মা, এ আদেশ আপনি প্রত্যাহার করুন। একদিন যার জন্য আমি আমার এ জীবনটাও অনায়াসে হাসতে হাসতে বিসর্জন দিতে পারতাম, আজ তার কাছে আত্ম-সমর্পণ আমার মৃত্যুতুল্য। আমার চোখে সে পশ্বাধম। আজ তার চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তির কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।

—মা অম্বা, বল তুমি এখন কি করতে চাও?

—মা, আমি নারীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। চাই স্বামী-পুত্র-সংসার।

—বল, আমি এখন তোমার জন্য কি করব?

—মা, আমাকে স্বর্গের সিঁড়ি থেকে নরকে নিক্ষেপ করেছেন আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্মদেব। অতএব ক্ষত্রিয় হয়ে তিনি যার হাত ধরেছেন, সেই ভীষ্মদেবকেই আমি স্বামীরূপে পেতে চাই। তিনিই ক্ষাত্রধর্ম ও নারীর মর্যাদা রক্ষা করুন। মা, আপনার আদেশে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম নিশ্চয়ই একাজে সম্মতি দেবেন।

এদের সন্নিকটে ভীষ্ম অপেক্ষা করছিলেন। অম্বার কথা শুনে তিনি সত্যবতীকে বললেন—মা, এ অন্যায় আদেশ করে আমাকে সত্যভ্রষ্ট করবেন না। আমি যে হাতে অম্বার কর স্পর্শ করেছিলাম সে হাত কেটে ফেলতে পারি, পারি প্রাণ বিসর্জন দিতে, জোর করে শাল্বরাজকে বেঁধে এনে ওর পায়ের তলে ফেলে দিতে পারি—কিন্তু সত্যভ্রষ্ট হতে পারি না।

—ভীষ্মদেব, আমি জানি আপনি সত্য ব্রতে দীক্ষিত ব্রহ্মচারী। পাপ আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু বিপন্না, অবহেলিতা, লাঞ্ছিতা, আশ্রয়হীনা নারীকে রক্ষা করাও তো আপনার ধর্ম।

—কেন আশ্রয় পাবে না? এখানে তোমার মা আছেন। তিনি আজীবন তোমাকে বুকে করে রাখবেন। তাছাড়া আমায় তুমি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধ, দেখবে ঈর্ষা দ্বেষ হিংসা বিভেদ অবমাননার জ্বালা ভুলে যাবে।

—ভীষ্মদেব! আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। চাই স্বামীত্বে বরণ করে পূজো করতে। ভগ্নি বলে সম্বোধন করে আপনি আমায় অপমান করবেন না। ভাইবোনের সম্পর্কের উপর কলংকের কালি লেপন করবেন না। যেদিন আপনি আপনার বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক আমার হাত ধরে রথে তুলেছিলেন সেদিনই তো আপনাকে পতিত্বে বরণ করেছিলাম। কিন্তু দ্বিচারিণী হব না বলে প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে শাল্বরাজের কাছে গিয়েছিলাম।

—অম্বা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠা ভগ্নীর হাত ধরলে কোন দোষ হয় না। আমি আমার ভাই বিচিত্রবীর্যের জন্য তোমাদের তিন বোনকে হরণ করেছিলাম। তোমার আর দু' বোনের মত তুমিও আমার ছোট ভাইকে স্বামীত্বে বরণ কর।

—বা ভীষ্মদেব, আপনার যুক্তিকে বাহবা না দিয়ে পারছি না। অপরের হয়ে কেউ যেমন বিয়ে করতে যায় না, তেমনি অপরের হয়ে কেউ নারীর স্বয়ংবর সভায় গিয়ে নারী হরণ করে না। নারী পুরুষকে বিয়ে করে না—করে পৌরুষকে। তা না হয় মানলাম যে, আপনি

আমাকে আপনার ভ্রাতৃবধূ করার সংকল্পে হরণ করেছিলেন, তাই আমাকে বোনের মর্যাদা দিতে চান। কিন্তু আমি যে বিচিত্রবীর্যকে ছোট ভাই ছাড়া ভাবতে পারি না। আপনার মনের মর্যাদা রাখতে আপনি আমাকে স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দিতে চান না। তাহলে আমি কি করে ছোট ভাইকে পতিত্বে বরণ করি ?

—বেশ, আমি তাহলে তোমার জন্য আবার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করি।

—আমি দ্বিচারিণী হতে পারব না।

—কিন্তু আমিও তোমায় জননীরূপে পূজা করতে পারি, দেবীরূপে ভক্তির অর্ঘ্য দিতে পারি, ভগ্নীরূপে চিরজীবন রাজপ্রাসাদে রাখতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মচারী ব্রত ভাঙ্গতে পারি না।

—আমি আপনার করুণা বা দয়া দাক্ষিণ্য চাই না। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আপনাকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করব। আপনাকে না পেলে আত্মাহুতি দেব।

এরপর অম্বা ভীষ্মকে পাবার জন্য অনেক চেষ্টা করে সফল হতে না পেরে তাঁর ধ্বংস কামনায় ভীষ্মের গুরু শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা যিনি একাধিকবার ক্ষত্রিয় সমাজকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন সেই পরশুরামের শরণাপন্ন হয়ে বললেন ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে ভীষ্ম তাকে স্বয়ংবর সভা থেকে অপহরণ করে তাঁর পাণিগ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে, তাঁকে ভগ্নীর মর্যাদা দিতে চেয়ে তার নারীত্বের চরম অবমাননা করেছেন। আর, তিনি তাঁর কর স্পর্শ করেছিলেন বলে, তার ভাবী স্বামী তাকে গ্রহণ করেন নি।

পরশুরাম এক বিড়ম্বিতা নারীর ভাগ্য গড়তে, মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়ে ভীষ্মের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে তাঁকে পরাজিত করতে না পেরে ফিরে যান।

অম্বা তাঁর সংকল্পে অটল হয়ে সংহারের দেব দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় লিপ্ত হন।

অম্বার আরাধনায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন—অম্বা! তোমার অভিলাষ এজন্মে পূরণ হবার নয়। পিতা শান্তনুর বরে ইচ্ছামৃত্যু ছাড়া ওর মৃত্যু নেই। আর ও দেবশিশু। অতএব সত্যভ্রষ্ট হবে না।

—এজন্মে না হোক, পরজন্মে যেন আমিই ওঁর সংহারকর্ত্রী হতে পারি, আমায় এই বর দিন।

—তথাস্তু। পর জন্মে তুমি অর্ধ নর ও অর্ধ নারীরূপে আবির্ভূতা হবে। তোমায় দেখে ভীষ্ম স্বেচ্ছায় অস্ত্র ত্যাগ করবে। তখনই হবে তার মৃত্যু।

একথা শুনে ভীষ্ম-জননী জাহ্নবী অম্বাকে অভিশাপ দিলেন—যদি তুমি ভীষ্মের প্রাণ নাশের কারণ হও, তাহলে তুমি কুটিল কু-তীর্থ সম্পন্ন ভীষ্মগ্রহ সংকুল ভয়ংকর নদীরূপ ধারণ করবে। কেবল বর্ষাকালেই তুমি জলপূর্ণা থাকবে। অন্য সময়ে তোমার জল শুকিয়ে যাবে। তুমি বার্ষিকী কি অষ্টমাসিকী তা কেউ বুঝতে পারবে না।

তখন অম্বা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড সাজিয়ে করজোড়ে বললেন—হে মহেশ্বর! আমার এ নশ্বর দেহ তুমি গ্রহণ কর। অগ্নিতে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বললেন—ভীষ্ম নিধনের নিমিত্ত আমি এ দেহ বিসর্জন দিলাম।

* * *

দ্রুপদরাজ ও তার প্রিয় মহিষী ভীষ্মকে বধ করবার জন্য একটি পুত্রের কামনা নিয়ে মহেশ্বরের আরাধনা করছিলেন। তাঁদের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর বললেন—মহারাজ! তোমার এক কন্যা হবে। তবে পরিণামে সে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হবে। তার দ্বারাই ভীষ্ম নিধন হবে।

শিবের বরে রাজমহিষীর গর্ভে এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মাল। রাজা ঐ কন্যার নাম রাখলেন শিখণ্ডিনী।

দ্রুপদরাজ কন্যাকে আলেখ্য রচনা, শিল্প কার্য যা কন্যারা শিখে থাকে তাতে নিপুণ করে তুললেন, আবার দ্রোণের কাছে অস্ত্র শিক্ষাতেও পারদর্শী করলেন।

নারী ও পুরুষের উভয় শিক্ষাতেই পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন দ্রুপদ দুহিতা শিখণ্ডিনী।

স্বামী স্ত্রী দু'জনেই তখন চিন্তা করতে লাগলেন কন্যার জন্য পাত্র দেখবেন—না অপেক্ষা করবেন সেইদিনের, যেদিন শিবের বরের প্রভাবে কন্যা পুত্রে রূপান্তরিত হবে।

কিন্তু পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্তা শিখণ্ডিনী পিতৃগৃহেই রজঃস্বলা হয়ে পড়লেন।

রাজমহিষী তখন স্বামী দ্রুপদকে ডেকে কন্যাকে অচিরে পাত্রস্থ করার পরামর্শ দিলেন।

দ্রুপদ বললেন—কিন্তু শূলপাণির বরের কথা কি তুমি বিস্মৃত হলে?

—না, আমি ত্রিপুরারির কথা ভুলে যাইনি। আমি জানি তাঁর বাক্য কখনও নিস্ফল হবে না। কিন্তু মা হয়ে যুবতী কন্যাকে পাত্রস্থ না করলে যে অধর্মে পতিত হব।

—দেখ, এখন ওকে পুত্র সাজিয়ে কোন কিশোরী বালিকার সঙ্গে বিয়ে দিলে কেমন হয়?

—তা মন্দ হয় না। এখন ওরা জানবে না। পরে আমাদের কন্যা পুত্রে রূপান্তরিত হলে আর কোনরূপ ভয় থাকবে না। আমরাও কাউকে প্রতারিত করেছি এ আখ্যা দিতে পারবে না।

অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দুর্জয় দুর্ধর্ষ দর্শনাধিপতি হিরণ্যবর্মার কন্যা সুবর্ণবর্মার সঙ্গে শিখণ্ডিনীর বিবাহ হয়ে গেল।

বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর কিশোরী সুবর্ণবর্মা পূর্ণযৌবন প্রাপ্তা হয়ে স্বামী সন্নিধানে গেলে জ্ঞাত হলেন যে, তিনি স্ত্রীযোনিধৃতা নারী।

লাঞ্ছিতা সুবর্ণবর্মা তাঁর ধাত্রী ও সখীদের কাছে একথা জ্ঞাপন করলে তারা তা রাজা হিরণ্যবর্মার গোচরীভূত করলেন।

হিরণ্যবর্মা দ্রুপদ রাজের কাছে দূত প্রেরণ করে এরূপ প্রতারণা করার কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

হিরণ্যবর্মা আর একটিবার তাঁর অনুমানের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য দ্রুপদ রাজের কথামত শিখণ্ডিনীর পরীক্ষা নিলেন কন্যাকে ও ধাত্রীকে প্রেরণ করে। কিন্তু শিখণ্ডিন কন্যারূপে পরিগণিত হলেন। তিনি এবার কন্যাকে স্বগৃহে আনয়ন করে প্রতারণার প্রতিবাদে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পিতার বিপদ দেখে শিখণ্ডিনীরূপী অম্বা শোকাকুল চিত্তে গৃহ পরিত্যাগপূর্বক গহন বনে গমন করলেন এবং আমরণ অনশনে জীবননাশে সচেষ্ট হলেন।

সেই বনে স্থূলকর্ণ নামে এক যক্ষ বাস করতেন। তিনি নির্জন কাননে এক রাজকন্যাকে দেখে তার সন্নিধানে সমুপস্থিত হয়ে মধুর বচনে বললেন—কে তুমি রাজকন্যা? কি জন্য এখানে এসেছ? তোমার কথা জানতে পারলে তোমার অভিলাষ পূরণে সচেষ্ট হব।

—দেখুন, আপনি আমার অভিলাষ পূরণে কখনও সমর্থ হবেন না।

—রাজকন্যা! আমি কুবেরের অনুচর। তুমি আমার কাছে তোমার অভিলাষ ব্যক্ত কর। অবশ্যই আমি তা পূরণ করব।

তখন শিখণ্ডিনী তার জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করে বললেন—দেখুন, আপনি আমায় এই বর দিন যাতে আপনার প্রসাদে আমি পুরুষত্ব প্রাপ্ত হই।

—রাজকুমারী, দেখ আমি তোমার দুঃখ মোচনের জন্য কিছু সময়ের জন্য আমার পুরুষাকৃতি তোমায় প্রদান করব। কিন্তু কার্যোদ্ধার অন্তে তোমাকে এই জায়গায় এসে তা প্রত্যর্পন করতে হবে।

—আমি এক বছর পরেই আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে এখানে আসব।

—বেশ, তবে এস আমরা পরস্পর লিঙ্গ পরিবর্তন করি। তারা এইভাবে লিঙ্গান্তরিত হয়ে শিখণ্ডিনী শিখণ্ডী হলেন এবং যক্ষ যক্ষিনী রূপ পরিগ্রহ করলেন।

এইভাবে শিখণ্ডিনী শিখণ্ডী হয়ে হৃষ্টমনে নগরে প্রবেশ করে পিতাকে সব অবগত করাতে পিতা দর্শনাধিপতি হিরণ্যবর্মার কাছে দূত প্রেরণ করে আর একটিবার তার কন্যাকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করলে, তিনি প্রথমে কিছু সুন্দরী নর্তকী শিখণ্ডীর কাছে প্রেরণ করেন এবং তারা গিয়ে শিখণ্ডী যে যথার্থই পুরুষ, একথা বললে কন্যাকে প্রেরণ করলেন এবং জামাতাকে অশ্ব-গজ-রথ ও প্রচুর ধনরত্ন দ্বারা পরিতুষ্ট করলেন।

এদিকে ধনাধিপতি কুবের কিছুদিন বাদে সেই স্থূলকর্ণ যক্ষের আলয়ে উপস্থিত হয়ে তার দর্শন না পেয়ে অনুচরদের জিজ্ঞেস করলেন—তোমাদের মনিবটি কোথায়? সে কি আমার আগমন বার্তা জ্ঞাত হয়নি?

—যক্ষরাজ! স্থূলকর্ণ বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ দ্রুপদ রাজকন্যা শিখণ্ডিনীকে নিজের পুরুষ লক্ষণ প্রদান করে স্বয়ং স্ত্রী চিহ্ন ধারণ করে গৃহে অবস্থান করছেন। এজন্য আপনার নিকট আত্মগোপন করে আছেন।

—তোমরা তাকে গিয়ে বল, সে যেন আমার সংগে এসে এই মুহূর্তে দেখা করে।

স্থূলকর্ণ লজ্জাবনতমুখে দক্ষরাজ কুবেরের সামনে দাঁড়ালে তিনি কুপিত হয়ে বললেন—স্থূলকর্ণ! তুমি যক্ষগণের অবমাননা এবং পাপাচারণ করে শিখণ্ডিনীকে তোমার পুরুষত্ব দিয়ে তার নারীত্ব গ্রহণ করে যে অন্যায় করেছ, তার শাস্তিস্বরূপ তুমি আজীবন নারী হয়েই থাকবে। শিখণ্ডিনীও পুরুষ হয়ে থাকবে।

—প্রভু। আমি শিখণ্ডিনীর জীবন রক্ষার্থে এ কাজ করেছি। অতএব আমায় দয়া করুন।

—বেশ, শিখণ্ডিনীর মৃত্যু হলে তুমি আবার তোমার পুরুষত্ব ফিরে পাবে।

এর ফলে শিখণ্ডিনীকে আর নারীরূপ পরিগ্রহ করতে হল না।

তিনি পুরুষ হয়ে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ করে ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন।

ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডিনীকে দেখে বললেন—শিখণ্ডী তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর বা না কর—আমি তোমার সঙ্গে কোন ক্রমেই যুদ্ধ করব না। বিধাতা তোমাকে শিখণ্ডিনীরূপে সৃষ্টি করেছিলেন, আমার কাছে তুমি সেই শিখণ্ডিনীই আছ।

ভীষ্মের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে শিখণ্ডী বললেন—ক্ষত্রিয়-ক্ষয়কারী ভীষ্ম, আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি। তোমাকে বধ করার জন্যই আমার জন্ম। তাই তুমি আমার প্রতি শর নিক্ষেপ কর চাই না কর, তুমি জীবিত থাকতে আমার কাছে পরিত্রাণ পাবে না।

শিখণ্ডী বজ্রসদৃশ আশীবিষতুল্য শরজালে ভীষ্মকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করে শরশয্যা গ্রহণ করলেন।

এইভাবে অম্বা তার নারীত্বের অবমাননার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

———

শ্রেষ্ঠা কুলবধূ অম্বিকা-অম্বালিকা

কেউ যা ভাবে, যা ঘটবে বলে চিন্তা করে তাদের জীবনে সে ঘটনা ঘটে না, আবার যারা কোনরূপ কিছু চিন্তা করে না, তাদের জীবনে এমন কিছু হয়—যা তাদের ধারণাতীত। বর্তমানে কন্যা বড় হলে পিতা তাদের পাত্রস্থ করতে পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়, পরিচিত আত্মীয়দের মাঝে পাত্র খোঁজে আবার খুব জানা-শোনার মাঝেও হয়। তবে তখন ছিল স্বয়ংবর সভা। রাজার মেয়েরা সেখানে আমন্ত্রিত রাজপুত্রদের মাঝে যাকে পছন্দ তাকে বরণ করে নিতেন। এখন যেমন জীবিকা হিসাবে পাত্র নির্বাচন করা হয় তখন হোত পৌরুষ দেখে।

শত শত রাজাদের মাঝে যিনি আবির্ভূত হয়ে তাদের মাঝ থেকে অম্বা-অম্বিকা ও অম্বালিকাকে জোর পূর্বক রথে উঠিয়ে রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের পরাস্ত করলেন—তাঁকে পতিরূপে পেতে কার না বাসনা জাগে? অম্বার মত অম্বিকা ও অম্বালিকাও ভীষ্মকেই মনে মনে বাসনা করেছিলেন। কিন্তু তাদের মোহ ভঙ্গ হল তখন, যখন জানতে পারলেন যে, প্রায় তাদের সমবয়সী নবীন বিচিত্রবীর্যের সংগে তাদের বিবাহ দেবার জন্য ভীষ্ম তাদের হরণ করেছেন। এতে তাদের আশামূল ছিন্ন হলেও নিয়তির এই বিধান মেনে নিতে তাঁরা দ্বিধা করলেন না।

বীর্যহীন বিচিত্রবীর্য রাজ কাজের সব ভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্মের পরে ছেড়ে দিয়ে দুই মহিষী নিয়ে মেতে রইলেন।

অচিরে শরীরের প্রতি যত্ন না নেওয়ায় তিনি তরুণী ভার্যাদ্বয়কে রেখে পৃথিবীর মায়া কাটালেন।

সত্যবতী কুরুবংশ রক্ষার জন্য তখন ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনার্থে ভীষ্মকে ভ্রাতার ভার্যার ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করতে বললে ভীষ্ম সৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা অনুরূপ আচরণের নির্দেশ দিলেন। অম্বিকা ও অম্বালিকা তখন সন্তান কামনায় কাতর হয়ে যখন ভীষ্মদেবের কথা ভাবছেন, তখন আবার তাদের আশা ভঙ্গ হল শশ্রূমাতার কথায়।

সত্যবতী তার পুত্রবধূদ্বয়কে নির্জনে ডেকে বললেন—মা অম্বিকা ও অম্বালিকা তোমাদের অকাল বৈধব্যের জন্য আমার অন্তর দগ্ধ হচ্ছে। আজ ভীষ্ম ছাড়া এই বংশে তোমার শ্বশুরকুলকে জল দেবার কেউ নেই! সেও তো ব্রহ্মচারী। অতএব তাঁর পরে এই বংশ লোপ পাবে। অতএব এই বংশ রক্ষার জন্য মহামতি ভীষ্ম একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন—তা রক্ষা করা তোমাদের হাতে। আমি আশাকরি তোমরা সেই কর্মে ব্রতী হবে।

—আমাদের কি করতে হবে মা?

—তোমাদের এক ভাসুর আছে, আজ নিশীথে সে তোমাদের গৃহে যাবে। তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে তার আগমন কালের প্রতীক্ষা করবে এবং তাকে সঙ্গ দান করবে। এতে আমার এবং তোমাদের বংশের মঙ্গল হবে।

অবনত মস্তকে শ্বশুরকুলকে রক্ষা করতে অম্বিকা শাশুড়ির বাক্যকে স্বীকৃতি দিলেন এবং যথারীতি নিশীথে রমণীয় শয্যায় শয়ন করে ভীষ্ম ও কৌরবদের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময় ব্যাসদেব সত্য পালনার্থে মায়ের আদেশে সেই গৃহে প্রবেশ করলেন।

শয়নাগার দ্বীপ শিখায় আলোকিত ছিল। অম্বিকা সেই আলোকে কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল দাড়ি এবং দানবাকৃতি অবয়ব দেখে ভীত, বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করলেন।

ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যাসদেব বুঝতে পারলেন অম্বিকা তার রূপে মুগ্ধ

নয়, বরং অশ্রদ্ধ। তবুও মাতার সন্তোষার্থে তিনি অম্বিকাতে উপরত হলেন।

অনিচ্ছা সত্বেও শাশুড়ীর বাক্যকে অগ্রাহ্য করার সাহস না থাকায় সব কিছুকে মেনে নিলেন অম্বিকা। একবারও তিনি ঐ বিকট দর্শন পুরুষের দিকে তাকালেন না—স্বেচ্ছায় তাকে আলিঙ্গন করলেন না।

অম্বিকার গৃহ থেকে বেরিয়ে আসবার মুখে সত্যবতী ব্যাসদেবকে জিজ্ঞেস করলেন—অম্বিকার সন্তান কি গুণবান হবে?

—মা আপনার পুত্রবধূর গর্ভে অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন, অযুত নগেন্দ্র সদৃশ বলবান, সুবিদ্বান, মহাবীর্য মহাভাগা পুত্র জন্মাবে। কিন্তু তিনি জন্মান্ধ হবেন।

—বৎস। অন্ধ নৃপতি কুরুকুলের অনুপযুক্ত। অতএব তুমি অম্বালিকার ক্ষেত্রে আর একটি পুত্র উৎপাদনে যত্নবান হও।

—তথাস্তু। আমি আবার একবছর পর আসব।

যথাসময়ে অম্বিকার একটি পুত্র জন্মাল। তিনিই জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র।

বৎসরান্তে মায়ের আদেশে আবারও ব্যাসদেব হস্তিনায় এলেন এবং পূর্বের মত অতি ভয়ংকর মূর্তি ধারণ পূর্বক অম্বালিকার গৃহে গেলেন।

অম্বালিকা ব্যাসদেবের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে ভীত ও পাণ্ডুবর্ণা হয়ে গেলেন।

ব্যাসদেব অম্বালিকাতে উপরত হয়ে ফিরে আসবার সময় জননী সত্যবতী জিজ্ঞেস করলেন—বাবা! এবার কুরুকুলের যোগ্য সন্তান হবে তো?

—মা, আমায় দেখে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণা হয়েছিলেন। অতএব তার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হবে। তার নাম হবে পাণ্ডু।

—বৎস! তুমি আর একটিবার পুত্র উৎপাদনে যত্নবান হও।

ব্যাসদেব মাতৃ আজ্ঞায় আবারও অম্বিকার কাছে গেলেন।

এবার কিন্তু অম্বিকা ও অম্বালিকা কেউই ঐ বিকট দর্শন মানুষটির কাছে যেতে চাইলেন না। তারা দুই বোনে যুক্তি করে তাদের পরিবর্তে বিশ্বস্তা এক পরিচারিকাকে সালংকরা করে ব্যাসদেবের কাছে পাঠালেন।

মহর্ষি ব্যাসদেব দাসীর সেবায় পরম প্রীত হয়ে তাকে সঙ্গ দিলেন।

যাবার সময় বলে গেলেন—তোমার গর্ভজাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান ও পরম ধার্মিক হবেন। এই পুত্র হতেই তুমি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবে।

ইনিই মহামতি বিদুর। স্বয়ং ধর্মরাজ।

এইভাবে এক অভিনব অসামাজিক ক্রিয়াকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকৃতি দিয়ে সেদিন অম্বিকা ও অম্বালিকা কুরুবংশকে রক্ষা করেছিলেন। তারাইতো মহাভারতের মা।

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠের দাবীতে সিংহাসনে বসলেন আর পাণ্ডু তার হয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

বিদুর রাজা না হলেও এদের মত সম্মান পেতেন। তবে রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে তিনি সাধারণ জীবন যাপন করতেন।

পুত্রহারা জননী গান্ধারী

—মা, আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন? ভীষ্ম জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের বয়স হয়েছে। ওর জন্য একজন সুলক্ষণা কন্যার সন্ধান কর।

—মা, আমি শুনেছি গান্ধার রাজ সুবলের এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, সেখানে দূত প্রেরণ করছি।

—তারা কি তোমার অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের করে কন্যা অর্পণ করবেন?

—এ আপনি কি বলছেন মা, আমাদের বংশে কন্যা দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করার স্পর্ধা কার আছে?

—বেশ, তুমি সেখানে দূত প্রেরণ কর।

অন্ধ পাত্রে কন্যা দানের স্পৃহা কোন পিতা মাতার থাকে না। তাই গান্ধার রাজ সুবলেরও ছিল না।

তিনি তাই অন্ধ পাত্রে কন্যা সম্প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল ধৃতরাষ্ট্রের। গান্ধার রাজ্য জয় করার জন্য তিনি সৈন্য প্রেরণ করলেন।

গান্ধারীকে পত্নীরূপে বরণ করার জন্য সত্যবতী ও ভীষ্মের আগ্রহের কারণ হল তারা জানতেন যে, গান্ধারী শিবের আরাধনায় শিবকে তুষ্ট করে শতপুত্রের জননী হবার বর পেয়েছেন। বংশ বৃদ্ধিতে এরূপ সুপাত্রী আর কোথায় পাওয়া যাবে।

দূরদৃষ্টিসম্পন্না গান্ধারী জানতেন যে, তার পিতার সাধ্য হবে না দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ভীষ্মের গতিরোধ করা। ফলে সোনার গান্ধার রাজ্য

ছারখার হয়ে যাবে। তাই তিনি যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত পিতার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—পিতা! কেন বৃথা সৈন্য ক্ষয় করবেন?

—মা, বৃথা কেন হবে? আমি আমার কন্যাকে এক জন্মান্ধ পুত্রের হাতে দেব না।

—কিন্তু বাবা, আমি যে ঐ অন্ধ পুরুষটিকেই পতিত্বে বরণ করতে চাই!

—এ তুই কি বলছিস মা! বিস্ময় ঝরে পড়ে সুবলের কণ্ঠে।

—আমি ঠিকই বলছি। চেয়ে দেখুন বাবা, আমি আমার নয়নযুগল বস্ত্রাঞ্চলে আবদ্ধ করেছি। আজ থেকে আমিও আর বিশ্বকে দেখব না।

—তুই ঐ অন্ধ পতিকে শ্রদ্ধা করতে পারবি?

—কেন পারব না, শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা তো মনের ব্যাপার। মনে মনে যাকে পতিত্বে বরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর্য রমণী হয়ে তাকে অশ্রদ্ধা করব কি করে?

অতঃপর গান্ধারী স্বেচ্ছায় পিতা মাতার অনুমতি নিয়ে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে পতিত্বে বরণ করে নিলেন।

গান্ধারা তাঁর সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা দ্বারা কৌরবদের অন্তর অচিরেই জয় করলেন।

তাঁর গুরুশুশ্রূষা ও সুমিষ্ট ব্যবহারের নিন্দা তার অতি বড় শত্রুতেও কোনদিন করতে পারতেন না।

গান্ধারীর শুধু একটিই মনোবাসনা ছিল তা হল, তার স্বামী যেমন জন্মান্ধ হয়ে জ্যেষ্ঠ হয়েও রাজ্যভারের দায়িত্ব কনিষ্ঠ পাণ্ডুকে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর সন্তানের ক্ষেত্রে যাতে তা না হয়। তাঁর সন্তান যেন পাণ্ডুর সন্তানের পূর্বে জন্মায় এবং সেই যেন রাজ্যাধিকার পায়।

একদিন ব্যাসদেব ক্ষুধার্ত হয়ে গান্ধারীর আলয়ে উপস্থিত হলে গান্ধারী পরম সমাদরে তাকে শুশ্রূষা করলে মহর্ষি বললেন—শুচিস্মিতে!

তোমার সেবায় আমি পরম পরিতুষ্ট। তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

—মহর্ষি যদি সত্যিই আপনি আমার প্রতি তুষ্ট থাকেন তবে আমাকে এই বর দিন যাতে আমার গর্ভে আমার পতির মত গুণবান শতপুত্র জন্মে।

—তথাস্তু—বলে ব্যাসদেব চলে গেলেন।

এর কিছুকাল পরে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র সহযোগে অন্তঃসত্তা হলেন। কিন্তু দীর্ঘ দু'বছর অতিক্রান্ত হবার পরও তার প্রসব লক্ষণ দেখা গেল না। আর সেই সময় তিনি একদিন শুনলেন যে, তার দেবরপত্নী কুন্তীর এক পুত্র জন্মেছে।

একথা শুনে সাতিশয় ঈর্ষান্বিতা হয়ে তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে গর্ভপাত করলেন। গর্ভপাত অন্তে গর্ভ থেকে এক বিরাট মাংসখণ্ড বের হল।

তা দেখে অতিশয় দুঃখাকুলচিত্তে তিনি ঐ সুবৃহৎ মাংস খণ্ডকে জলে ভাসিয়ে দেবার সংকল্প করে তা বিসর্জন দিতে উদ্যত হলে মহর্ষি ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত হলেন।

—এ কি! তুমি এ কি করেছ?

—মহাত্মন! আমি কুন্তীর পুত্র হয়েছে শুনে ঈর্ষান্বিতা হয়ে গর্ভপাত করেছি। এখন স্বয়ং শিব এবং আপনি উভয়ে বলেছিলেন আমার শত পুত্র হবে। কিন্তু একি হল! আপনি এখন এই মাংশপেশী থেকে আমার শতপুত্র উৎপাদন করুন।

—গান্ধারী, আমার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। এই মাংসপেশী থেকেই তোমার শতপুত্র হবে।

গান্ধারী তখন মনে মনে চিন্তা করলেন—যদি এই শতপুত্রের সংগে এক কন্যা জন্মাত!

ব্যাসদেব তখন শীতল জল সেচন দ্বারা সেই মাংসপেশীকে এক এক ভাগ করে এক একটি ঘৃতকুম্ভের মধ্যে রাখতে লাগলেন। গণনা করে দেখলেন শতভাগের পর এক ভাগ বেশী হয়েছে। তখন তিনি

গান্ধারীকে বললেন—বৎসে ! এই শতভাগে তোমার শত পুত্র হবে এবং অবশিষ্ট এক ভাগে এক কন্যা হবে। এই খণ্ডগুলিকে গুপ্তস্থানে রেখে রোজ জল সেচন করবে এবং দু'বছর পর এইসব কুম্ভ উদ্‌ঘাটন করবে।

অতঃপর ব্যাসদেবেব কথামত দু'বছর পর ঐ কুম্ভের প্রথমটি উন্মোচন করলে প্রথমতঃ দুর্যোধন জন্মাল। ঐদিন কুন্তী পুত্র ভীমেরও জন্ম হয়।

দুর্যোধন জন্মেই গর্ধভের মত কর্কশ ধ্বনি করতে লাগল এবং দিবায় শিবা, নিশীথে কাক, বৎস কোলে গাভীর ডাক শ্রুত হল। এসব অশুভ লক্ষণ দেখে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী সাতিশয় ভীত হয়ে মহামতি ভীষ্ম, বিদুর ও অন্যান্য সুহৃদগণকে ডেকে বললেন—সুধীবৃন্দ, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠের অধিকার বলে তো এ রাজ্যের পরবর্তী রাজা হবেন, কিন্তু তারপর দুর্যোধন রাজা হবার যোগ্য তো ?

একথা বলার সংগে সংগে বিকট স্বরে শৃগাল, কুকুর ও গাধা ডাকতে লাগল এবং আরও নানারূপ অশুভ সূচনা হতে লাগল। তা দেখে ধীমান বিদুর ও ব্রহ্মণগণ বললেন—মহারাজ ! যার জন্মলগ্নে এমন অমঙ্গল সূচিত হচ্ছে, তাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। আমাদের মনে হয় ওর দ্বারা কুরুকুল ধ্বংস হবে। আপনি বরং ওকে ত্যাগ করে আরও নিরানব্বইজন সন্তান নিয়ে সুখে রাজ্য করুন।

একথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের মাতার মতামত নিতে গেলে তিনি বলেছিলেন—মহারাজ ! শাস্ত্রকারেরা বলেছেন একজনকে ত্যাগ করলে যদি কুলরক্ষা হয়, তবে তা করবে। গ্রাম পরিত্যাগ করলে যদি জনপদ রক্ষা হয় তা করবে, সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করলে যদি আত্মরক্ষা হয় তবে তা করবে।

কিন্তু স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র কারও কথায় কর্ণপাত না করায় এক মাসের ভিতর শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে আর এক পুত্র জন্মেছিল। তার নাম যুযুৎসু।

গান্ধারী যখন গর্ভবতী ছিলেন, তখন তিনি গর্ভভারাক্রান্ত হয়ে কৃশ হয়ে পড়েন। সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্যার ভার অর্পিত হয় এক বৈশ্য রমণীর পরে। তিনি ধৃতরাষ্ট্র সহযোগে গর্ভবতী হন এবং এক পুত্রের জন্ম দেন। তার নাম যুযুৎসু।

গান্ধারীর শত পুত্র ও কন্যার নাম হল—(১) দুর্যোধন। (১) যুযুৎসু রাজ। (৩) দুঃশাসন। (৪) দুঃসহ। (৫) দুঃশল। (৬) জলসন্ধ। (৭) সম। (৮) সহ। (৯) বিন্দু। (১০) অনুবিন্দু। (১১) দুর্ধর্ষ। (১২) সুবাহু। (১৩) দুধর্ষণ। (১৪) সু-স্প্রর্মর্ষণ। (১৫) দুর্মুখ। (১৬) দুষ্কর্ণ। (১৭) কর্ণ। (১৮) বিরিংশত। (১৯) বিকর্ণ। (২০) কাল। (২১) সত্ব। (২২) সুলোচন। (২৩) চিত্র। (২৪) উপচিত্র। (২৫) চিত্রাক্ষ। (২৬) চারুচিত্র। (২৭) শরাসন। (২৮) দুর্মদ। (২৯) দুর্বিগাহ। (৩০) বিবিৎসু। (৩১) বিকটানন। (৩২) উর্ণনাভ। (৩৩) সুনাভ। (৩৪) নন্দ। (৩৫) উপনন্দক। (৩৬) চিত্রবাণ। (৩৭) চিত্রবর্মা। (৩৮) সুবর্মা। (৩৯) দুর্বিমোচন। (৪০) অয়োবাহু। (৪১) মহাবাহু। (৪২) চিত্রাঙ্গ। (৪৩) চিত্রকুন্তল। (৪৪) ভীমবেগ। (৪৫) ভীমবল। (৪৬) বলাকী। (৪৭) বলবর্ধন। (৪৮) উগ্রায়ুধ। (৪৯) সুষেণ। (৫০) কুণ্ডধার। (৫১) মহোদর। (৫২) চিত্রায়ু। (৫৩) পার্শী। (৫৪) বৃন্দারক। (৫৫) দৃঢ়বর্মা। (৫৬) দৃঢ়ক্ষেত্র। (৫৭) সোমকীর্তি। (৫৮) অনুদর। (৫৯) দৃঢ়সন্ধ। (৬০) সত্যসন্ধ। (৬১) জরাসন্ধ। (৬২) সদ। (৬৩) সুবাক। (৬৪) উগ্রশ্রবাঃ। (৬৫) উগ্রসেন। (৬৬) দুষ্পরাজয়। (৬৭) অপরাজিত। (৬৮) কুণ্ডশায়ী। (৬৯) বিশালাক্ষ। (৭০) দুরাধর। (৭১) দৃঢ়হস্ত। (৭২) সুহস্ত। (৭৩) বাতবেশ। (৭৪) সুচর্চা। (৭৫) আদিত্যকেতু। (৭৬) বহুবাশী। (৭৭) নাগদত্ত। (৭৮) অগ্রযায়ী। (৭৯) কবচী। (৮০) ক্রবন। (৮১) কুণ্ডী। (৮২) ধনুর্ধর। (৮৩) উগ্র। (৮৪) ভীমরথ। (৮৫) বীর-

বাহু। (৮৬) অলোলুপ্ত। (৮৭) অভয়। (৮৮) অনাধৃষ্য। (৮৯) কুম্ভভেদী। (৯০) বিরাটী। (৯১) চিত্রকুণ্ডল। (৯২) প্রমথ। (৯৩) প্রমোথী। (৯৪) দীর্ঘরোমা। (৯৫) দীর্ঘবাহু। (৯৬) ব্যূঢ়োরু। (৯৭) কনকধ্বজ। (৯৮) কুণ্ডাশী। (৯৯) বিরজা। (১০০) দীর্ঘবিন্দু। কন্যা: (১) দুঃশলা।

সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের সঙ্গে দুঃশলার বিবাহ হয়; শত রাজপুত্রদের রাজকন্যাদের সঙ্গে।

[গান্ধারীকে নিয়ে পালাকারেরা তাদের মনের মত করে সাজিয়ে বহু নাটক লিখেছেন, আবার আধুনিক লেখকেরা চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাদের চিন্তাধারার বিকাশ ঘটিয়েছেন।

সেখানে তারা দেখিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র অত্যাচারী ও ব্যভিচারী ছিলেন। তিনি গান্ধার রাজ সুবলের শত পুত্রকে কারা বন্দী করে তিলে তিলে না খাইয়ে মেরেছেন। তাদের সকলের অন্নে বেঁচে ছিলেন একমাত্র শকুনি। তিনি তার পিতার হাড়ে পাশা খেলে পাণ্ডবদের হারান এবং দুর্যোধনকে অত্যাচারী তৈরী করেন কুরুবংশ ধ্বংসের জন্য।

আর যে স্বামী এত অত্যাচার করেছে তার পিতৃ বংশের উপর; যে স্বামী পত্নী দু' বছরের অন্তঃসত্তা হলে পরিচারিকার উপর তার বাসনার নিবৃত্তি করে, সেই স্বামী অন্ধ বলে তার জন্য চোখে বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে চলতেন এটাকে এ যুগের অনেকেই মানতে চান না। তারা বলেন গান্ধারী বস্ত্রে চোখ বেঁধে রাখতেন কারণ তিনি অত্যাচারী, ব্যভিচারী স্বামীকে ঘৃণা করতেন।

এ দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণের। কিন্তু গান্ধারীর অসাধারণত্ব তো সেখানেই, সেখানেই তো তিনি মহীয়সীদের স্থান দখল করেছেন। স্বামী অত্যাচারী কি ব্যভিচারী সে বিচার তিনি করেন নি। তিনি তার যোগ্যা সহধর্মিনী হিসাবে পতি অন্ধ বলে নিজে অন্ধ সেজে রয়েছেন। তার না দেখতে পাওয়ার বেদনাকে উপলব্ধি করেছেন। এরূপ সহধর্মিনীর ইতিহাস মেলা ভার। ধৃতরাষ্ট্র স্নেহান্ধ ছিলেন। কিন্তু গান্ধারী নয়।

পুত্র-স্নেহাতুরা গান্ধারী যখন শুনলেন প্রকাশ্য রাজদরবারে তাদেরই কুলবধূ দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে মেতেউঠেছে তারই পুত্র দুঃশাসন, রাজা দুর্যোধনের আজ্ঞায়, তখন তিনি বিদুরের মুখে একথা শুনে ছুটে গেছেন স্বামীর কাছে—ওগো,

তুমি কি এখনও চুপ করে বসে থাকবে? সতী নারীর অমর্যাদায় যে কুরুকুল ধ্বংস হবে। যাও, ঐ কুলাঙ্গার পুত্রকে কুকর্ম থেকে বিরত কর।

তিনি শুধু নারীর অবমাননায় ব্যাকুল হয়েছেন তা নয়, তিনি ঐ কুলাঙ্গার পুত্রের জননী বলে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁর মনে অনুশোচনা এসেছে কেন তিনি সেদিনই জন্মলগ্নে একে ধ্বংস করেন নি।

কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে কৌরব ও পাণ্ডবদের মাঝে যুদ্ধ হবার আগে একদিন গান্ধারী একটি অন্যায় করে বসেন। ঈর্ষাবশতঃ গর্ভপাত আর রাজমাতার গর্বে গর্বিত হয়ে সেদিন যা করেছিলেন তা তার মত মহীয়সীর শোভা বাড়ায় নি। কিন্তু দোষে-গুণেই তো সংসার।]

*   *   *

গান্ধারী ও কুন্তী উভয়েই পঞ্চাননের পূজারী ছিলেন। প্রতিদিন সকালে স্নান করে গান্ধারী ও কুন্তী হস্তিনা নগরের কাছে শিব মন্দিরে পূজো করতেন। কিন্তু কারও সংগে কারও যোগাযোগ ছিল না। তারা কেউই জানতেন না যে, তারা উভয়েই একই বিগ্রহ পূজো করছেন।

একদিন দৈব দুর্বিপাকে উভয়ের সংগে উভয়ের দেখা হলে গান্ধারী বিস্ময়ান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—একি কুন্তী, তুমি এখানে? হাতেও দেখছি ফুল-ফল। বলি ব্যাপার কি?

—এতে অবাক হবার কি আছে? আমি তো রোজই এই দেব বিগ্রহ পূজো করি।

কুন্তীর গর্বিত স্বর শুনে রাজমাতা গান্ধারী কুপিত হলেন। গর্বভরে বললেন— আমার পূজিত বিগ্রহ পূজা করার স্পর্ধা তোর হল কি করে? যে বিগ্রহ সধবা রমণী পূজো করে, বিধবার সে পূজোয় অধিকার কোথায়? আমি রাজনন্দিনী, রাজরানী। এ বিগ্রহে আমার ছাড়া আর কারও পূজো দেবার অধিকার নেই।

শান্ত স্বরে কুন্তী বললেন—তুমি জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর অধিকারে এই বিগ্রহ এতদিন পূজো করেছ, আমি ছিলাম না বলে। কিন্তু আমি যতদিন এই কুরুকুলে ছিলাম, ততদিন প্রতিদিন প্রভাতে এই বিগ্রহ

আমিই পূজো করেছি। এ কথা এই রাজধানীর সকলেই জ্ঞাত আছে। আমি ছাড়া এই লিঙ্গ পূজোর অধিকার আর কারও নেই।

—কুন্তী, তখন যা করেছ এখন আর তা করার অধিকার তোমার নেই। তুমি তখন সধবা ছিলে, ছিলে রাজমাতা। এখন বিধবা এবং রাজ্যহীনা। অতএব যে লিঙ্গ রাজমাতা পূজা করে, সেই লিঙ্গে পূজো করার অধিকার তোমার নেই।

—আমি দেশে ছিলাম না বলে তুমি এই শিবলিঙ্গ পূজেছ, এখন আর এখানে আসবে না।

এইভাবে দুই ভগ্নীতে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা সুরু হলে স্বয়ং শিব সেখানে আবির্ভূত হয়ে গান্ধারী ও কুন্তীকে বললেন—দেখ, তোমরা দুজনেই কুরুকুলবধূ। উভয়ের ভক্তিই সমান। আমি সবার পূজা গ্রহণ করি। কেউ আমাকে ভাগ করতে পারে না। তোমরা উভয়েই রাজকুলবধূ, রাজমাতা। অতএব যদি সত্যিই তোমরা চাও যে, তোমাদের মধ্যে যে কোন একজন আমায় পূজো করবে, তবে শোন, কাল প্রভাতে যে প্রথম সহস্র সুগন্ধযুক্ত কনক চাপা দিয়ে আমায় পূজো করবে, আমি তারই হব। আর যার জননী এ কাজ প্রথম করবে তার পুত্রই এ রাজ্যের রাজা হবে।

একথা শুনে গান্ধারী উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ভাবলেন তাঁর শত পুত্র এবং দুর্যোধন ধনশালী—অতএব সহস্র কনকচাঁপা তৈরী করতে তার বিন্দুমাত্র ক্লেশ হবে না। রাজ্যচ্যুতা কুন্তী কি করে এটা সম্ভব করবে। অতএব তার পুত্রের রাজা হওয়া নিশ্চিত।

গান্ধারী গৃহে ফিরে পুত্র দুর্যোধনকে শিব মন্দিরে কুন্তীর সংগে বাদানুবাদ এবং শিবের কথা জ্ঞাত করালে, দুর্যোধন সংগে সংগে কয়েক সহস্র কারিগরকে ডেকে এনে মণকে মণ সোনা, মণি-মাণিক্য দিয়ে সহস্র কনকচাঁপা তৈরীর আদেশ দিলেন।

এদিকে কুন্তী গৃহে ফিরে অধোবদনে রইলেন। ভীম মায়ের কাছে আহার চেয়ে না পেয়ে ক্রুদ্ধ হলে অর্জুন, নকুল, সহদেব এমন কি

যুধিষ্ঠিরও জানতে পারলেন না তার মায়ের বিষাদের কারণ।

অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর কুন্তী অন্তকার ঘটনা জ্ঞাত করালে অর্জুন বায়ুবাণ নিক্ষেপ করে কুবেরের পুরীর পুষ্প কাননকে উড়িয়ে আনলেন। আর সেই কনকচাঁপা শিবের শিরে বর্ষিত হল। পুষ্পে পুরিত হল মন্দিরের প্রবেশ পথ।

প্রত্যূষে হৃষ্টচিত্তে কুন্তী শুদ্ধচারিণী হয়ে সেই পুষ্পে শিবের পূজা করলে, তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে রাজমাতা হবার বর দিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন।

গান্ধারী এসে দেখেন শিবপূজা তাঁর প্রার্থিত পুষ্পে হয়ে গেছে এবং কুন্তী বর লাভ করে গৃহে ফিরে গেছেন।

অর্জুনকেও শিব ধনঞ্জয় নামে ভূষিত করেছেন।

বিদ্বান, গুণবান ও চরিত্রবান পুত্র প্রতিটি জননীর কাম্য। কুন্তীর ভাগ্যে তা জুটেছিল—গান্ধারীর নয়। তিনি তাই মনে মনে দুঃখিত হয়ে ভাবলেন, সত্যিই ভাগ্যবতী কুন্তী। গুণবান, কৃতি পুত্রের জননী তিনি। আর, তাঁর শতপুত্র থেকেও সামান্য একটি চাহিদা পুরণে সমর্থ হল না।

দুঃখে ভরা জীবন গান্ধারীর। চোখ থেকেও তিনি ষোড়শ বৎসরান্তে আর কোনদিন পৃথিবীর আলো দেখেননি। আশা ছিল রাজমাতা হবেন, তার ছেলে রাজা হবে, জ্যেষ্ঠের অধিকারে। কিন্তু তা হল না। অন্তঃসত্তা হয়েও যুধিষ্ঠির জন্মাবার দু'বছর পরে দুর্যোধনের জন্ম হয়।

দুর্যোধন সারা জীবন দুর্জন ব্যক্তিদের মূলধন করে রাজ্য শাসন করেছেন—অতএব তার পরিণাম ধ্বংস। এটা যেমন তিনি জানতেন এবং শিবের বর এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্মে মতি দেখেও তিনি বুঝেছিলেন ধর্মের জয় অনিবার্য।

তাই তিনি যুধিষ্ঠির পাঁচখানা গ্রাম চাইলে তা দিতে বার বার দুর্যোধনকে অনুরোধ করেছিলেন। দুর্যোধন শোনেনি।

পাণ্ডবদের সংগে যুদ্ধে যাত্রাকালে মা হয়েও তিনি পুত্রকে বলতে

পারেননি—যাও, পুত্র বিজয়ী হয়ে এস। শুধু বলেছেন ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

কিন্তু মনে মনে জানতেন ধর্মের জয় হবেই।

হলও তাই। যুদ্ধক্ষেত্রে শত ভ্রাতা সহ ভীমের গুরু গদাঘাতে দুর্যোধন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। গান্ধারী তখন আর ধৈর্য ধরতে পারেন নি।

কোন্ মাতাই বা পারে? কু-পুত্র অনেকে হয়, কিন্তু কু-মাতা তো হয় না।

তিনি ভীমকে দোষারোপ করলেন তার পুত্র দুর্যোধনকে অন্যায় সমরে নিধন করার জন্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুঃশাসনকে মেরে রুধির পান করার জন্য।

ভীম মাতা গান্ধারীর কাছে একে একে সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে গান্ধারীর ক্রোধ প্রশমিত হল। তিনি আপন পুত্রশোক বিস্মৃত হয়ে যুধিষ্ঠির ও ভীমকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে বললেন—যুধিষ্ঠির, তোমাদের আমি চিরকাল আপন পুত্রের মত দেখেছি। দুর্যোধনে ও তোমাতে বিভেদ করিনি। আজও তোমাদের আশীর্বাদ করি, তোমরা সুখী হও, শান্তিতে রাজত্ব কর।

সদ্য পুত্রহীনা কোন জননী পুত্রহন্তাদের অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদ করেছে এ দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল।

গান্ধারী অতঃপর ছুটে গেলেন রণক্ষেত্রে। সংগে শত বিধবা পুত্রবধূ।

রণক্ষেত্রে মৃত দুর্যোধনকে অবহেলা—অনাদরে ভূলুণ্ঠিত দেখে তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। বিলাপ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

ক্ষণে ওঠেন, ক্ষণে মূর্ছা যান, ক্ষণে বিলাপ করেন। পাগলিনী প্রায় গান্ধারীকে বিদুর, শ্রীকৃষ্ণ বহু সান্ত্বনা দিলেন, কিন্তু তাতে কি শোক প্রশমিত হয়? তিনি জানেন যে, তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুকর্মই

তার শত ভাইয়ের বিনাশের কারণ। কিন্তু তিনি এও জানেন যে, কৃষ্ণ না থাকলে পাণ্ডবরা জয়ী হতেন না।

অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্না, ধৈর্যশীলা, অনন্যা, অদ্বিতীয়া জননী গান্ধারী কিছু সময়ের জন্য সাধারণ নারীতে রূপান্তরিত হলেন। সম্মুখে কৃষ্ণকে পেয়ে তীব্রভাবে তাঁকে আক্রমণ করলেন--গোবিন্দ! তোমার জন্যই আমার বংশ নাশ হল।

—এ কি কথা বলছেন রাজমাতা, সবই কর্মফল। আমি নিমিত্ত মাত্র।

—কৃষ্ণ! সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের অধিকর্তা তুমি। জীবের দোষ-গুণ ধর্মা-ধর্ম সবই তোমাতে বর্তমান। তুমিই তোমার ইচ্ছায় গড়-ভাঙো। সবই তোমার মায়া! তুমি যে প্রাণীকে দিয়ে যা করাতে চাও, যা বলাতে চাও তাই করাও-বলাও। এই সংসারে যা কিছু ঘটে তার মূলে তুমি। কৌরব এবং পাণ্ডবের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মূলেও তুমি। আমার ধর্মাত্মা পুত্র যুধিষ্ঠিরের মনে হিংসার লেশ ছিল না, সে কুটনীতি জানে না। তুমি তার মনে কুট ঢুকিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিপদের সূচনা করলে।

কৃষ্ণ! কৌরব ও পাণ্ডব উভয়ই তোমার নজরে সমান। উভয়েই তোমাকে বরণ করতে গেলে তুমি কপট নিদ্রায় শয়ান ছিলে। প্রথমে দুর্যোধন তোমার কাছে গিয়েছিল কিন্তু পরে অর্জুন আসছে শুনে তুমি নিদ্রার ভান করে শুয়েছিলে। অর্জুন এলে তুমি কৌশলে তার সংগে আগে কথা বললে। তুমি অর্জুনের সারথি হলে এবং দুর্যোধনকে তোমার নারায়ণী সেনা দিলে। যদি তুমি অর্জুনের সারথি না হতে এবং দুর্যোধনকে সৈন্য না দিতে তবে এ অনর্থ হত না। তুমি যদি উভয়ের হিত চাইতে, কুরুকুলের ক্ষয় না চাইতে, তবে যখন উভয়ে তোমার কাছে যুদ্ধের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল, তুমি তাদের ঐ পথ থেকে নিবৃত্ত করতে।

তুমি জানতে দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করবে। ঐ যুদ্ধের কৌশল অর্জুন ছাড়া পাণ্ডবের মধ্যে কেউ জানে না। অভিমন্যু আগম জানে,

নির্গম জানে না। তুমি কৌশলে সেদিন অর্জুনকে নিয়ে দূরে সরে ছিলে। কৃপ, দ্রোণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ অশ্বত্থমা ও জয়দ্রথ এই সপ্তরথী মিলে দুধের বাছা অভিমন্যুকে ঘিরে ধরে। বীরের মত যুদ্ধ করে অভিমন্যু মারা যায়। অর্জুনের মনে কৌরবদের বিশেষ করে তার গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষভাব গড়ে তোলার জন্য তুমিই কৌশলে এ কাজ করেছিলে। ফলে জয়দ্রথ বধে উদ্যত হয় অর্জুন।

জয়দ্রথকে দ্রোণাচার্য এমন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যেখানে কাকপক্ষী, তো দূরের কথা বায়ুরও সাধ্য ছিল না তাকে দেখে।

এদিকে সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করতে না পারলে অর্জুন প্রাণ ত্যাগ করবে বলে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল। তৃতীয় প্রহর বেলা অতিক্রম হবার পরও জয়দ্রথের সন্ধান না পেয়ে অর্জুন বিমর্ষ হয়ে পড়লে তুমি চক্র দ্বারা সূর্যকে আচ্ছন্ন করেছিলে। সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে দেখে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পার্থ প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হলে, তুমি চক্র সরিয়ে নিয়েছিলে। জয়দ্রথ ইতি-পূর্বে প্রবল শত্রু ধনঞ্জয়ের মৃত্যু দেখবার জন্য বাইরে বের হয়েছিল। আচমকা সূর্যকিরণে ধরিত্রী উজ্জ্বল হওয়ায় অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করতে সমর্থ হয়। বল! এসব সম্ভব হল কি করে? তুমি জানতে হাতে ধনুঃশর থাকতে দ্রোণাচার্য অবধ্য। আর অর্জুন তার দেহে শর নিক্ষেপ করবে না। তুমি ধর্মপুত্রকে দিয়ে কৌশলে মিথ্যাচারণ করিয়েছিলে। অশ্বত্থমা নামে একটি হাতি মারা যায়। যুধিষ্ঠির তোমার কথায় 'অশ্বত্থমা হত'র পরে জোর দিয়ে 'ইতি গজ' ধীরে উচ্চারণ করলে পুত্রস্নেহান্ধ পিতা প্রথম শব্দটি শুনে পুত্রশোকে কাতর হয়ে কালো উত্তরীয় ধারণ করে ধনুকের ছিলার উপর মুখ গুজে বসেছিল। তুমি অর্জুনকে দূরে নিয়ে দেখালে তার গুরুকে। অর্জুন দূর থেকে দৃষ্টি ভ্রমে দেখল যে, তার গুরুকে এক কাল কেউটে দংশনে উদ্যত। কালো উত্তরীয়টিকে সর্পভ্রমে অর্জুন তীর নিক্ষেপ করে এবং সে তীর গুরুর কণ্ঠে বিদ্ধ হয়। ঠিক ঐ একই ভাবে কর্ণের রথচক্র মেদিনীতে

বসে গেলে, তুমি অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ কর্ণ, এই কথা বলে অর্জুনের মনে বিদ্বেষ বহ্নি জ্বালিয়ে তাকে নিধনে বাধ্য করেছিলে। গদা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল বৃকোদর ও দুর্যোধন। তুমি বার বার উরু দেখিয়ে ভীমকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে। উরুতে আঘাত করা অন্যায় জেনেও তুমি কৌশলে ভীমকে দিয়ে ঐ কু-কাজ করিয়েছিলে।

এইভাবে তোমার কপটতা কূটকৌশলের শিকার হল আমার পুত্রগণ। তোমার মন কি দিয়ে গঠিত, মাধব? তোমার মনে কি একটু দয়া জন্মাল না? একটিবারও কি মনে হল না, আমাদের জল পিণ্ডদানের জন্য অন্তত একটি সন্তানও বাঁচুক!

যে প্রকৃত সুহৃদ সে মিলন ঘটায়। কিন্তু আমার কোন্ পাপের ফলে তুমি ধ্বংস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে?

আমি জানি তুমি দেব নারায়ণ! বিশ্বের বিধাতা—বিস্ময়। তোমা থেকেই প্রাণীর উৎপত্তি। লয়। তুমি সৃষ্টি কর, পালন কর আবার তোমার আজ্ঞায় শিব তা ধ্বংস করেন। তুমি সৃষ্টি-স্থিতি, প্রলয়ের অধিকর্তা। তুমি বিধাতা কর্তা। সুমতি, কুমতি, সুযুক্তি, কুযুক্তি সব তোমাতে বর্তমান। তুমি যা করবে তাই-ই কর্ম, যা করাবে তাই ধর্ম। সৃষ্টি করেও যেমন তুমি আনন্দ পাও, সংহার করেও রঙ্গ দেখ।

তুমি বলছো দুর্যোধন অহংকারে মত্ত হয়ে লঘু গুরু জ্ঞান না করে সব সময় কু-কর্মে লিপ্ত থেকেছে। তার কু-কর্ম তাকে ধ্বংসের পথ দেখিয়েছে। সে তার নিজ দোষেই নিধন হয়েছে। তোমার একথাও মিথ্যা প্রবোধ। তুমিই তো কর্ম, ক্রিয়া, ধ্যান, যোগ, যাকে যেমন করাবে সে তেমন ফলভোগ করবে এতো তোমাতে নিহিত। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে অর্জুন, ভীম আর দুর্যোধন দুঃশাসনে কোনরূপ প্রভেদ ছিল না। তুমি তার কানে কু-মন্ত্রণা দিয়ে, রাজ্য লোভের লালসা দেখিয়ে ভেদ নীতি শিখিয়েছিলে।

তুমিই বলবে সব কালে করে! তুমি নিমিত্ত মাত্র। তোমার

একথা মানতে পারতাম, যদি এই রণে তুমি নিরপেক্ষর ভূমিকা নিতে। দুই ভাইয়ে বিবাদ শুরু হয়েছিল। তুমি মধ্যস্থতা না করে, তুমি স্বয়ং এবং তোমার সৈন্য যুদ্ধে দুটি দিক গ্রহণ করে, যুদ্ধটিকে স্থিতি দিয়েছিলে কেন? হে নারায়ণ, সব অনর্থের মূল তুমি! কিন্তু তুমি কি ভেবেছো, দেবতা বলে, সৃষ্টিকর্তা বলে তুমি পার পেয়ে যাবে? না তা পাবে না। আমি যদি সতী হই, পতি সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করে থাকি, তবে তোমায় আজ আমি যে অভিশাপ দেব তার ফল ভোগ তোমাকে করতেই হবে। এ এক পুত্র শোকাতুরা স্নেহময়ী মায়ের অভিশাপ। পুত্রশোকে আজ আমি যেমন জ্বলছি তুমিও তেমন জ্বলবে। যদু বংশ ধ্বংস হবে। আজ রণক্ষেত্রে আমার বধূগণ যেমন পতিহারা হয়ে কাঁদছে, তোমার চোখের সামনে তোমার বধূগণও অনুরূপ কাঁদবে।

গান্ধারীর অভিশাপে সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের অধিকারী প্রভু শ্রীকৃষ্ণের অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল। মনে মনে ভাবলেন, এতদিনে তিনিও মুক্তি পেলেন। এও তো তারই সৃষ্টি। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে যেমন কৌশলে তিনি অভিমন্যু বধ ঘটিয়ে তার মনে ক্রোধভাব এনেছিলেন, গান্ধারীর অভিশাপ গ্রহণ করেও তিনি মুক্তি নিলেন মানব জন্মের জ্বালা থেকে।

গান্ধারীর অভিশাপ শুনে শোকে দুঃখে আনন্দে যাঁর কোন ভাবান্তর হয় না সেই শ্রীমাধব মৃদু স্বরে গান্ধারীকে বললেন—ওঠ, শোক পরিত্যাগ কর। দুর্যোধন তার দোষে কুরুবংশ ধ্বংস করল। এর জন্য বৃথাই তুমি আমায় অভিশাপ দিলে। আমি যদি দোষী হই, তবে তোমার শাপ অবশ্যই ফলবে। আমি মনস্তাপ পাব। এ কথা বলে তিনি গান্ধারীর শোক হরণ করলেন।

* * *

গান্ধারী বস্ত্রাঞ্চলে সব সময় নয়নযুগল আবদ্ধ করে রাখতেন। অন্তঃপুর বাসিনী ছিলেন। কিন্তু তার স্বামীর মত স্নেহান্ধ হয়ে সব-কিছু জেনেও না জানার ভান করেননি। তিনি শুধু তার শত পুত্রের

জন্য গর্বিতা ছিলেন। ভাবতেন এদের মাঝে কেউ না কেউ তো ভাল হবেই। কিন্তু বার বার তাঁর সে আশা নিরাশায় পরিণত হয়েছে।

যুদ্ধের পরিণাম, কে বা কার নির্দেশে এ যুদ্ধ, সব তিনি জ্ঞাত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তার পুত্রদের কাটা মুণ্ড নিয়ে শৃগাল কুকুর, শকুনির ক্রীড়া, বালক অভিমন্যুর মৃত্যুতে তিনি বিহ্বল হয়েছিলেন। তার অন্তরটি ছিল এক সাম্যবাদী নারীর স্নেহাগার। তাই তিনি কর্ণ ও দুর্যোধনকে সম নজরে দেখেছিলেন, তার শতপুত্র যাদের দ্বারা হত হল সেই পঞ্চপাণ্ডবের প্রশংসা শোকের মাঝেও তিনি করেছেন, তারা যে নিমিত্ত মাত্র। আসল অনর্থের মূল যে কৃষ্ণ তা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি।

এরপর গান্ধারী স্বামী ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তী সহ বাণপ্রস্থ নেন এবং বনে এক প্রবল অগ্নিকাণ্ডে তাঁদের সকলের সব জ্বালার নিবৃত্তি হয়।



প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তী

যদুবংশের শূর নামে নৃপতি মহারাজ কুন্তীভোজের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, তার প্রথম সন্তান তিনি কুন্তীভোজকে দেবেন। প্রতিশ্রুতি রাখতে তার প্রথম সন্তান পরম রূপবতী পৃথাকে তিনি কুন্তীভোজের করে অর্পণ করেন।

কুন্তীভোজের আলয়ে পরম সমাদরে পৃথা পালিত হতে থাকে। কুন্তীভোজের আলয়ে পিতার নামানুসারে তার নাম নয় কুন্তী।

বাল্যকাল থেকেই কুন্তী ব্রতপরায়ণা, দেব-দ্বিজে ভক্তি ও সেবা-পরায়ণা ছিলেন।

একদিন মহারাজ ভোজের রাজ দরবারে মহাতেজা দুর্বাসা ভিক্ষার্থী ও ভোজনাভিলাষী হয়ে উপস্থিত হলে, রাজা ভোজ তাঁকে পরম সমাদরে আপ্যায়িত করে সচ্চরিত্রা, সাধ্বী, ধর্মপরায়ণা, সেবাপরায়ণা কুন্তীর আলয়ে প্রেরণ করলেন।

ব্রতপরায়ণা, পরিশুদ্ধা, পৃথা প্রতিদিন দুর্বাসার সেবা করতে লাগলেন।

দুর্বাসা প্রায়ই দুপুরে আসব বলে বাড়ীর বার হয়ে কখনো সন্ধ্যায় কখনও বা মাঝরাতে হাজির হতেন। তথাপি কুন্তী কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করতেন না, বরং সেই সময় তাকে উৎকৃষ্ট ভোজন সামগ্রী পরিবেশন করতেন। তাঁর দ্বারা তিরস্কৃত হয়েও কখনও অপ্রিয় আচরণে প্রবৃত্ত হতেন না। কুন্তী যে সময়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তখন দুর্বাসা তার কাছে দুর্লভ বস্তু চাইতেন। কুন্তী শিষ্যার ন্যায় ভগ্নীর ন্যায় তাঁর সে অভিলাষ পূর্ণ করতেন।

এইভাবে একটি বছর দুর্বাসা নানাভাবে কুন্তীকে জব্দ করতে

সচেষ্ট হয়েও তা না পেরে তাঁর সহিষ্ণুতা, স্নেহপরায়ণতা, প্রীতিপূর্ণ আচরণে পরম প্রীত হয়ে তাঁকে একটি মন্ত্র দিলেন এবং বললেন ঐ মন্ত্র পাঠ করে তিনি যে কোন দেবতাকে আহ্বান করলে তিনি আবির্ভূত হয়ে তার মনোবাসনা পূরণ করবেন।

কুন্তী পরিশুদ্ধা হয়ে প্রসন্ন চিত্তে অথর্ববেদ বিহিত মন্ত্র গ্রহণ করলেন।

ত্রয়োদশী কুন্তী চতুর্দশী হলেন। ঠিক সেই সময় তার মনে একদিন চপলতা দেখা দিল। মনে মনে তিনি ভাবলেন—এও কি সম্ভব, মন্ত্রের প্রভাবে স্বর্গের দেবতারা মর্তের সাধারণ মানবীর কাছে ধরা দেবেন?

মনে এই ভাবের উদয় হতেই মুনির কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্রজপে তিনি দিবাকরকে স্মরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেব দিবাকর তার করজালে ধরিত্রীকে আলোকিত করে তার সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন—আমি, দিনের দেবতা দিবাকর। বল, কি অভিপ্রায়ে তুমি আমাকে স্মরণ করেছ? তোমার অভিলাষ জানতে পারলে আমি তা পূরণে সচেষ্ট হতে পারি।

কুন্তী নিজের চোখকে তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে লজ্জিতা ও স্পন্দিতা রাজ দুহিতা কুন্তী নতনেত্রে করজোড়ে বললেন—হে দিবাকর! আমি এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পাওয়া বরের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে মূঢ়ের মত আপনাকে আহ্বান করেছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

কুন্তীর কাতর কাকুতিতে ভাস্করদেব ক্ষণকাল চুপ করে থেকে মধুর স্বরে বললেন—পৃথা, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি যে দুর্বাসার কাছ থেকে বর পেয়েছ তা আমি জানি। দেখ প্রত্যেক নারীরই বাসনা থাকে, আর তাদের সে বাসনার পরিতৃপ্তি হয় পুরুষের দ্বারাই, আর মনের মত পুরুষকেই নারী কামনা করে। ভেবে দেখ, স্বর্গে তো এত দেবতা ছিল, তার ভিতর তুমি আমাকেই বা কেন

আহ্বান করলে ?

কুন্তীর মুখে শব্দ যোগায় না।

দিবাকর আবার বললেন—দেখ, তুমি যখন আমাকে ডেকেছো, তখন আমার ভোগবিলাসপূর্ণ করার দায়িত্বও তোমার। এতে তোমার কোন অপরাধ হবে না।

কুন্তী আবারও লজ্জিতা হয়ে নতনেত্রে বললেন—ভগবন ! পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরাই আমার দেহদানে অধিকারী। অতএব আমি তার অন্যথা করে ধর্মলোপ করতে অসমর্থ। লোক সমাজে স্ত্রী-লোকদের দেহরক্ষা স্বরূপ ধর্মই আদরণীয়। আমি বালিকা। আমায় ক্ষমা করুন।

—কুন্তী, তুমি বালিকা বলেই তোমাকে অনুনয় করছি। অন্য রমণী হলে করতে হোত না। তারা ধন্য হোত। তুমি আমাকে আত্মদান কর। তাতে তোমার শান্তি লাভ হবে। আমি তোমার মন্ত্রে আহূত হয়ে এসেছি, এখন অপূর্ণ মানসে ফিরে গেলে দেবলোকে উপহাসাস্পদ হব। তাছাড়া তুমি তো কোন অন্যায় করছো না ! দেবসেবা করা তো মানব ধর্ম। তুমি সম্মতি দাও। আমি কথা দিচ্ছি, আমার ঔরসে তোমার গর্ভে এক তেজস্বী পুত্র জন্মাবে। দেখ, তুমি যদি আমায় প্রত্যাখান কর, তবে দেব রোষে পতিত হবে। তাঁর ফল শুভ হবে না

কুন্তী অশেষ প্রকার কাকুতি মিনতি করেও সূর্যদেবকে নিবৃত্ত করতে অসমর্থ হয়ে মনে মনে ভাবলেন—এখন যদি আমি সূর্যদেবকে প্রত্যাখ্যান করি তবে তাঁর অভিশাপে আমার অথবা পিতার সর্বনাশ হবে, আবার কুমারী অবস্থায় লোক চক্ষুর অন্তরালে স্বেচ্ছায় আত্মদান করে কি করেই বা অকার্য অনুষ্ঠান করি ?

এরূপ চিন্তা করে তিনি আবারও বললেন—দেব দিনমণি ! আমার পিতা-মাতা ও আত্মীয় পরিজন বর্তমান থাকতে আমি কি করে এরূপ বিধিবিরুদ্ধ কর্মে লিপ্ত হই ? দেখুন, যদি আপনার সংগে আমার অবৈধ সহবাস হয়, তবে লোক সমাজে আমাদের কুলের কীর্তি লোপ

পাবে। প্রাণীদের মধ্যে ধর্ম, যশঃ, কীর্তি ও আয়ু আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব যদি আপনি এই কাজকে ধর্মানুগত বলেন, তবে আমি আত্মীয় পরিজনের অপেক্ষা না করে আত্মদান করতে পারি।

—কুন্তি! তোমার পিতা, মাতা বা অন্যান্য গুরুজন তোমার প্রভু নয়। অবিবাহিতা নারীগণ যাকে ইচ্ছে তাকেই কামনা করতে পারে বলে, তাদের কন্যা বলে। কন্যা স্বতন্ত্রা—পরতন্ত্রা নয়। অতএব তুমি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হলে কখনো অধর্মাচরণ হবে না। আর আমি কি জন্যই বা কামপরতন্ত্র হয়ে অধর্মাচরণ করব। দেখ, স্বেচ্ছানুসারে কাজ করাই স্বভাব সিদ্ধ। বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্পনা মাত্র। অতএব তুমি অশঙ্কিত চিত্তে আমার সঙ্গে সঙ্গত হও। এতে তুমি এক মহাযশা পুত্রের জননী হবে এবং তোমার কন্যাবস্থা ফিরে পাবে।

—ভগবান! যদি আমার কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ঐ পুত্র কুণ্ডল ও অভেদ্য সহজাত বর্মধারী হয় এবং আপনার পুত্র তেজস্বী, রূপবান ও ধার্মিক হয় তবে আমি আপনার সংগে সংযুক্ত হতে পারি।

—তোমার অভিলাষই পূরণ হবে। অদিতি আমাকে যে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করেছিলেন তা এবং উৎকৃষ্ট বর্ম তোমার পুত্র পাবে।

—বেশ তবে আপনার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

এই ভাবে একজন তার ভোগলালসা চরিতার্থ করল। আর কুন্তী আত্মাহুতি দিলেন দেবতার কামানলে, তাঁর ছলা কলার শিকার হয়ে।

অতঃপর যথোচিত সময়ে সূর্যদেবের প্রসাদে কন্যাকালেই কুন্তী কনেকোজ্জ্বল কুণ্ডল ও বর্মধারী, সিংহনেত্র, বৃষস্কন্ধ এক পুত্র প্রসব করলেন এবং ধাত্রীর সংগে মন্ত্রণা করে এক মঞ্জুষার ভিতর পুত্রকে রেখে তা অশ্বনদীতে বিসর্জন দিলেন এবং পিতার ভয়ে ভীতা হয়ে শোকাকুল চিত্তে গৃহে ফিরে এলেন কিন্তু মাতৃ স্নেহাতুর মনটা পড়ে রইল ঐ ভাসমান মঞ্জুষার ভিতর।

দুর্বাসার আশীর্বাদ এইভাবে তাঁর জীবনে অভিশাপে রূপান্তরিত হল।

কুন্তীর ধাত্রী গোপনে সংবাদ এনে দিল যে, সূতপুত্র অধিরথ ও তার পত্নী রাধা সেই পুত্রকে পরম সমাদরে তাদের গৃহে নিয়ে গেছে এবং তাদের কোন সন্তান না থাকায় ঐ শিশুকে নিজ সন্তানের পরিচয়ে পরম স্নেহে মানুষ করছেন।

* * *

এই ঘটনার কিছুদিন পর কুন্তীভোজ কন্যার স্বয়ংবর অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন এবং মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশক্রমে পতি মনোনীত করতে পুষ্পমাল্য হস্তে সভামাঝে প্রবেশ করে পাণ্ডুকে পতিত্বে বরণ করলেন।

বেদবিধান অনুসারে পাণ্ডুর সংগে কুন্তীর বিবাহ হল এবং কুন্তীভোজ নানা ধন সম্পত্তি ও যৌতুক দিয়ে পাণ্ডুকে কন্যার সংগে স্বনগরে পাঠিয়ে দিলেন।

দীর্ঘ কয়েক বছর বেশ সুখেই অতিবাহিত হল কিন্তু দুঃখের বিষয় কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর ঔরসে কোন পুত্র জন্মাল না। তখন মহামতি ভীষ্ম মদ্ররাজ শল্যর ভগ্নী মাদ্রীর সংগে পাণ্ডুর বিবাহ দিলেন।

পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহে কুন্তীর মনে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হল না। মাদ্রীকে তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। বড় বোন যেমন ছোট বোনকে আগলে রাখে, ঠিক তেমনিভাবে তিনি তাকে স্নেহ ও মমতা দিয়ে বেঁধে ফেললেন।

* * *

একদিন মৃগয়া বিহারী মহীপাল পাণ্ডু মৃগের সন্ধানে মহারণ্যে ভ্রমণ করবার সময় এক মৃগকে মৃগীর সংগে ক্রীড়ারঙ্গে ব্যাপৃত থাকতে দেখে তাদের উপর পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করেন। ঐ মৃগ কিন্তু আসলে মৃগ নয়, এক ঋষিপুত্র। মৃগ বেশ ধরে অনুরূপ ক্রিয়ায় রত ছিলেন। পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ভূতলে পতিত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তিনি অভিশাপ দিলেন—তুমি যেমন আমাকে ভার্যার সংগে

অপবিত্র সময়ে বধ করলে, আমিও অভিশাপ দিচ্ছি অনুরূপ অপবিত্র সময়ে তোমার মৃত্যু হবে।

পাণ্ডু অতিশয় দুঃখাকুল চিত্তে ভার্যাদের কাছে এসে সব ঘটনা বলে বললেন—দেখ, আমার এখন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

স্বামীর বনবাসে একান্ত অভিলাষ জেনে কুন্তী বললেন—মহারাজ! সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়াও আরও এমন অনেক আশ্রম আছে যাতে সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করা যায়। আপনি তার ভিতর যে কোন আশ্রম আশ্রয় করে তপস্যা করুন। আমাদের দ্বারা আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। স্ত্রী হয়ে কখনও স্বামীর মৃত্যুর কারণ হব না। আর যদি আমাদের ফিরে যেতে বলেন, তবে আজই আপনার সামনে এ প্রাণ ত্যাগ করব।

—বেশ, যদি তোমাদের আমার সংগে বাস করে তপস্যা করতে নিতান্তই বাসনা হয়ে থাকে, তবে আজ থেকে গাছের বাকল পরবে, হরিণের চামড়ার আসনে বসবে, ফলমূল আহার করে তৃণ শয্যায় শয়ন করবে। কারও সংগে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারবে না।

কুন্তী অনুরূপ জীবন যাপনে স্বীকৃত হয়ে স্বামীর সংগে কঠোর ব্রহ্মচর্যের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন।

কিন্তু পাণ্ডুর মনে তাতেও শান্তি ফিরে এল না দেখে, একদিন কুন্তী তাঁকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, পাণ্ডু বললেন—কুন্তী, অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নেই। আমি অনপত্য, পিতৃলোকের ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারিনি। এজন্য আমার মন সর্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হচ্ছে।

একথা তিনি ঐ তপোবনের তাপসদেরও বললে তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তোমার দেবতুল্য পরম সুন্দর পুত্র হবে।

একথা শুনে আশান্বিত পাণ্ডু একদিন তার সাধ্বী যশোস্বিনী ধর্মপত্নী কুন্তীকে নির্জনে ডেকে বললেন—তুমি এই আপৎকালে পুত্র

উৎপাদনে ব্রতী হও। ধর্মবাদী পণ্ডিতগণ বলেছেন—অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠাতার কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির সফল হয় না। আমি সন্তানহীন আমার শুভলোক প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নেই। দেখ ধর্মশাস্ত্র মতে ছয় প্রকার বন্ধুদায়দ এবং ছয় প্রকার অবন্ধুদায়দ পুত্র আছে।

—কি রূপ? কুন্তী প্রশ্ন করে।

—তবে শোন। (১) স্বয়ংজাত। (২) প্রণীত। (৩) পরিক্রীত। (৪) পৌনর্ভব। (৫) কানীন। (৬) স্বৈরনীজ। (৭) দত্ত। (৮) ক্রীত। (৯) কৃত্রিম। (১০) সহোঢ়। (১১) জ্ঞাতিরেতাঃ। (১২) হীনযোনিধৃত।

এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে স্বয়ংজাতভাবে প্রণীত তার অভাবে পরিক্রীত, তার অভাবে পৌনর্ভব ইত্যাদিক্রমে পুত্র উৎপাদন শাস্ত্রসম্মত। এ ছাড়া আপৎকাল উপস্থিত হলে দেবর দ্বারাও পুত্র উৎপাদন করা যায়। আর স্বয়ম্ভু মনু বলেছেন, ঔরসজাত পুত্রের চেয়ে প্রণীত পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মফলপ্রদ। কুন্তী! আমি স্বয়ং পুত্র উৎপাদনে অসমর্থ। অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ জাতি দ্বারা পুত্র উৎপাদন করতে অনুজ্ঞা করছি। দেখ পূর্বে শরদণ্ডায়ন তার নিজের পত্নীকে পুত্র উৎপাদনে নিযুক্ত করেছিলেন। তুমিও আমার নিয়োগ অনুসারে কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্র উৎপাদনে ব্রতী হও।

স্বামীর কথা শুনে নিতান্ত ব্যথিত হয়ে পতিপ্রাণা পৃথা বললেন—ধর্মাত্মন! আমি তোমার ধর্মপত্নী। বিষেশতঃ তোমাতেই অনুরক্ত। সে ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রস্তাব অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত।

—কুন্তী! পুরাকালে মহিলারা অনাবৃত ছিল। তারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করতে পারত। তাদের কারও অধীনতায় কালক্ষেপ করতে হোত না। এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে আসক্ত হলেও তাদের অধর্ম বলে মনে হোত না। কারণ অনুরূপ আচরণই ধর্ম বলে প্রচলিত ছিল।

মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু একদিন সায়াহ্নে তাঁর মাতাকে অন্য এক ঋষিপুত্রের সংগে চলে যেতে দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন।

পুত্রের মনোভাব বুঝতে পেরে উদ্দালক বললেন—বৎস! রাগ কর না। এটাই নিত্যধর্ম। গাভীদের মত স্ত্রীগণও শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও অধর্ম হয় না।

শ্বেতকেতুর ক্রোধ এতে কিছুমাত্র প্রশমিত হল না। তিনি তাঁর মাকে বাধা দিলেন এবং ঘোষণা করলেন—আজ থেকে যে স্ত্রী পতি ভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করবে এবং যে পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হবে তাদের উভয়েরই ভ্রূণহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হতে হবে। আর স্বামী পুত্র উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করলে যে স্ত্রী তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে তারও পাপ হবে।

সেই থেকে এই বিবাহ প্রথা সুরু হল। এই রীতি অনুযায়ী কল্মাষপদ রাজার পত্নী মদয়ন্তী স্বামীর দ্বারা প্রেরিত হয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে পতির প্রিয় কামনায় তাঁর ঔরসে অশনকের জন্ম দিয়েছিলেন। তাছাড়া মহর্ষি বেদব্যাস পিতার ক্ষেত্রে আমাদের উৎপাদন করেছেন। বেদবিৎ মহাত্মারা বলে গেছেন ঋতুকালে পতি পরিত্যাগপূর্বক পুরুষান্তর সংসর্গ করলেই স্ত্রীদের অধর্ম হয়। কিন্তু অন্য সময়ে তারা যথাযথ ব্যবহার করতে পারে। তাতে তাদের কোন পাপ নেই। তাছাড়া তাঁরা আরও বলে গেছেন, স্বামী স্ত্রীকে যে আজ্ঞা করবেন, ধর্মই হোক বা অধর্মই হোক নারীকে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। অতএব আমার বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার অনুচিত। বিশেষতঃ তুমি জান যে, আমি পুত্র উৎপাদনে অসমর্থ। এজন্য আমি তোমায় অনুরোধ করছি, ব্যাসদেব যেমন পিতার ক্ষেত্রে আমাদের জন্ম দিয়েছেন, তুমিও তেমনি কোন সদ্ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে অশেষ গুণসম্পন্ন পুত্র উৎপাদনে ব্রতী হও।

পতিব্রতা কুন্তী পতির বাক্য লঙ্ঘন করতে না পেরে ধর্ম রক্ষার্থে রাজাকে সম্বোধন করে বললেন—মহারাজ, পিতৃগৃহে দেবর্ষি দুর্বাসাকে

সেবায় পরিতুষ্ট করে আমি একটি বর পেয়েছিলাম। সেই বরে তিনি আমায় একটি মন্ত্র দিয়েছিলেন। সেই মন্ত্র পাঠ করে আমি যে কোন দেবতাকে আহবান করলে তিনি আমার অভিলাষ পূরণ করবেন। এখন আপনি বলুন, আমি কোন্ দেবতাকে আহ্বান করব ?

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীর কথা শুনে সাতিশয় উৎফুল্ল হয়ে বললেন—কুন্তি! দেবতাদের মধ্যে ধর্মই সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি তাঁকেই আহ্বান কর। এতে আমাদের ধর্ম কোন অধর্মের সংগে যুক্ত হবে না এবং লোকে একেই ধর্ম বলে স্বীকার করবে। ধর্মদত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্মিক হবে এবং কখনও অধর্মে প্রবৃত্ত হবে না।

অতঃপর কুন্তী স্বামীর আদেশে মন্ত্র পাঠ করে ধর্মকে আহ্বান করলেন। মন্ত্রের প্রভাবে ধর্মের আবির্ভাব হল এবং তিনি কুন্তীর অভীষ্ট সাধনে তৎপর হলেন। এর ফলে জন্ম নিল পরম ধর্মিক, বিক্রমশালী, সত্যবাদী যশস্বী যুধিষ্ঠির।

এরপর বেশ কিছুদিন গত হলে পাণ্ডু আবার কুন্তীকে ডেকে বললেন—প্রিয়ে! ক্ষত্রিয় কুলে ধার্মিকের চেয়ে বলবান ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয়। অতএব তুমি আর একটি অমিত বলশালী পুত্র উৎপাদন কর।

কুন্তী এবার স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালনার্থে মহর্ষি দত্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক পবনকে আহ্বান করলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত পবন তৎক্ষণাৎ মৃগারূঢ় হয়ে কুন্তীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর অভীষ্ট সাধনে ব্রতী হলেন। ফলস্বরূপ অতীব বলশালী ভীমের জন্ম হল।

এর কিছুদিন পর সর্বলোক শ্রেষ্ঠ পুত্রের আশায় পাণ্ডু কুন্তীকে ইন্দ্রের আরাধনায় লিপ্ত হতে বললেন।

কুন্তী স্বামীর ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রকে আহ্বান করলে তিনি তাঁর সংগে মিলিত হলেন এবং তার ফলে ত্রিলোকবিক্রান্ত, গো ব্রাহ্মণ হিতকারী, সুহৃদগণের আনন্দবর্ধন ও শত্রুদিগের হৃদয় বিদারক অর্জুনের জন্ম হল।

অর্জুনের জন্ম হলে রাজর্ষি পাণ্ডু আর এক পুত্রের কামনায় কুন্তীর কাছে প্রার্থনা জানালে কুন্তী বললেন—মহাত্মন! আর আমাকে পুরুষান্তর সংসর্গের জন্য অনুরোধ করবেন না। কারণ সেটা অশাস্ত্রীয়। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—স্ত্রীলোক আপৎকাল উপস্থিত হলে তিনবার পর্যন্ত পর পুরুষ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করতে পারে। যে নারী চারবার পর পুরুষের সংগে সংসর্গ করে তাকে স্বৈরিনী বলে, পাঁচবার অনুরূপ কর্মে লিপ্ত হলে গণিকা বলে গণ্য হয়। অতএব ধর্মজ্ঞ হয়ে কেন তুমি আবার আমাকে পুত্র উৎপাদনে ব্রতী হতে বলছো?

অগত্যা পাণ্ডু তাব আদেশ প্রত্যাহার করলেন কিন্তু পরে মাদ্রী তাকে একদিন একান্তে পেয়ে বললেন—মহারাজ! আপনি যদি কুন্তীকে বলেন তবে আমি তার কৃপায় পুত্রবতী হতে পারি।

মাদ্রীর কথায় পরম প্রীত হয়ে পাণ্ডু কুন্তীকে পরম সমাদরে কাছে ডেকে বললেন—প্রিয়ে! তুমি পুত্রবতী হলে আর মাদ্রী হতে পারল না এই বেদনা তাকে পীড়া দিচ্ছে। তুমি ইচ্ছে করলে তার পুত্র হতে পারে—আর আমিও অধিক সন্তানের পিতা হতে পারি।

সপত্নীদের প্রতিটি রমণী ঈর্ষা করে, তাদের ক্ষতি হলে আনন্দ পায়। কিন্তু কুন্তীর অন্তরে ঈর্ষা নামক রিপুর স্থান ছিল না। তিনি স্বামীর বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে মাদ্রীর কাছে গিয়ে বললেন—মাদ্রী, আমি মন্ত্র জপছি। তুমি পুত্র উৎপাদনার্থে তোমার মনোনীত দেবতাকে স্মরণ কর।

মাদ্রী অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করলেন। অতঃপর অশ্বিনীকুমার যুগলের সংসর্গে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব দুটি যমজ পুত্র জন্মাল।

কুন্তীই কিন্তু ঐ পাঁচ পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন।

এই সময় এক মনোরম পরিবেশে বসন্ত ঋতুতে পাণ্ডু সংযম হারিয়ে ঋষি শাপকে অগ্রাহ্য করে মাদ্রীতে উপরত হতে গেলে মৃত্যুমুখে

পতিত হন। মাদ্রী তাঁর সন্তানদেরও ভার তার সপত্নী দিদি কুন্তীর পরে অর্পণ করে স্বামীর সংগে সহমরণে যান। বিধবা কুন্তী নাবালক পাঁচ পুত্র নিয়ে হস্তিনায় ফিরে আসেন। সুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।

* * *

লোকের অপবাদ, নিন্দা সব হাসিমুখে সহ্য করে পুত্রবৎসলা কুন্তীর জীবন অতিবাহিত হতে লাগল।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে পুত্রবৎসলা কুন্তীর মাতৃস্নেহ তখন কোথায় ছিল, যখন তিনি কর্ণকে ত্যাগ করেছিলেন? তিনি তাকে কি করে বিস্মৃত হলেন?

না তিনি বিস্মৃত হননি। কর্ণকে তিনি সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যে পাননি। মন্ত্রের পরীক্ষা করতে গিয়ে সূর্যের ছলনায় লালসার শিকার হতে হয়েছে তাঁকে! দেবতাকে রুষ্ট করলে যদি পাপ হয়! যদি তিনি কোন কঠিন অভিশাপ দেন। এই দেব ভক্তি এবং ভয়ের জন্য তাঁকে সূর্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। কিন্তু সূর্যকে ভুলে গেলেও মা হয়ে সন্তানকে তিনি ভোলেননি।

তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর অর্জুনের সংগে প্রতিদ্ব-ন্দ্বিতায় লিপ্ত হতে কর্ণ যখন হস্তিনার রাজপুত্রদের রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুশলী কৃপাচার্য যখন কর্ণকে বললেন—কর্ণ কুন্তীগর্ভজাত পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন তোমার সংগে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু তোমার বংশ পরিচয় না জানতে পারলে তো সে তোমার সংগে অস্ত্র পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। অজ্ঞাতকুলশীলের সংগে রাজকুমারেরা কখনও যুদ্ধ করেন না।

—আমি সূতপুত্র। আমার পিতা অধিরথ। মাতা রাধা। গর্বভরে কর্ণ বংশ পরিচয় দিলেন।

—সূতপুত্র হয়ে চাও ক্ষত্রিয়ের সংগে অস্ত্র পরীক্ষা দিতে? যাও, এ রণভূমি তোমার জন্য নয়।

হেট মাথা করে ম্লান মুখে কর্ণ রণভূমি পরিত্যাগ করলেন। তখনই রাজ অন্তঃপুরে মহিলা মহলে মূর্চ্ছা গেলেন অর্জুন জননী কুন্তী।

কেন? কারণ তিনি মা। মা সব সইতে পারেন। কিন্তু গর্ভজাত সন্তানের লাঞ্ছনা—অপমান সইতে পারেন না। কুন্তী কর্ণের কবচকুণ্ডল দেখেই চিনেছিলেন। কত বিনিদ্র রজনী তিনি কাটিয়েছেন ঐ পুত্রের মুখ দেখার বাসনা নিয়ে। আজ কতদিন পরে তাকে দেখলেন ম্লান মুখে লাঞ্ছিত হতে। মাতা কুন্তী অন্তরের বেদনাকে অন্তরে চেপে রাখতে গিয়ে জ্ঞান হারালেন। পারলেন না সামাজিক স্বীকৃতি দিতে তাকে। এযে কি বেদনা, তা শুধু মায়েরাই জানেন। কুন্তীকে দোষারোপ করে বহু কবি-সাহিত্যিক কাব্য নাটক লিখেছেন। কিন্তু মাতা কুন্তীর অন্তরের বেদনার স্বীকৃতি তাতে নেই।

* * *

দুষ্টমতি কুরুপতি দুর্যোধনের পাণ্ডুর পুত্রদের বিনাশ করে তাদের সর্বস্ব গ্রাস করার চেষ্টার অন্ত ছিল না। দুর্যোধন ভীমকেই সর্বাধিক ভয় করত। তাই একবার তাকে খাবারের ভিতর বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। ভীম পাতালে তলিয়ে গিয়েও ভাগ্যচক্রে অযুত হাতির বল নিয়ে ফিরে আসেন।

আর একবার এদের পুড়িয়ে মারার সংকল্প নিয়ে বারণাবতে মাটির সংগে প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, তৈল, চর্বি ও লাক্ষা দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ করান। তার চারদিকে শণ, তৈল ঘৃত জতু কাষ্ঠ প্রভৃতি যা আগুনে সহজে পোড়ে এমন জিনিষ রেখে দিয়েছিলেন এবং স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র দুরাত্মা দুর্যোধনের কথায় পাণ্ডবদের সেখানে গিয়ে বসবাস করতে বললেন।

পাণ্ডবরা ঐ জতুগৃহে পৌঁছবার সংগে সংগে বিদুর ঐ গভীর ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে লোক পাঠিয়ে ওদের সব জ্ঞাত করায়। ঘরের ভিতর থেকে সুড়ঙ্গ করে ভীমের সহায়তায় কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব

পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। ভীম তার মাকে কাঁধে, নকুল ও সহদেবকে কোলে এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জুনকে বগলে চেপে নিয়ে পবন বেগে বেরিয়ে যান।

বাইরে বেরিয়ে গঙ্গা পার হয়ে তাঁরা ও রাজ্য ত্যাগ করেন। তাঁরা তপস্বী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আশ্রয় নেন এক ব্রাহ্মণের কুটিরে।

মাকে গৃহে রেখে ওরা পাঁচভাই ভিক্ষায় বের হতেন। দিনান্তে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য সকলে ভাগ করে খেতেন। রাজনন্দিনী, রাজমহিষী কুন্তী এত কষ্ট সহ্য করেও পুত্রদের হিংস্র হতে দেননি। তাদের প্রাপ্য পেতে ধর্মের পথে ধৈর্য ধরে সৎ থাকার উপদেশ দিতেন।

* * *

সেই সময় একদিন কুন্তী ঐ ব্রাহ্মণের কুটীরের ভিতর কান্না শুনতে পেলেম। ভীম ছাড়া সেদিন বাড়ীতে আর কেউ ছিলেন না। ভীম তার মাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতে ব্রাহ্মণের গৃহাভ্যন্তরে পাঠালেন।

ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কুন্তী দেখতে পেলেন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও তাদের একটি কন্যা সকলেই কাঁদছেন।

কুন্তী তাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে বললেন—আপনারা আপনাদের কান্নার কারণ বলুন, আমি সাধ্যমত আপনাদের সাহায্য করব।

কুন্তীর মধুমাখা স্বর ব্রাহ্মণের অন্তর স্পর্শ করল। তিনি বললেন—মা, দুঃখীর দুঃখ মোচনের দায়িত্ব মহতেরা গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু আজ আমরা যে দুঃখে পড়ে কাঁদছি তা দূর করা মানুষের অসাধ্য।

—তবুও আপনি বলুন। কুন্তী আগ্রহ দেখালেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—এই নগরের বর্তমান অধীশ্বর বক রাক্ষস। তার প্রভাবে চোর ডাকাত হিংস্র প্রাণী থেকে আমাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু সে নিজেই যে নরখাদক। সে নিয়ম করে দিয়েছে যে, প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে একটি গৃহ থেকে একটি মানুষ, বিশজন খেতে পারে এমন

অন্ন ও দুটো মহিষ নিয়ে তার কাছে যাবে। আজ আমাদের পালা। আমাদের কাছে এমন পয়সা নেই যে, চাল মহিষ বা একজন মানুষ ক্রয় করি, আবার নিজেদের আত্মীয়দেরও পাঠাতে ইচ্ছা করে না। তাই আমাদের মধ্যে কে যাবে তাই নিয়ে কান্নাকাটি করছি।

পরহিতার্থে পরোপকারী সাধ্বী কুন্তীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—আপনি বক রাক্ষসের ভয়ে ভীত হবেন না। আজ আপনাদের হয়ে আমার পুত্র ভীম বক রাক্ষসের কাছে যাবে।

—তা কি করে হবে? আপনারা একে ব্রাহ্মণ—তাতে আবার আমার অতিথি। অতি অভদ্র অধার্মিকও তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্রাহ্মণের প্রাণনাশে ব্রতী হয় না। ব্রাহ্মণের বিনিময়ে নিজের প্রাণ পাওয়া অপেক্ষা নিজের প্রাণ দেওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ। পণ্ডিতেরা গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলে নিন্দা করে থাকেন। আমি স্ত্রীর সংগে নিজে রাক্ষসের হাতে প্রাণ দেব, তবুও শরণাগত অতিথি ব্রাহ্মণ বধের পাপে লিপ্ত হব না।

—দেখুন, আপানার কথা যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম সম্মত। কিন্তু আমি মা হয়েও নিজের সন্তানকে এই বিপদের মধ্যে পাঠাচ্ছি, কারণ আমি জানি, অমন শত রাক্ষসও আমার পুত্রের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কারণ, সে অত্যন্ত বলশালী, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ।

অতঃপর ব্রাহ্মণের অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি ভীমকে বক রাক্ষসের কাছে প্রেরণ করলেন।

মা হয়ে পর হিতার্থে কজন এমন ভাবে নিজের সন্তানকেও বিপদের মুখে পাঠাতে পারে?

এদিকে ভিক্ষা শেষে বাড়ী ফিরে ভাইকে দেখতে না পেয়ে, সে কোথায় কি কাজে গেছে তা জানতে পেরে যুধিষ্ঠির মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—মা, ভীম কি স্ব ইচ্ছায় এই দুঃসাহসিক কাজে ব্রতী হয়েছে, না আপনি তাকে এই বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন?

কুন্তী মৃদু হেসে বললেন—বাবা যুধিষ্ঠির, ভীম আমার আদেশে

ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য, নগরবাসীর হিত সাধনের জন্য এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে।

—মা, আপনি কিন্তু একাজটা ভালো করেননি। কি হেতু পরের জন্য আপনি নিজের ছেলেকে পাঠালেন? দেখুন, ভীম আমাদের বল-বীর্য ও সাহস। ওর ভরশায় আমরা সুখে আছি। জতুগৃহ থেকে ওর জন্য আমরা রক্ষা পেয়েছি। ওর দ্বারাই আমরা হৃতরাজ্য ফিরে পাবার আশা রাখি। আর আজ আপনি তাকেই পাঠালেন মৃত্যুর মুখে। আমার মনে হয় দুরবস্থায় পড়ে আপনার বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে।

পুত্রের ক্রোধেও কুন্তীর মনে কোনরূপ রেখাপাত করল না। স্বভাবসুলভ কণ্ঠে তিনি বললেন—যুধিষ্ঠির তুমি বৃথা রাগ করছো। মনে কর না, বিপদে পড়ে আমি জ্ঞান হারা হয়েছি। দেখ, আমরা এই ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে সুখেই আছি। দুর্যোধন এর বিন্দু বিসার্গও জানে না। এই ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট সংস্কার ও সম্মান করেন। এই পরোপকারক ব্রাহ্মণের হিতার্থেই আমি একাজে ব্রতী হয়েছি। আর তাছাড়া আমি মা, আমি জানি আমার ভীম কতখানি শক্তিধর। শত বক রাক্ষসও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর এই রাক্ষস নিধনে দুটি মহৎ কাজ হবে। প্রথমতঃ আশ্রয়দাতার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয়তঃ ধর্মানুষ্ঠান, শাস্ত্রে কথিত আছে যে ক্ষত্রিয় কার্যকালে ব্রাহ্মণকে সাহায্য করে সে শুভলোক প্রাপ্ত হয়। যে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের প্রাণ রক্ষা করে সে ইহকালে ও পরকালে মহতী কীর্তিলাভ করে। যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাহায্য করে, সে সর্বলোকের প্রিয় হয় এবং যে ক্ষত্রিয় শরণাগত শূদ্রকে বিপদ থেকে রক্ষা করে সে রাজপূজিত ক্ষত্রিয় কুলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। অতএব যুধিষ্ঠির, এসব জেনেই আমি এ কাজে ব্রতী হয়েছি।

যুধিষ্ঠির মায়ের কর্তব্য, পরোপকার প্রবৃত্তি ও ধর্মীয় জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন এবং মায়ের প্রতি বৃথা দোষারোপ করে যে অন্যায় করেছেন, তার জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

পরোপকারী, সেবা পরায়ণা, সাধ্বী কুন্তীর জন্য ব্রাহ্মণ পরিবার রক্ষা পেলেন, নগরবাসী বাঁচলেন, বক রাক্ষসকে মেরে ভীমও আর একবার তার মহাবলশালীর আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

● ● ●

মহামতি ধর্মপরায়ণ বিদুরের প্রচেষ্টায় ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম আবার পাণ্ডবদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে নতুন রাজধানী স্থাপন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন সুখে রাজত্ব করছিলেন, তখন চক্রান্তকারী দুর্যোধনের মাতুল শকুনির সহায়তায় পাশা খেলে যুধিষ্ঠির রাজ্যধন সব হারান। এমন কি স্ত্রী দ্রৌপদীকে পর্যন্ত প্রকাশ্য রাজসভায় অপমান করা হয়। বারো বছরের জন্য দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডবকে বনে যেতে হয়। এক বছর তারা অজ্ঞাত বাসে কাল কাটান। কুন্তী অবশ্য ধর্ম রক্ষার্থে দ্রৌপদীর পুত্রদের নিয়ে রাজ্যে থেকে যান।

যে প্রাণাধিক পুত্রদের ফেলে তিনি স্বামীর সংগে সহমরণে যাননি, তাদের বনবাসে পাঠিয়ে তিনি যে কি মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে জীবন যাপন করছিলেন তা বোঝা যায় কৃষ্ণের কাছে তাঁর উক্তিতে। এখানে মাতৃগর্বে গর্বিতা কুন্তীর স্বরূপ ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর গুণবান পুত্রদের কুশল জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তাদের চরিত্রও বিশ্লেষণ করেছেন।

—কৃষ্ণ! যারা বাল্যাবধি গুরুশুশ্রূষায় নিয়োজিত, যাদের পরস্পরের সৌহার্দ্য কখনও বিনষ্ট হয় না, যাদের চিত্তবৃত্তি বিভিন্ন নয়, যারা শত্রুদের শঠতায় রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে নির্জনে গমন করেছিল, ক্রোধ ও হর্ষ যাদের বশীভূত. আমি রোদন করলেও যারা আমাকে পরিত্যাগ করে অরণ্যে গিয়ে আমার হৃদয় অতিশয় উৎকণ্ঠিত করেছিল, সেই দেবপরায়ণ পাণ্ডবগণ কিরূপে সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল মহারণ্যে বাস করেছিলেন? তারা বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়েছে, কেবল আমিই তাদের লালন-পালন করেছি। পিতামাতা উভয়কে দেখতে না পেয়ে তারা কিরূপে দিন যাপন করেছিল?

যে মহাত্মা একান্ত সত্যপরায়ণ, লজ্জাশীল, দয়াপর। কাম ক্রোধ যার বশীভূত। যে ধর্মাত্মা সতত সাধুলোকের পদবীতেই পদার্পণ

করে থাকে এবং অম্বরীষ, মান্ধাতা, যযাতি, নহুশ, ভরত, দিলীপ, শিবি প্রভৃতি পূর্বতন ভূপতিগণের ভার গ্রহণ ও বহন করে আসছে, যে ধর্মজ্ঞ শাস্ত্র প্রভাবে সমগ্র কৌরব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ত্রিলোকের আধিপত্য লাভের উপযুক্ত পাত্র, সেই বিশুদ্ধ কাঞ্চনবর্ণ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এখন কেমন আছে?

যে বীর অযুত মাতঙ্গতুল্য বলশালী, যে সব সময় ভ্রাতাদের প্রিয় অনুষ্ঠান করে থাকে, যে বীর মহাবাহু কীচক, উপকীচকগণ ও বককে বধ করেছে, যার পরাক্রম ইন্দ্রের তুল্য, ক্রোধ মহেশ্বর তুল্য, যে অরাতি নিপাতন ক্রোধ স্বভাব হয়েও রণ সংবরণ পূর্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনানুবর্তী হয়ে থাকে, সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহাবাহু, তেজোরাশি ভীম এখন কেমন আছে?

যে বীর দ্বিবাহু হয়েও সহস্রবাহু অর্জুনের চেয়ে বড়, যে বীর একবারে পঞ্চশত বাণ নিক্ষেপ করতে পারে, যে মহাবাহু অস্ত্রশস্ত্রে কার্তবীর্য অর্জুনের সমকক্ষ। যে বীর তেজে আদিত্য তুল্য, দমে মহর্ষি তুল্য, ক্ষমায় পৃথিবী তুল্য, বিক্রমে মহেন্দ্র তুল্য। যে বীর সমুদয় ভূপতিগণের উপর কৌরবদের আধিপত্য সংস্থাপন করেছে, পাণ্ডবগণ যার বাহুবলের পরে ভরসা রেখে কালাতিপাত করছে, যার সঙ্গে সংগ্রাম করে কেউই জীবিত অবস্থায় ফিরে যায় না সেই সর্বভূত জয়ী পাণ্ডব ভ্রাতা, তোমার ভ্রাতা ও সখা অর্জুন এখন কেমন আছে?

যে সুকুমার যুবা সর্বভূতে দয়াবান, লজ্জাশীল, অস্ত্রবিদ ধার্মিক, সভ্য, ভ্রাতৃগণের শুশ্রূষা ও আমার একান্ত প্রিয় অন্যান্য পাণ্ডবগণ যার চরিত্রের প্রসংশায় পঞ্চমুখ, যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথার অবাধ্য না হয়ে সতত তাকে অনুসরণ করে, সেই সহদেব এখন কেমন আছে?

যে প্রিয়দর্শন যুবক ভ্রাতৃগণের প্রাণস্বরূপ, যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ, আমি যাকে বাল্যাবধি সুখে বর্ধিত করেছি সেই সুকুমার নকুল ভালো আছে তো? আমি বহুদিন ভেবেছি আমার কোলের ছেলে নকুল-সহদেবকে না দেখে আমি কি করে বেঁচে আছি?

কুলীনা, অসামান্যা, যে আমার কাছে আমার পুত্রদের চেয়েও প্রিয়,

যে পুত্র সহবাস অপেক্ষা পতি সহবাস শ্লাঘ্য জ্ঞান করে, সেই দ্রৌপদী ভালো আছে তো ?

কৃষ্ণের মুখে তাদের কুশল শুনে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের রজ্জুতে বদ্ধ সাধ্বী কুন্তী পুত্রদের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ দিলেন তা কুসুম কোমল নয়—ধর্মীয় প্রেরণা প্রসূত।

—কেশব, আমি পুত্রদের অদর্শনে যে রূপ শোকাবিষ্ট হয়েছি, বৈধব্য, অর্থনাশ ও জ্ঞাতিগণের সংগে শত্রুতাতেও সেরূপ শোকাকুল হইনি। আজ চোদ্দ বছর হল আমি ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির, সমস্ত অস্ত্রবিদগণের অগ্রণী অর্জুন, মহাবীর ভীম ও নকুল-সহদেবকে দেখিনি। যা হোক তুমি যুধিষ্ঠিরকে বলবে সে যেন সত্যভ্রষ্ট না হয়। কারণ তা হলে তার ধর্মনাশ হবে। দেখ যে নারী পরাধীন হয়েও জীবন ধারণ করে তাকে ধিক—আবার দীনতা অবলম্বন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করলে মহতী অপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়। অতএব তুমি ভীম ও অর্জুনকে বলবে, ক্ষত্রিয়কন্যা যে জন্য গর্ভধারণ করে, তার সময় উপস্থিত হয়েছে। অতএব যদি এই সময় তোমরা তার বিপরীত আচরণ কর, তাহলে অতি ঘৃণ্যকর কর্মের অনুষ্ঠান করা হবে। আর তারা যদি ক্ষত্রিয় হয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্রতী না হয়, তাদের পিতৃপুরুষের উপার্জিত স্বাধিকার অর্জনে অস্ত্র না ধরে তাহলে চিরকালের জন্য আমি তাদের ত্যাগ করব। নকুল ও সহদেবকে বলবে তারা যেন বিক্রমার্জিত সম্পত্তি প্রাণের চেয়ে প্রিয় বলে জ্ঞান করে। কারণ বিক্রমার্জিত অর্থই ক্ষত্রিয়ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদন করে থাকে।

—জনার্দন! তুমি অর্জুনকে দ্রৌপদীর মতানুসারে কাজ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করবে। তুমি তো জান, ভীম ও অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে দেবতাদেরও সংহার করতে পারে। ক্ষাত্রধর্মনিরতা দ্রুপদনন্দিনী অনাথা না হয়েও অনাথের মত রজঃস্বলা অবস্থায় সভা মধ্যে আনীত হয়ে বিবিধ পুরুষের শ্লেষ ও কদর্য কথা শুনেছেন শুনে আমি যতটা দুঃখ পেয়েছি, দ্যূতে পরাজয়, রাজ্যহরণ ও পুত্রদের নির্বাসনেও আমি

ততটা দুঃখিত হইনি। আমি পুত্রবতী। তুমি বলদেব, মহারথ ও প্রদ্যুম্ন আমার সহায়। ভীম ও অর্জুন আজও জীবিত আছে। তবে কেন আমাকে আজও এত দুঃখ সইতে হচ্ছে? কবে ওরা ওদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করবে?

কুন্তীর কথা শেষে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বাসুদেব বললেন—আপনার তুল্য মহীয়সী মহিষী আর কে আছে? আপনি শূরসেন রাজার দুহিতা, এখন আজমীর কুলের প্রদীপিকা। আপনার স্বামী সবসময় আপনাকে সম্মান করতেন। আপনি বীরমাতা, বীরপত্নী, সর্বগুণসম্পন্না। আবশ্যক হলে আপনার মত কামিনীগণকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করতে হয়। যুধিষ্ঠিরসহ পঞ্চভ্রাতা আপনার অনুমতি চেয়েছিলেন তারা তাদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবে কিনা? অনুমতি মিলল। তারা আপনার বাধ্য ও অনুরক্ত সন্তান। আপনি অচিরাৎ তাঁদের শত্রু বিনাশ করে আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করতে দেখবেন।

* * *

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ অনিবার্য এবং তাতে উৎসাহ জুগিয়ে পুত্রদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে কুন্তীর মানস পটে ভেসে উঠলো আর এক পুত্রের মুখ। যিনি কর্ণ।

কৌরবদের পক্ষে থাকলে কর্ণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর যদি কর্ণকে সত্যপরিচয় দিয়ে তাকে পাণ্ডবদের দলে আনা যায়, তবে পাণ্ডবদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং পুত্রেরও প্রাণ বাঁচবে। একথা চিন্তা করে কুন্তী লোকলজ্জা ও রাজমাতার সম্ভ্রম ত্যাগ করে আত্মপরিচয় দিতে হাজির হলেন ভাগীরথী তীরে, যেখানে কর্ণ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বেদপাঠ করছেন।

সূর্যদেব সবে বনানীর আড়ালে আত্মগোপন করেছেন। তার রক্তিম আভায় আলোকিত হয়েছে অরণ্যভূমি; তার লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে কুন্তীর মুখমণ্ডলে। সেদিকে চেয়ে কর্ণ জিজ্ঞেস করলেন—রাজমাতা অর্জুন জননী! রাধা গর্ভজাত, অধিরথের

ঔরসজাত কর্ণের অভিবাদন গ্রহণ করুন। এখন বলুন, রাজমাতা হয়ে এই দীন সেবকের কাছে এই নির্জনে কেন এসেছেন? আজ্ঞা করুন, আমায় কি করতে হবে?

—বৎস কর্ণ! আজ আমি এ নির্জনে তোমাকে তোমার সত্য পরিচয় দিতে এসেছি।

—থাক রাজমাতা যদি আমার এই পরিচয়ের মধ্যে কোন মিথ্যা লুক্কায়িত থাকে তবে তাই থাকুক।

—না বৎস, আজ আমাকে বলতেই হবে। না বললে মহা অনর্থ ঘটে যাবে। তুমি আমার গর্ভসম্ভূত পুত্র রাধা গর্ভসম্ভূত নও। অধিরথও তোমার পিতা নয়। সূতকুলেও তুমি জন্মগ্রহণ করনি। তুমি আমার কুমারীকালীন পুত্র। আমি কন্যাবস্থায় সর্বাগ্রে আমার পিত্রালয় কুন্তীভোজের আলয়ে তোমাকে প্রসব করেছিলাম। ভগবান সূর্যদেব তোমার পিতা। তোমার ঐ কবচকুণ্ডল তোমার পিতার কাছ থেকে আমিই তোমার জন্য কামনা করেছিলাম। দেখ, তুমি আমার গৃহে, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্বক মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সংগে সৌহার্দ্য না করে এখন যে দুর্যোধনের সেবা করছো এটা কি তোমার করনীয় কর্তব্যবোধের পরিচায়ক? মহাত্মাগণ বলেছেন—পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের ধর্ম। তুমি তো জান, মহাবীর অর্জুন পূর্বে যুধিষ্ঠিরের জন্য যে সম্পত্তি আহরণ করেছিল, দুর্যোধন তা ছলপূর্বক অপহরণ করেছে। তুমি তার কাছ থেকে তা কেড়ে নিয়ে ভোগ কর। আজ কৌরবগণ রণস্থলে কর্ণ ও অর্জুনকে এক সংগে দেখুক। তোমাদের সৌভ্রাত্র দেখে অবনত হোক। কর্ণ, অর্জুন ও তুমি, কৃষ্ণ ও বলদেব তুল্য। তোমরা একত্র হলে বিশ্বের কোন কার্য না সম্পাদন করতে পার! কর্ণ তুমি তোমার নিজের পাঁচ ভাইয়ের সংগে মিলিত হলে মহাযজ্ঞে বেদীর উপরিস্থ দেবগণ পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাবে। তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অগ্রজ ও পৃথাকৃত, অতএব তুমি সূতপুত্র এটা ভুলে আর্যপুত্রের স্বীকৃতি গ্রহণ করে

পাতা মুড়িবেন না।

কৌরব পক্ষ ত্যাগ করে পাণ্ডবদের সহায়তা করবে এই আশায় বুক বেঁধে তোমার কাছে এসেছি।

পিতৃপরিচয়, বংশগৌরব, যুদ্ধ জয়ের এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রলোভন কর্ণের মনে কোন দাগ কাটতে পারল না। তিনি অবিচলিত কণ্ঠে বললেন—পাণ্ডব জননী! দেখুন, আপনার কথামত কাজ করলে আমার ধর্ম হানি হবে। আপনার জন্যই আজ আমি জাতিচ্যুত হয়েছি। আপনি সেই সময় আমায় ত্যাগ করে নিতান্ত হীন মনো-বৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। আমি দেব সন্তান। জন্মগ্রহণ করেছিলাম ক্ষত্রিয়কুলে, কিন্তু আপনার জন্যই আজ আমার শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কার অন্য পথে পরিচালিত হয়েছে। অতএব আপনার চেয়ে বড় শত্রু এখন তো আর কাউকে দেখছি না। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করে যে ক্ষতি করেছেন, এতবড় ক্ষতি আমার আর কোন শত্রুই করতে পারবে না। আপনি পূর্বে আমার সংগে মাতার মত আচরণ না করে, এখন আমাকে আপনার কার্যসাধনে অনুরোধ করছেন। আপনি পূর্বে মাতার ন্যায় আমার হিত চেষ্টা না করে এখন স্বীয় হিত বাসনায় আমায় পুত্র বলে সম্বোধন করছেন।

দেখুন, কৃষ্ণের সংগে অর্জুনকে দেখলে যে কোন ব্যক্তি ভীত হয়। অতএব আজ যদি আমি পাণ্ডবদের পক্ষে যাই, তখন ক্ষত্রিয় সমাজ আমাকে কি বলবে? আজ পর্যন্ত কেউই আমাকে পাণ্ডবদের ভ্রাতা বলে জানে না। আজ যদি সেই পরিচয়ে তাদের পক্ষ নেই, তবে লোকে বলবে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে আমি একাজ করেছি। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা আমাকে সমস্ত রকম ভোগ্য ও সুখ দিয়েছেন। রাজ্য দিয়ে রাজা করেছেন। আমার বাহুবলের পরে নির্ভর করে তারা সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করার প্রত্যাশা করেন। আমি এতদিন যাদের আশ্রয়ে আছি, আজ কি করে তাদের সেই আশায় ছাই দেব? যারা আমাকে আশ্রয় করে অপার সমরসাগর পার হবার আশা রাখে, তাদের কি করে আমি ত্যাগ করব? এইতো সেই উপযুক্ত সময়, যাদের নুন খেয়েছি, তাদের ঋণ পরিশোধ করবার। যারা প্রভুক্ত

নিকট কৃতকার্য হয়ে তার কার্যকাল উপস্থিত হলে উপেক্ষা করে, তাদের ইহলোক বা পরলোকে গতি হয় না। আপনি ধর্মকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। অতএব নিশ্চয়ই আমাকে অধর্মাচরণ করতে বলবেন না। দেখুন আমি ধর্মরক্ষার্থে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সংগে সংগ্রাম করে সৎপুরুষোচিত কাজ করব এটাই আমার স্থির সংকল্প। তবে আপনাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—পাণ্ডবরা আমার শত্রু হলেও পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে কেবলমাত্র অর্জুনের সংগেই আমার যুদ্ধ হবে। অতএব হয় অর্জুনকে সংগ্রামে নিহত করে আমার অন্নদাতা প্রভুর উপকার করব, না হয় তার হাতে প্রাণ দিয়ে উৎকৃষ্ট যশোভাজন হব। পুত্রবৎসলা জননী! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার পঞ্চপুত্র কখনও বিনষ্ট হবে না। কারণ অর্জুন আমার হাতে নিহত হলে আমি জীবিত থাকব, আর আমি অর্জুনের হাতে নিহত হলে অর্জুন জীবিত থাকবে। অতএব আপনি পঞ্চ পুত্রের জননী হয়ে যেমন সুপরিচিতা ছিলেন, চিরকাল তেমনি থাকবেন।

যে কোন একটি পুত্রের মৃত্যুকে মেনে নিতে হবে একথা মনে করে কুন্তীর দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রুর বন্যা বইল। যে কোন একটি পুত্রকে হারাতে হবে একথা ভেবে মনে দুঃখ পেলেও তাকেই নিয়তির বিধান ভেবে ফিরে এলেন।

* * *

এরপর পাণ্ডবরা তাঁদের হৃত সম্মান ফিরে পেতে কৌরবদের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ব্রহ্ম শাপে কর্ণের রথচক্র মেদিনী গ্রাস করলে তিনি অর্জুনের হাতে নিহত হলেন।

[কর্ণ ক্ষত্রিয় নয় বলে কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় তাঁকে অস্ত্র বিদ্যা শেখাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে কর্ণ ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে পরশুরামের কাছে অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় একদিন দুপুরে গুরু কর্ণের উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এই সময় একটি ঘুণ পোকা তার উরু তলদেশ ছিদ্র করে উপর থেকে বেরিয়ে যায়। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে, যন্ত্রণায় তার

জ্র কুঁচকে যায় কিন্তু তবুও তিনি পা নড়ান না। কারণ তাতে গুরুর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। গুরুর দেহে রক্তের শীতল পরশ, লাগতে ঘুম ভেঙে যায় এবং আহত কর্ণকে দেখে, তিনি রক্তপাতের কারণ জিজ্ঞেস করে ঘটনার বিবরণ শুনে বুঝতে পারেন যে, এই যুবক তাকে মিথ্যা বলেছে। কোন ব্রাহ্মণ এমন যন্ত্রণা সইতে পারেন না। অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই সইতে পারে। মিথ্যা পরিচয়ে অস্ত্র বিদ্যা শিখেছে বলে পরশুরাম তাকে অভিশাপ দেন যুদ্ধকালে তার রথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে এবং সেটাই হবে তার মৃত্যুর কারণ।]

কর্ণের মৃত্যু সংবাদ শুনে আলুলায়িতা কুন্তলা কুন্তী লোকলাজ ভুলে রণক্ষেত্রে ছুটে যান এবং কর্ণের মৃতদেহ আলিঙ্গন করে বিলাপ করতে থাকেন।

যুধিষ্ঠির মায়ের বিলাপের কারণ জানতে পেরে মর্মাহত হন। তার মায়ের জন্যই যে, আজ তাদের ভ্রাতৃহত্যার কলংক মাথায় নিতে হল একথা ভেবে যুধিষ্ঠির সমগ্র স্ত্রীজাতিকে অভিশাপ দিলেন—আমি যদি সত্যবাদী, ধর্মাচরণে কৃত সংকল্প পুরুষ হয়ে থাকি, কোনদিন অধর্মকে প্রশ্রয় না দিয়ে থাকি, তবে আজ থেকে কোন স্ত্রীজাতি তাদের কোন কথা গোপন রাখতে পারবে না। একজন না একজনকে তারা তাদের গোপন কথা বলবেই।

প্রিয়তম পুত্রের শোকে কাতর হয়ে কুন্তী বাণপ্রস্থ নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন—যুধিষ্ঠির, সহদেব তোমার ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ দেবে। আর আমার দুর্বুদ্ধি বশতঃ যে মহারথী তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জ্যেষ্ঠ হয়েও জীবিতাবস্থায় তার মর্যাদা পেল না, সেই কর্ণও যেন তোমার স্মৃতিপথের বহির্ভূত না হয়। হায় আমার মত অভাগা বুঝি আর কেউ নেই। পুত্রহারা হয়েও আমি বেঁচে আছি। পূর্বে যখন আমি তোমার কাছে তাঁর পরিচয় দেইনি, তখন আমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী। যা হোক এখন আর কোন প্রতিকার হবার নেই। এখন তুমি তোমার ভাইদের সাথে সমবেত হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের

সদ্‌গতির জন্য বিবিধ ধন দান করবে। কখনও দ্রৌপদীর অপ্রিয়াচরণ করবে না। ভীম অর্জুন সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আজ কুরুকুলের সব ভার তোমার পরে পড়ল। আমি এখন অরণ্যে গিয়ে তপোনুষ্ঠান এবং তোমার জ্যেষ্ঠ তাত ও গান্ধারীর শুশ্রূষা করব।

—মা, কেন আপনি বিচলিত হচ্ছেন? আমাদের যুদ্ধে প্রেরণা জুগিয়ে, রাজ্য দিয়ে, আপনি আমাদের ছেড়ে কেন যাচ্ছেন? আপনার বনগমন আমি অনুমোদন করতে পারছি না।

ভীম বললেন—মা, আমাদের ত্যাগ করে বনে যাবার ইচ্ছাই যদি ছিল, তবে কেন আপনি আমাদের দ্বারা পৃথিবী বীর শূন্য করালেন? আপনার বনে যাওয়ার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। কিছুতেই আপনার এই অভিরুচি অনুমোদন করতে পারছি না।

অনমনীয়া দৃঢ়চেতা সাধ্বী কুন্তীর মনে ভীমের কথায় কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল না। এমন কি অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও নাতিদের কথাতেও। তিনি তাদের সম্বোধন করে বললেন—বৎসগণ! পূর্বে তোমরা জ্ঞাতিগণ কর্তৃক কপট দ্যূতে পরাজিত হয়ে নিতান্ত দুঃখিত ও অবসন্ন হয়েছিলে, এইজন্য আমি তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম। তোমরা মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র, সুতরাং তোমাদের মান হানি হওয়া অনুচিত। তোমরা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী। তোমাদের শত্রুর বশীভূত হওয়া অনুচিত। তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ভূপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তার মত ব্যক্তি চিরকাল বনে বাস করতে পারেন না। অযুত হস্তীর তুল্য পরাক্রমশালী পৌরুষান্বিত ভীমসেন ও ইন্দ্র সদৃশ অর্জুন অবসন্নভাবে কালাতিপাত করতে পারেন না।

বালক নকুল সহদেবের ক্ষুধায় কাতরতা এবং রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর বনবাসের কষ্ট ভোগ তো চিরকাল চলতে পারে না। এসব চিন্তা করেই আমি তোমাদের জ্ঞাতিদের সঙ্গে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম। পূর্বে যখন দ্রৌপদী দ্যূতে পরাজিত হয়ে সভা মাঝে তোমাদের সামনেই কদলী বৃক্ষের মত কম্পিতা হয়েছিল, এবং দুরাত্মা

দুঃশাসন অজ্ঞানতাবশতঃ দাসীর মত তার কেশাকর্ষণ করেছিল, তখন আমি বুঝেছিলাম যে, এই কুরুকুলের ধ্বংস অনিবার্য। পাপাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করলে যখন সে বার বার সাহায্য চেয়ে কেঁদেছিল, তখন আমার চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত হয়েছিল। আমি সেজন্যই তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে, পাপের অবসান ঘটাতে, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

তোমাদের দ্বারা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই কামনা করি। এরাজ্য তোমাদের পিতা-পিতামহের। তাঁরা সকলে মহতী কীর্তির অধিকারী। তাঁদের রাজ্য রক্ষা করার দায়িত্ব এতদিন ধৃতরাষ্ট্রের পরে ছিল—আজ তোমাদের পরে। আমি প্রজাদের মুখ চেয়ে একাজে তোমাদের নিয়োজিত করেছিলাম, আমার সুখের জন্য নয়। এখন রাজ্যভোগ বাসনা পরিহার পূর্বক তপস্যা দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডুর পবিত্র-লোক লাভ করতে চাই। আমি বনবাসী অন্ধরাজ ও তার মহিষীর শুশ্রূষা করে তপস্যা দ্বারা এই কাজ করব। তোমরা রাজধানীতে ফিরে যাও। পরম সুখে রাজ্যভোগ ও প্রজাপালনে ব্রতী হও। তোমাদের ধর্মবুদ্ধি পরিবর্ধিত ও মন প্রশস্ত হোক।

যশস্বিনী কুন্তীকে ফেরানো যাবে না এটা নিশ্চিন্ত জেনে পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজন ও প্রজাগণ রাজ্যে ফিরে গেলেন।

কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সংগে ভাগীরথীর তীরস্থ এক অরণ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং একদিন দাবানলে দগ্ধ হয়ে তাঁদের পরলোক প্রাপ্তি ঘটল।

স্বামী সহযাত্রিনী মাদ্রী

—মহারাজ। আপনার কাছে আমার একটি আর্জি আছে।

নির্জন বন প্রান্তরে পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নী মদ্ররাজ শল্যের ভগ্নী মাদ্রী পাণ্ডুকে একান্তে পেয়ে একথা বললেন।

—বল, কি তোমার অভিপ্রায়?

—দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋষি শাপে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, তাতে আমার দুঃখ নেই। আমার স্বামী থাকতেও পুত্রবতী হতে পারিনি তাতেও আমার দুঃখ নেই, গান্ধারী শত পুত্রের জননী হয়েছেন জেনেও, এক মুহূর্তের জন্যও আমার ঈর্ষা হয় না।

—তাহলে তোমার মনস্তাপের কারণ কি?

—মহারাজ! কুন্তী এবং আমি উভয়েই আপনার পত্নী। দুজনের পরেই আপনার সমান স্নেহ। কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হলেন, আর আমি পুত্রের মুখ দেখা থেকে বঞ্চিত হলাম এ দুঃখ আমার সয় না।

—কিন্তু তুমি তো জান, তার পুত্র কি ভাবে হয়েছে। তাতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। তুমি বরং কোন সৎ ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হয়ে তোমার মনোভিলাষ পূরণ কর। এছাড়া তো অন্য কোন পথ দেখি না।

—মহারাজ! অন্য উপায়ও আছে। আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে কুন্তীকে অনুরোধ করেন, তাহলে তাঁর কৃপায় আমি পুত্রের জননী হতে পারি।

—বেশ, আমি তোমার কথা কুন্তীকে বলব। আমার মনে হয় সে আমার কথা অমান্য করবে না।

কুন্তী তাঁর স্বামীর কথায় বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে তার সপত্নীকে ডেকে বললেন—মাদ্রী আমি মন্ত্র জপছি, তুমি তোমার মনোনীত দেবতাকে স্মরণ কর।

মাদ্রী তখন অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করলেন এবং তাঁর ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামক দুটি পুত্র হল। মাদ্রী মা হলেন।

একদিন কুন্তী যখন পাঁচ ছেলে নিয়ে বন্য কুটিরে নিদ্রিত ছিলেন পাণ্ডু সেই সময় একাকী ভ্রমণে বের হচ্ছে দেখে মাদ্রী তাঁর সঙ্গ নিলেন।

নির্জন বনে এক পুকুর ঘাটে গিয়ে পদ্মের শোভা দেখে পাণ্ডুর চিত্ত পুলকিত হল। পিছু ফিরে দেখেন অসামান্যা রূপ লাবণ্যের অধিকারিনী মাদ্রী দাঁড়িয়ে আছে।

পাণ্ডু অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হারিয়ে ফেললেন সংযম। নিজেকে বশে রাখতে না পেরে বলপূর্বক মাদ্রীকে আলিঙ্গন করলেন।

মাদ্রী মৃগরূপী ঋষির শাপের কথা মনে করে পাণ্ডুকে বার বার নিষেধ করতে লাগলেন। কিন্তু পাণ্ডু কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হলেন না।

তিনি কামশরে বিমোহিত হয়ে, মৃগরূপী ঋষিকুমারের কথা বিস্মৃত হয়ে মাদ্রীর সংগে সহবাসে লিপ্ত হতে গেলেন এবং সংগে সংগে মৃত্যু বরণ করলেন।

মাদ্রী মৃতদেহকে আলিঙ্গন পূর্বক উচ্চৈস্বরে আর্তনাদ করতে লাগলেন।

তা শুনে কুন্তী পুত্রদের নিয়ে কান্নার শব্দকে অনুসরণ করে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলেন।

শিরে করাঘাত করে বিলাপ করতে করতে জীবনে এই প্রথম কুন্তী মাদ্রীর প্রতি দোষারোপ করে বললেন—মাদ্রী, আমি রাজাকে সব সময় রক্ষা করতাম। তিনি অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, তবে আজ তার একি দুর্মতি হল? আমার মত তোমারও তাকে রক্ষা করা উচিত ছিল! কেন তুমি নির্জনে তাকে এনে প্রলোভিত করলে? তোমার জন্যই আজ আমি স্বামীকে হারালাম।

মাদ্রী কুন্তীর এরূপ পরিবেদন বাক্য শ্রবণ করে বললেন—দিদি, এবিষয়ে আমার কোন দোষ নেই। রাজর্ষি বলাৎকারে উদ্যত হলে, আমি তাকে মিনতি করে বার বার নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু তিনি

আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্যই হোক বা ঋষিশাপের জন্যই হোক অথবা দুর্দান্ত কামাসক্ত হবার জন্যই হোক, আমার কথায় কর্ণপাত করেননি।

—মাদ্রী! যা ঘটবার তা তো ঘটেছে। সবই আমাদের ভাগ্য। এবার তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা।

—বল। এখন তোমার বাক্য প্রতিপালন করাই তো আমার কর্তব্য।

—দেখ, আমি রাজার জ্যেষ্ঠা পত্নী। সুতরাং শ্রেষ্ঠ কর্মফল আমারই প্রাপ্য। অতএব আমি পরলোকগত স্বামীর সংগে সহমরণে যাব। এ বিষয়ে তুমি আমায় বাধা দিও না। শোক পরিহার করে গাত্রোত্থান কর। দেখ, অতি সাবধানে এইসব সন্তানদের প্রতিপালন কর। আমি মহারাজের সংগে চিতায় আরোহণ করি।

—দিদি, আমি স্বামী সহবাস সুখে অদ্যাবধি তৃপ্ত হইনি। অতএব আমিই সহমরণে যাব। আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি দিতে হবে। তাছাড়া দেখ, মহারাজ আমাতেই আসক্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন, সেজন্য শমন ভবনে গমন করে তার অভিলাষ পূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম ও কর্তব্য। বিশেষত যদি আমি জীবিত থেকে নিজের পুত্রদের মত তোমার পুত্রদের স্নেহ করতে না পারি, তাহলে অবশ্যই ইহকালে লোক নিন্দায় এবং পরকালে ঘোরতর নরকে নিপাতিত হতে হবে। অতএব সহমরণে যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়।

—আচ্ছা, আমিই যে তোমার পুত্রদের সম স্নেহ দিতে পারব এ কথা তুমি কি করে ভাবলে? শত হলেও আমি তোমার সপত্নী।

—দিদি, আমি তো তোমার আচরণের মাঝে সে পরিচয় কোনদিন পাইনি। আমার প্রতি তোমার স্নেহ না থাকলে আমি কি কোনদিন মা হতে পারতাম? আমি জানি আমার সন্তানগণ তোমার কাছে আমার চেয়ে বেশী আদর পাবে। তুমি এখন আমার দেহ স্বামীর সঙ্গে দাহ কর। বল, আমাকে সহমরণে যাবার অধিকার দেবে।

কথা বলতে বলতে মাদ্রী স্বামীর দেহ আলিঙ্গন পূর্বক পরোলোকে পাড়ি দিলেন।

চিরন্তনী দ্রৌপদী

—যুধিষ্ঠির, এখানে আর আমার ভাল লাগছে না। কুন্তী যখন ব্রাহ্মণের গৃহে পুত্রদের ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন তখন একদিন যুধিষ্ঠিরকে ডেকে একথা বললেন।

—মা, তুমি আমাদের কোথায় যেতে বল ?

—পাঞ্চাল দেশে চল।

—সেখানে কেন ?

—আমি শুনেছি সেই রাজ্যের রাজা পরম দয়ালু ও নিষ্ঠাবান। দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবান।

অতঃপর মায়ের ইচ্ছানুসারে পঞ্চপাণ্ডব পাঞ্চালে এলেন এবং একদিন ভিক্ষার্থে বেরিয়ে শুনলেন যে, দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা হবে এবং সেখানে ব্রাহ্মণগণ প্রচুর দান পাবেন।

অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সেখানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবও গিয়ে হাজির হলেন—ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাওয়ার জন্য।

যথাসময়ে দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর ভগ্নীকে সভাস্থলে এনে শত সহস্র রাজাদের দেখিয়ে বললেন—এঁদের মধ্যে যিনি ঐ চক্রের মধ্যে রাখা মাছের চোখকে নিম্নে জলের মধ্যে ছায়া দেখে তীর দ্বারা বিদ্ধ করতে পারবেন, তাঁকেই দেবে তুমি তোমার বরমাল্য।

শত সহস্র রাজা দ্রৌপদী লাভের আশায় উপরে ঘূর্ণ্যমান চক্রের মধ্যে রাখা মৎস্যের চোখ নিচে জলের মধ্যে ছায়া দেখে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করতে অসমর্থ হলে, অর্জুন ক্ষত্রিয়দের এই অবমাননা সইতে না পেরে ধনুর্বাণ নিয়ে লক্ষ্যভেদ করতে এগিয়ে গেলেন। এবং বহুজনের বহু সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে ধনুকে জ্যারোপণ করে অনায়াসে সেই মৎস্যকে বিদ্ধ করে ভূতলে পাতিত করলেন।

দ্রৌপদী অর্জুনের গলায় তার বরমাল্য অর্পণ করলেন।

* * *

প্রতিদিনের মত সেদিনও পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদী সহ ফিরে এলেন এবং গৃহের বাইরে থেকেই চিৎকার করে ভীম মাকে বললেন—মা, তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এস। দেখ, আজ আমারা ভিক্ষা করতে গিয়ে কি অমূল্য রতন পেয়েছি।

ছেলেরা ভিক্ষা করতে গিয়ে কি পেয়েছে তা না দেখেই তিনি ঘরের ভিতর থেকে বলে দিলেন—তোমরা আজ ভিক্ষায় যা পেয়েছ, তা সকলে ভাগ করে নাও।

এইকথা বলে কুন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রৌপদীকে দেখে লজ্জিতা হয়ে পড়লেন। তিনি যা বলেছেন তা বজায় রাখতে হলে তো এক অনর্থ হয়। এক নারী কি করে পাঁচ জনের স্ত্রী হবে। তিনি তখন দ্রৌপদীকে সাদরে গৃহে এনে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—যুধিষ্ঠির! আমি ভেবেছিলাম তোমরা ভিক্ষা করতে গিয়ে কোন দুর্লভ বস্তু লাভ করেছ। তাই তোমাদের তা সমভাবে ভাগ করে নিতে বলেছিলাম। এখন যাতে আমার কথা মিথ্যা না হয় এবং দ্রৌপদীকেও কোনরূপ অধর্ম স্পর্শ না করে তেমন ব্যবস্থা কর।

অর্জুন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। যুধিষ্ঠির তাকে বললেন—অর্জুন, ক্ষাত্র ধর্মানুসারে তুমি তোমার শৌর্যে দ্রৌপদীকে লাভ করেছ। অতএব মা না জেনে যাইই বলে থাকুন না কেন, দ্রৌপদীকে অগ্নি সাক্ষী রেখে তোমারই গ্রহণ করা উচিত।

—দাদা! কনিষ্ঠের বিয়ে জ্যেষ্ঠের আগে হওয়া রীতি নেই। আমাকে শাস্ত্র বিগর্হিত অন্যায় কাজ করতে বলবেন না। আপনি দেখুন মায়ের বাক্যের অমর্যাদা না হয়, আবার আমরাও শাস্ত্র বিগর্হিত কোন কাজে লিপ্ত না হই।

যুধিষ্ঠির এবিষয়ে কিছু সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সময় নিলেন এবং অবশেষে যখন পাঁচ ভাইই মায়ের কথা রাখতে দ্রৌপদীকে বিয়ে করবেন স্থির করলেন, তখন দ্রৌপদীর ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্ন এসে হাজির

হলেন। তিনি তাঁদের পাঁচ ভাইকে পরম সমাদরে তাদের গৃহে নিয়ে গেলেন।

দ্রৌপদীর সংগে অর্জুনের বিবাহের কথা উঠলে যুধিষ্ঠির বললেন —মহারাজ! আমার মায়ের ইচ্ছানুসারে আমরা সকলেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করব। অতএব আপনি আপনার কন্যাকে বয়োক্রম অনুযায়ী সকলকে পরম্পরায় দান করুন।

—যুধিষ্ঠির! এক পুরুষের অনেক স্ত্রী আছে বা থাকতে পারে এমন বিধি আছে। কিন্তু এক রমণীর পঞ্চস্বামী হবে এমন কথা কখনও শুনিনি। আমি জানি আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব আপনার মত ব্যক্তির এরূপ বেদ বিরুদ্ধ কথা বলা অনুচিত।

—মহারাজ! আমরা যে ধর্মের দোহাই দিয়ে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করি, সব বাস্তব যুক্তিকে খণ্ডন করি, সেই ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত। আমরা সাধারণতঃ আমাদের পূর্বপুরুষদের করনীয় রীতিনীতির ধারক ও বাহক। তাছাড়া আমার মুখ থেকে কখনও অধর্মীয় শব্দ উচ্চারিত হয় না। বিশেষতঃ আমাদের মা যখন আদেশ করেছেন, সেটা পালন করাই সনাতন ধর্ম।

একথা শুনে ধৃষ্টদ্যুম্ন বললেন—মানলাম, ধর্মের অনুশাসন অতি সূক্ষ্ম। ধর্মের গতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। কিন্তু কনিষ্ঠের ভার্যার কাছে জ্যেষ্ঠ যাবেন কি করে?

—ধৃষ্টদ্যুম্ন, পুরাণে এরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে। গৌতম বংশীয় জটিলা নামে এক রমণী সাতজন ঋষিকে বিয়ে করেছিলেন। বার্ক্ষি নামে এক মুনির ঘরণী প্রচেতা, দশ জনের সহধর্মিণী হয়েছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন গুরুজনেরা যে আদেশ করবেন সেটাই ধর্ম। গুরুজনদের মধ্যে মা-ই পরম গুরু। অতএব মায়ের আদেশ পালন করাই পরম ধর্ম।

ব্যাসদেবও যুধিষ্ঠিরকে সমর্থন করলে, শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী দ্রৌপদীর বিয়ে হয়ে গেল।

এইভাবে ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

দ্রৌপদী লাভ করলেন পাঁচ স্বামী তাঁর পূর্বজন্মের তপস্যায় মহাদেব কর্তৃক বরের সৌজন্যে।

[পূর্ব জন্মে দ্রৌপদী ছিলেন এক ঋষিকন্যা। তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব তাকে বর দিতে চাইলে তিনি পাঁচ বার বলেছিলেন আমার পরম গুণসম্পন্ন পতি লাভ হোক। তা শুনে মহাদেব বলেছিলেন—তোমার পঞ্চ স্বামী হবে।]

* * *

দ্রৌপদীর সঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহ হবার পর বিদুরের কথায় আস্থা রেখে পাণ্ডবেরা আবার হস্তিনায় ফিরে এলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করে সুখে কালাতিপাত করতে লাগলেন। শুরু করলেন রাজসূয় যজ্ঞ। যুধিষ্ঠির খ্যাতিলাভ করলেন প্রজাবৎসল রাজা রূপে।

যুধিষ্ঠিরের এই সৌভাগ্য পরশ্রীকাতর দুষ্টমতি দুর্যোধনের সহ্য হল না। তিনি তার মামা শকুনির পরামর্শে তাঁর রাজ্য হস্তিনায় এক পাশা খেলার আসর বসান। সেই সভায় ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ থেকে আরম্ভ করে পাণ্ডব ও কৌরবদের বহু জ্ঞানী গুণী উপস্থিত ছিলেন।

যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় বাজী ধরে তাঁর রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের ধন-ভাণ্ডার, রাজ্য, সৈন্য সামন্ত সব হেরে আর কি বাজী ধরবেন বলে চিন্তা করছেন, তখন শকুনি বললেন—এখনও তো তোমার ভাইয়েরা আছে। তোমার ভাগ্যে হেরেছো। ওদের বাজী ধরে জিততেও তো পার?

যুধিষ্ঠির শকুনির কথায় নেশাগ্রস্তের মত এবার একে একে তার সব ভাইদের বাজী ধরলেন এবং হারলেন।

শকুনি আবারও যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করলে যুধিষ্ঠির নিজেকে বাজী ধরলেন এবং হারলেন।

মৃদু হেসে শকুনি বলল—এবার তাহলে দ্রৌপদীকে বাজী ধর। সে ছাড়া তোমার পাশার পণ ধরার তো আর কাউকে দেখছি না।

দ্রৌপদী রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। বংশের জ্যেষ্ঠ কুলবধূ তাকে বাজী ধরি কি করে?

—যুধিষ্ঠির, যে রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী তার সেই গুণ যাচাইয়ের এই তো উপযুক্ত সময়। এতক্ষণ হয়তো তুমি হেরেছ, এবার তার গুণে সব ফিরেও পেতে পার। যদি দ্রৌপদীকে বাজী রেখে তুমি জেত, তবে এতক্ষণ পাশার পণে যা হেরেছ, তা সব ফিরে পাবে।

বিপদে পড়ে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধিভ্রষ্ট হল। রাজ্য উদ্ধারের আশা নিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদীকে পাশার বাজী ধরে হারলেন।

এবার দুর্যোধন প্রতিকামীকে আদেশ দিলেন দাসী সহ দ্রৌপদীকে রাজ সভায় আনবার জন্য।

ইন্দ্রপ্রস্থে এসে প্রতিকামী অদ্যকার রাজসভায় যে অঘটন ঘটেছে তা জ্ঞাত করে, দুর্যোধনের আদেশের কথা বলায় ধৈর্যশীলা দ্রৌপদী বললেন—কোনদিন এমন কথা শুনিনি, কোন রাজপুত্র তাঁর স্ত্রীকে বাজী রেখে পাশা খেলে। যাই হোক, তুমি গিয়ে ধর্মরাজকে জিজ্ঞেস করে এস যে, তিনি প্রথমে নিজেকে বাজীতে হেরেছেন—না আমাকে? যদি তিনি প্রথমে নিজেকে বাজী রেখে হেরে, পরে আমাকে হারেন—তবে সভাসদ্দের জিজ্ঞেস করবে যে, আমায় সভাস্থলে যেতে হবে কিনা? তবুও যদি তাঁরা আমায় সেখানে যেতে বলেন, আমি স্বেচ্ছায় যাব।

প্রতিকামী রাজ সভায় এসে দ্রৌপদীর কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলে যুধিষ্ঠির মাথা হেট করে নিশ্চুপ রইলেন।

দুর্মতি দুর্যোধন গর্জে উঠলেন—যুধিষ্ঠির কি বলবে? ও এখন আমার আজ্ঞাবাহী দাস। যাও, গিয়ে দ্রৌপদীকে বল, তার যা বিদ্যা-বুদ্ধি সে যেন এই সভা মাঝে এসে বলে।

প্রতিকামী আবার এসে দ্রৌপদীকে সভায় যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালে দ্রৌপদী আবারও জিজ্ঞেস করলেন—এ কথা কি ধর্মরাজ বলেছেন—না দুর্যোধন?

—ধর্মরাজ কিছুই বলেননি, তিনি চুপ করে ছিলেন। দুর্যোধন আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—প্রতিকামী, তুমি আর একবার ধর্মরাজকে জিজ্ঞেস করে এস, সত্যিই কি তিনি আমায় রাজ সভায় নিয়ে যেতে বলেন ?

প্রতিকামীকে খালি হাতে ফিরে আসতে দেখে দুর্যোধন চীৎকার করে দুঃশাসনকে বলল—দুঃশাসন, দৌপদীর চুলের ঝুঁটি ধরে এই রাজসভায় নিয়ে এস।

দুর্যোধনের আদেশ পেয়ে ভীষণাকৃতি দুঃশাসন ইন্দ্রপ্রস্থে হাজির হলে, আত্মরক্ষার্থে দ্রৌপদী অন্তঃপুরে পুরনারীদের মাঝে আশ্রয় নিলেন।

কুন্তী এগিয়ে এলেন কুলবধূর লাজ রক্ষা করতে। দুঃশাসনকে বললেন—দুঃশাসন, তোমাদের কি জাত-কুল-মানের বালাই নেই ? ঘরের ঘরণীকে সভার মাঝে নিয়ে যেতে চাও ?

উন্মত্ত দুঃশাসন কুন্তীর কথার জবাব না দিয়ে তাঁকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন—তিনি মাটিতে পড়ে মূর্ছিতা হলেন—তাঁকে শুশ্রূষা করতে দ্রৌপদী এগিয়ে এলে দুঃশাসন তাঁর চুলের ঝুঁটি মুঠ করে আকর্ষণ করলে কাতর স্বরে দ্রৌপদী বললেন—দুঃশাসন, আমি অপবিত্রা হয়েছি। আমার পরিধানে একটিমাত্র বস্ত্র। এ অবস্থায় আমি গুরুজনদের সামনে যাব কি করে ?

দুঃশাসন সে কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে তার কেশ মুঠির দ্বারা আকর্ষণ করে তাকে সভার মাঝে আনলে দ্রৌপদী চীৎকার করে সভাসদদের বললেন—এ সভার মাঝে তো দেখছি অনেক জ্ঞানী-গুণী ও ধার্মিক ব্যক্তি আছেন, কেউ কি এই দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের কবল থেকে আমায় রক্ষা করতে পারেন না ? ভীষ্ম—দ্রোণ আপনারা ধার্মিক রূপে খ্যাত—আপনারা আজ নীরব কেন ? কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ নরপতি মহামতি বিদুর আজ আপনার কণ্ঠ নীরব কেন ? কেন কারুর কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা নেই ? কুরুকুলে নারীর মান রক্ষা করার মত

কি কোন পুরুষ এই রাজসভায় নেই? নারীর সম্ভ্রম কি আজ এই দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের দ্বারা বিনষ্ট হবে?

দ্রৌপদীর দুচোখে কোন অশ্রু ছিল না। ছিল বিধ্বংসী অগ্নি। তিনি একটি বার স্বামীদের দিকে তাকিয়ে লজ্জায়—দুঃখে—ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

পিতামহ ভীষ্মের কণ্ঠ এবার সরব হল—দ্রৌপদী, অন্য দ্রব্যে গৃহকর্তার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু গৃহের অন্যান্য দ্রব্যের সংগে ভার্যার পরে অধিকার আছে। এখানে ধর্মরাজ আগে পাশার পণে নিজেকে হারেন পরে দ্রৌপদী। তবে দ্রুপদ দুহিতা দ্রৌপদী একা যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী নন। তাকে যুধিষ্ঠির বাজী রাখতে পারে না। কিন্তু রাজ্য—ধন এমন কি, জীবনও যদি যায় তবুও যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলবে না। সে যে বাজী হেরেছে বলে স্বীকার করেছে—সেক্ষেত্রে আমাদের কি বলার আছে?

ভীষ্মের এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে ভীমের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। যুধিষ্ঠিরের একান্ত বাধ্য ভীম বললেন—নিজের স্ত্রীকে বাজী রেখে অতি বড় পাষণ্ড জুয়ারী মদ্যপও জুয়া খেলে না। তুমি জ্ঞানী হয়ে কি করে এমন হীন কাজ করতে পারলে? রাজ্য-ধন এমন কি আমরা চার ভাইও তোমার নিজস্ব সম্পদ। আমাদের বাজী রেখে হেরেছ, এতে আমাদের বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। কিন্তু কৃষ্ণার মত নারীকে তুমি কি করে পাশা খেলায় পণ করলে? দেখ, তোমার হীন আচরণে যাজ্ঞসেনীকে আজ কত ইতর জনের কাছে লাঞ্ছিতা হতে হচ্ছে।

ভীমের এরূপ মন্তব্যের উত্তর দিলেন অর্জুন—মেজদা, তুমি তো বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। বড়দাকে এমন কথা বলা তোমার অনুচিত। তিনি কি ইচ্ছে করে এ কাজ করেছেন? দুর্যোধনের আমন্ত্রণে তিনি এখানে এসেছিলেন পাশা খেলার আমন্ত্রণে নয়। ক্ষত্রিয় রাজা যদি অন্য রাজা কর্তৃক পাশা খেলার আমন্ত্রণ পায় আর সে খেলায় অংশ গ্রহণ না করে, তবে ধর্মচ্যুত হবে। ধর্ম রক্ষার্থে ধর্মরাজ এ কাজ

করেছেন। আমাদের সামনে এখন মহা বিপদ। এসময় ভ্রাতৃ-বিরোধে শত্রু হাসবে।

ভীম কিছুটা শান্ত হয়ে শেষে নকুল ও সহদেবকে বললেন—নকুল-সহদেব তোরা খড়্গ দিয়ে তোদের মেজদার এ হাত দুটো কেটে ফেল। ইতর শ্রেণীর এই আচরণ আমি সইতে পারছি না।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র বিকর্ণেরও দুরাত্মা দুঃশাসনের এই পৈশাচিক আচরণ অসহ্য হল। সে চীৎকার করে বলল— এই সভায় ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ হর্তা কর্তা বিধাতারা আছেন—আছেন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্যের মত বিশ্ববন্দিত আচার্যগণ—আপনারা কার ভয়ে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দুঃশাসন কর্তৃক তাঁর সম্ভ্রম হানি স্বচক্ষে দেখছেন ?

বিকর্ণের বক্তব্যের কোন জবাব মিলল না। তা দেখে বিকর্ণ আবার বলতে থাকে—আপনারা উত্তর দিন, চাই না দিন, আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেটুকু শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছি, তার দ্বারা সীমিত জ্ঞান থেকে বলছি—রাজাদের সাধারণতঃ চারধর্ম পালন করার বিধি আছে। (১) মৃগয়া। (২) দান। (৩) প্রজাপালন (৪) ধর্মাচরণ। পাশাখেলা কোন শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় বিধি নয়। ইচ্ছে করলে কেউ কেউ খেলতে পারে। আর দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির বাজী রাখেন নি। ছলনা করে তার মুখ থেকে ঐ কথা বের করা হয়েছে। যাই হোক ধর্মরাজ আগে বাজীতে নিজেকে হেরেছেন। তারপর বাজী রাখার তার আর কি অধিকার আছে ? বিশেষ করে দ্রৌপদী যখন পাঁচ জনের স্ত্রী। অতএব দ্রৌপদী পাশার পণের বলি নয়।

বিকর্ণের এরূপ যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে সভাসদেরা সকলে তাকে সাধুবাদ দিলে কর্ণ বলললেন—এই ছোট্ট বালকের দেখছি খুব বুদ্ধি ! এই সভায় কেউ কিছু জানে না, কারও কোন বুদ্ধি নেই, ও ঐ একমাত্র বুদ্ধিমান। সকলে বলছে পাশায় দুর্যোধন দ্রৌপদীকে জিতেছে আর ও অন্য কথা বলছে। বালক হয়ে কেন সভার মাঝে এসে বৃদ্ধদের মত নীতি কথা শোনাচ্ছ ? কি জান তুমি ধর্মের ? কি করে

দ্রৌপদীকে জেতা হয়নি? যখন যুধিষ্ঠির পাশায় সর্বস্ব পণ করল—তখন সেই সর্বস্বের মধ্যে কি দ্রৌপদী বাদ? তাছাড়া সুবল পুত্র শকুনি যখন বললেন যে, দ্রৌপদীকে কি পণ করেছ? তখনও তো যুধিষ্ঠির নিরস্ত হন না।

বিকর্ণ কর্ণের কটূক্তি শুনে বললেন—এই মূর্খের সভায় না থাকাই শোভনীয়।

বিকর্ণ সভা ত্যাগ করে গেলে কর্ণের শ্লেষাত্মক শব্দ উচ্চারিত হল দ্রৌপদীকে উদ্দেশ্য করে, দ্রৌপদী অশুচি সময়ে একবস্ত্রে থাকার জন্য সভায় আসতে আপত্তি করেছিলেন—কিন্তু যে রমণীর একাধিক স্বামী বর্তমান, তার আবার লজ্জা কোথায়? বিশ্ব সংসারের সামাজিক রীতি অনুযায়ী এক নারীর এক স্বামীই বিধিসম্মত। যার দুই স্বামী থাকে, সমাজে তাকে বলে দ্বিচারিণী—আর যার পাঁচ স্বামী তাকে কি বলে?

বন্ধু কর্ণের এরূপ কথা শুনে দুর্যোধন উৎফুল্ল হয়ে কর্ণের বক্তব্যের সমর্থনে বলল—তুমি বিকর্ণের কথায় রাগ কর না। ও বালক শাস্ত্রের কি জানে। দুঃশাসন—পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর সব বস্ত্র ও অলংকার খুলে নাও।

পাণ্ডবেরা তাঁদের গায়ের সব আভারণ ফেলে দিলেন। দ্রৌপদী কিন্তু অলংকার ফেলে দিয়েও নিস্তার পেলেন না। দুঃশাসন তাঁর গায়ের একমাত্র বস্ত্রখানি ধরেও টানতে লাগল। দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে দেখেও সকল সভাসদেরা নীরব আছে দেখে লজ্জা বাঁচাতে নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে দ্রৌপদী অনাথের নাথ, অগতির গতি, বিপদভঞ্জন, কৃপাসিন্ধু, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীমধুসূদনের চরণে লজ্জা নিবারণের জন্য কাতর কাকুতি জানালেন।

বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন দ্রৌপদীর আকুল-আকুতিতে আকুল হয়ে তাঁকে বস্ত্র যোগালেন।

সাবিত্রী তাঁর স্বামীকে যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে এনে সতী আখ্যা পেয়েছিলেন, সীতা প্রজ্বলিত আগুণে স্ব-শরীরে প্রবেশ করে

অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসে সতীত্বের মর্যাদা রেখেছিলেন—দ্রৌপদীও রাখলেন।

হস্তিনার রাজসভার রাজপুরুষেরা সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে যত বস্ত্র কাড়েন, ততই তার অঙ্গ রঙ-বেরঙের কাপড়ে ঢেকে যায়। অবশেষে কাপড় টানতে টানতে ক্লান্ত দুঃশাসন মাটিতে বসে পড়ল।

সভাসদেরা বলতে লাগলেন—গর্গ মুনির কৃষ্ণা নাম রাখা সার্থক হল আজ। সত্যিই তুমি কৃষ্ণের সখী কৃষ্ণা। ধন্য দ্রুপদ রাজা। এমন দুহিতার পিতা হওয়াও গর্বের।

সভাসদেরা এবার দুর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতিকে ধিক্কার জানালেন।

দাঁত কড়মড় করে ভীম এক ভীষণ-প্রতিজ্ঞা করে বসলেন সভাসদদের সাক্ষী রেখে বললেন,—সভাসদগণ! আজ এই রাজসভায় দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, পাপাচারী দুঃশাসনের বক্ষ রুধির আমি পান করব।

দ্রৌপদীও তাঁর বীর স্বামীর প্রতি আস্থা রেখে প্রতিজ্ঞা করলেন—আমি আজ থেকে কেশ প্রসাধন করব না। যেদিন তুমি দুঃশাসনের রুধির পান করবে ঐ রক্ত মাখা হাতে আমার চুল বেঁধে দেবে—সেদিন থেকে আমি আবার চুল বাঁধব।

দুঃশাসন কিন্তু তখনও দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ থেকে বিরত হয়নি। দ্রৌপদী আকুল স্বরে কেঁদে চলেছেন।

আবারও কর্ণের শ্লেষাত্মক কণ্ঠ সরব হল—দ্রৌপদী! নারী, সেবক ও শিক্ষক এই তিনজন ধর্মের প্রভুত্ব করতে পারে না। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের দাসে পরিণত হয়েছে। তুমি তার স্ত্রী। অতএব এখন তুমি দাসী। এখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তোমার প্রভু। অতএব এখুনি তুমি তার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাদের সেবায় নিয়োজিত হও।

দুর্যোধন বলল—যুধিষ্ঠির! এখনও বল, কৃষ্ণাকে আমি জিতেছি না হেরেছি?

যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠ নীরব রইল। দুর্যোধন এবার আড়চোখে দ্রৌপদীর

দিকে চেয়ে তার জানুর উপরের কাপড় তুলে দৌপদীকে সেখানে বসাবার কুৎসিৎ ইঙ্গিত করল।

এ দৃশ্য দেখে গর্জে উঠলেন ভীম। তিনি আবারও সভাসদদের সামনে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন—সভাসদগণ! আজ আমি আপনাদের সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, ভারতবংশের কুলাঙ্গার পশ্বাধম দুর্যোধন আজ নির্লজ্জের মত সভা মাঝে যে উরু দেখাল, ঐ উরু দুটি আমার বজ্রের মত গদাঘাতে চূর্ণ করব।

এদিকে দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনার কথা কুরুতিলক পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের গোচরীভূত হল নিরুপায় ভীষ্ম ও বিদুরের মাধ্যমে।

সভা মাঝে ছুটে এলেন ধৃতরাষ্ট্র। মধুর ভাষণে দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ করে বললেন—মা যাজ্ঞসেনি! তুমি আজ তোমার নিজ ক্ষমতা বলে তোমার সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা করেছ দুষ্ট দুর্যোধন ও দুঃশাসনের কাছ থেকে। তুমি আমাদের কুরুবংশের গৌরব। তোমার তুলনা তুমি। মা আমায় দেখ। আমি এক হতভাগ্য পিতা। যে পিতার এমন অপদার্থ, দুরাচার, দুর্বৃত্ত পুত্র, যার জন্য বংশের অপযশ ছড়িয়ে পড়েছে। আমার অসহায়তার দিকটা চিন্তা করে তুমি ওদের ক্ষমা কর। সংবরণ কর ক্রোধ। খুশী মনে তুমি তোমার মনের মত বর চাও।

অশ্রুমোচন করে করজোড়ে দ্রৌপদী বললেন—মহানুভব কুরুকুল-তিলক, আমার স্বামী ধর্মরাজকে আপনি দুর্যোধনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করুন।

—বেশ, তাই হবে। বল, তুমি আর কি চাও?

—আপনি ধর্মরাজের চার ভাই ও তাঁদের সশস্ত্র বাহনকে মুক্ত করুন।

—বেশ, ওরা চার ভাই ও ওদের বাহনকে মুক্ত করলাম। বল, আর কি চাও?

—মহাত্মন! আমি আর কোন বর চাই না। বৃথা আশ্বাস দিয়ে আমার লোভ আর বাড়াবেন না। শাস্ত্রে আছে বৈশ্য একবার

বর চাইবে, ক্ষত্রিয় দু'বার, ব্রাহ্মণ শতবার। অতএব ক্ষত্রিয় হয়ে দুই বর পেলাম। আর আমার কি চাই? আর বর নিয়ে শেষে কি অধর্মের পথে পা বাড়াব?

দ্রৌপদীর শাস্ত্রজ্ঞান দেখে ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে আর একবার আশীর্বাদ করে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি শুধু পঞ্চ ভ্রাতা ও তাদের সশস্ত্র বাহনের মুক্তি চাইলে—রাজ্য ধন তো কিছুই চাইলে না?

—মহারাজ! আমার স্বামীদের বল বীর্যের পরে আমার আস্থা আছে। বেঁচে থাকলে তাঁরা ধন উপার্জন করতে পারবেন।

দ্রৌপদীকে আর একবার আশীর্বাদ করে ধৃতরাষ্ট্র চলে গেলেন। পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হল দেখে সভাসদেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধৃতরাষ্ট্রকে সাধুবাদ জানালেন।

কর্ণের কণ্ঠে আবারও ব্যাঙ্গাত্বক স্বর ধ্বনিত হল—বিপদগ্রস্তা পত্নীকে স্বামী তার পৌরুষে উদ্ধার করে এরূপ ঘটনা বিশ্বে বহু ঘটেছে, কিন্তু স্বামীগণ স্ত্রীর দয়ায় মুক্ত হয় এ ঘটনা এই প্রথম ঘটল। স্ত্রীর পরে নির্ভরশীল ব্যক্তিকে লোকে কাপুরুষ বলে।

ভীম আবারও গর্জে উঠলেন—দুর্মতি দুর্জন দুর্যোধনের সঙ্গে সহবাস করে তুই দেখছি শাস্ত্র জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিস। তা না হলে প্রজাপতি ব্রহ্মার কথা বিস্মৃত হতিস না। তিনি বলেছেন সংসারে স্ত্রীই শ্রেষ্ঠা সখা। সমস্ত সুখের অধিকারী হয়েও যে পুরুষ স্ত্রীহীন হয়, তার জীবনে কোন সুখ থাকে না। বিয়ে করলেই লোকে গৃহস্থ বলে। স্ত্রী সহযোগেই নানারূপ ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। দান ধ্যান করে যতই পুণ্য সঞ্চয় হোক না কেন, অপুত্রক জনের বংশরক্ষা হয় না। জ্ঞাতি বন্ধু এমন কি আত্মীয় স্বজনও বিপদে সঙ্গ দেয় না, কিন্তু স্ত্রী সুখে দুঃখে, ইহলোকে-পরলোকে স্বামীর সহায় হয়। অতএব এতে পুরুষের পৌরুষত্ব হানি হয় না।

এরপর পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদীকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যান।

* * *

—এ তুমি কি করলে? সিংহকে খাঁচায় আটকে ছেড়ে দিলে?

এর ফল কি ভালো হবে ? ওরা বোধ হয় রাজ্যে ফিরে এবার আমাদের আক্রমণ করবে। ওরা সব ভুলতে পারে, কিন্তু দ্রৌপদীর অপমান ভুলবে না। তুমি কি আমাদের সবংশে নিধন করতে চাও ?—দুর্যোধন অভিযোগ করেন।

অপত্যস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র বলেন—তা হলে এখন উপায় ?

—উপায় একটা আছে।

—কি ?

—আবার তুমি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার আমন্ত্রণ পাঠাও। এবার পাশার পণ থাকবে, যে হারবে সে বারো বছরের জন্য বনে যাবে এবং এক বছর অজ্ঞাতবাসে থাকবে। আর সেই অজ্ঞাত বাসের সময় জানাজানি হয়ে গেলে আরো তেরো বছর তারা বনে কাটাবে। এছাড়া ওদের হীনবল করে নিধন করা সম্ভব হবে না।

পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের কথার বশবর্তী হয়ে প্রতিকামীকে বললেন--যাও, যুধিষ্ঠিরকে আমার কথা বলে ডেকে আন।

ধৃতরাষ্ট্রের এই আচরণে হতবাক গান্ধারী ছুটে এলেন। ছুটে এলেন বিদুর।

গান্ধারী বললেন—তোমার কি বৃদ্ধ বয়সে ভীমরতি হল ? দ্রৌপদীর পরে দুর্যোধন দুঃশাসনের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও তুমি আবারও যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলার জন্য ডেকে আনছো ?

বিদুর বললেন—মহারাজ ! এই কুলাঙ্গার পুত্র থেকে দেখছি কুরুবংশ ধ্বংস হবে। ওকে ত্যাগ কর। বংশরক্ষা কর।

গান্ধারী ও বিদুরের শত কাকুতি মিনতিতেও ধৃতরাষ্ট্র নিরস্ত হলেন না। শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন--গান্ধারী, বিদুর—আমায় তোমরা কি বোঝাবে, আমি জানি আমার এই বংশ ধ্বংস হবে। তা আজ হোক আর কাল হোক। এরপরে হয়তো দুর্যোধন আরও অন্যায় করবে, তার চেয়ে পাশা খেলে একটা মীমাংসা হয়ে যাক।

এরপর জ্যেঠামশাইয়ের আজ্ঞা মত ভাই ও ভার্যার শত নিষেধ

অগ্রাহ্য করেও যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গেলেন এবং শাস্ত্রীয় বিধিমতে পাশা খেলায় অংশ নিয়ে হার স্বীকার করে বারো বছর বনবাস এবং এক বছর অজ্ঞাত বাসের বোঝা মাথায় নিয়ে বনে গেলেন।

দ্রৌপদীর জীবনে আর এক পরীক্ষা সুরু হল। ঐশ্বর্য ও পঞ্চ পুত্রকে ত্যাগ করে পাঁচ ভাইয়ের সংগে বনবাসী তাপসীর বেশ পবিধান করে তিনি বের হলেন।

* * *

বনবাস যাপন কালে দ্রৌপদীর সংগে বিশেষরূপে পরিচয় হয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সংগে। সেখানে তিনি তাঁকে প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণকে একান্তে পেয়ে বলেন—আমি দ্রুপদ রাজকন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের বোন, তোমাব মত মহান মানবেব প্রিয়সখী হয়েও কি করে দুঃশীল দুঃশাসন দ্বাবা রাজ সভায় লাঞ্ছিত হলাম? আমি এমন হতভাগিনী যে, পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও যাদবেরা জীবিত থাকাকালীন আমাকে ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা দাসীরূপে ভোগ করতে চেয়েছিল। আমি সবচেয়ে দুঃখ পেয়েছি বিদুর ও ভীষ্মের নীরবতায়। তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। ধর্মতঃ আমি তাঁদের পুত্রবধূ। তাঁরা কি করে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে নীরব থাকলেন! আমি ধিক্কার দেই সেই পাণ্ডব কুমারদের, যাঁরা সভামাঝে তাঁদের সহধর্মিনীকে লাঞ্ছিতা হতে দেখেও চুপ করে ছিলেন। মহাবীর ভীমসেনকে ধিক, অর্জুনকে ধিক। ওরা বেঁচে থাকতে, ওদের সামনে হীন মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা আমায় অপমান করল? শাস্ত্রে আছে দুর্বল স্বামীও সবলের কবল থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করে। স্ত্রীকে রক্ষা করলে প্রজা রক্ষা হয়, আর প্রজা রক্ষা পেলে আত্মরক্ষা হয়। আত্মা স্ত্রীর গর্ভে জন্মায় বলে স্ত্রী জায়া শব্দে অভিহিতা হয়ে থাকে।

নারায়ণ, আপনি নিশ্চয় জানেন যে, পাণ্ডবরা কখনও শরণাগত ও আশ্রিতকে পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু সেই সভা মাঝে আমি তাঁদের শরণার্থী ছিলাম, তবুও তাঁদের আশ্রয় পাইনি। আমার গর্ভে যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের ঔরসে সুতসোম, অর্জুন

থেকে শ্রুতকর্মা, নকুল থেকে শতানীক ও সহদেব কর্তৃক শ্রুতসেনের জন্ম হয়েছে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্যও তো সেই সময় পাণ্ডবদের আমাকে রক্ষা করা উচিত ছিল।

আমি কিছুতেই একথা বিস্মৃত হতে পারছি না যে, দুঃশাসন আমাকে সভামাঝে কেশাকর্ষণ করে এনেছিল, আর মহাবলী ভীমসেন ও অর্জুন বেঁচে থাকতেও তারা জীবিত আছে। ওদের পৌরুষে ধিক। —রাগে দুঃখে হতাশায় অপমানে দ্রৌপদীর দুগণ্ড বেয়ে অশ্রু নামল।

বিচলিত কৃষ্ণ শান্ত স্বরে দ্রৌপদীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন— কৃষ্ণা! তুমি যাদের পরে প্রতিশোধ নেবার কথা বলছো, তাদের স্বপত্নীগণ তোমার চেয়েও অসহায়। তারা সারাজীবন কাঁদবে। ওরা যাতে ধ্বংস হয় তার জন্য আমি সর্বান্তকরণে পাণ্ডবদের সাহায্য করব।

* * *

দ্রৌপদী কৃষ্ণের আশ্বাস পেয়েও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেন না। যুধিষ্ঠিরের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগাবার জন্য একদিন বনের পর্ণ কুটিরে দিনান্তে যুধিষ্ঠিরকে নীরবে বসে থাকতে দেখে পতিব্রতা পাঞ্চালী তাঁর পাশে বসে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—প্রভু! আপনি কোনদিন দুঃখ পাননি। আজ সেই পাপাচারী দুর্যোধনের চক্রান্তে বড় ভাই হয়ে রাজ্যের একমাত্র সঙ্গত অধিকারী হয়েও বৃক্ষ ছাল পরে ফলমূল আহারে দিন কাটাচ্ছেন। আপনার এই বেশ দেখে যখন আমার, আপনার রাজবেশের কথা মনে পড়ে যায় তখন আর আমি দুচোখে জল রাখতে পারি না। আপনার প্রাণ-প্রিয় ভাইদের অবস্থাও তাই।

আপনার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতৃগণের এবং আমার এরূপ দুর্দশা দেখেও যখন আপনার কোন দুঃখ হয় না, তখন আমার মনে হয়, আপনার শরীরে রাগ-দ্বেষ বলে কোন বস্তু নেই। আমি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির নাম শুনেছি এবং দেখেছি—কিন্তু ক্রোধ শূন্য ক্ষত্রিয় আছে বলে শুনিনি! যে ক্ষত্রিয় সময়োচিত সময়ে তেজোদীপ্ত হয়ে বিক্রম

প্রকাশ করে না, তারা জয়ী হয় না। দুর্বলরাই শত্রুদের ক্ষমা করে থাকে।

—প্রিয়তমে! ক্রোধ মানুষকে সংহার করে, আবার ক্রোধই মানুষের মঙ্গল করে। ক্রোধ থেকেই সব শুভাশুভ ঘটনার উৎপত্তি। আমার মত লোক কি করে সেই ক্রোধানলে নিজেকে অর্পণ করতে পারে? কৃষ্ণা! ক্ষমাতেই সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ ও লোক সমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে। জ্ঞান সম্পন্ন সৎ পুরুষেরা সব সময় ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলে তাঁদের শাশ্বত ব্রহ্মলোক পাপ্তি হয়। মহামতি বিদুর, ভীষ্ম ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণের কথায় নিশ্চয়ই একদিন দুর্যোধনের মতির পরিবর্তন হবে এবং আমরা আমাদের রাজ্য ফিরে পাব।

—মহারাজ! দুরাত্মাদের মতির পরিবর্তন হবে এ আশা করা বৃথা। দেখুন, কর্মই উত্তম, মধ্যম প্রভৃতি লোকপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শক। কর্ম পরিত্যাগ করে ধর্ম-দয়া-ক্ষমা, সরলতা-লোকাপবাদ, ভীরুতা অবলম্বন পূর্বক কোন লোক প্রাপ্তি ঘটে না। আমি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি, যে রাজা ধর্ম রক্ষা করেন, ধর্ম তাকে রক্ষা করে থাকেন। কিন্তু এখানে দেখছি বিপরীত। আপনি ধর্ম রক্ষা করছেন —কিন্তু ধর্ম আপনাকে রক্ষা করছে না। মহারাজ! আপনার বিপদ এবং দুর্যোধনের সম্পদ দেখে তিরস্কার করি, সেই বিষমদর্শী বিধাতাকে। তিনি পাপাচারী দুর্যোধনকে রাজসুখে রেখে আপনাকে বনবাসীর দুঃখ দিচ্ছেন।

—যাজ্ঞসেনি। তুমি যা বললে তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু নাস্তিকেরা অনুরূপ কথা বলে থাকে। দেখ, আমি ফলের আশায় কাজ করি না। ধর্মের প্রতি আস্থা রেখে কাজ করি।—দ্রৌপদী, ধর্মের মাঝেই সনাতন সুখ নিহিত। আর ধর্মই চিরস্থায়ী হয়। অধর্মের ফল ক্ষণস্থায়ী। তুমি ও তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নই তো ধর্মের ফল!

—ধর্মরাজ, আমি ধর্মের অবমাননা বা নিন্দা করি না। কিন্তু দৈবের পরে নির্ভর হয়ে, কর্মে বিরত থাকাকেও প্রশ্রয় দেই না।

আপনি সবসময় কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকুন, দেখবেন আপনার কোন গ্লানি থাকবে না। আপনি জয়ী হবেন। যে ব্যক্তি কেবল দৈবের পরে নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তাই আবারও বলি দৈব নয়, ধর্ম পথে নয় একমাত্র পুরুষকারই আমদের সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

দ্রৌপদী শুধু অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের মত মানসিকতা নিয়ে বাঁচতে চাননি। তিনি ছিলেন দূরদর্শিনী রাজনৈতিক সচেতন নারী। তিনি জানতেন যে, তাঁর স্বামী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মরক্ষার্থে নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে পারেন, সেখানে দ্রৌপদী কোন্ ছার। আবার তিনি এও জানতেন, পাপাচারী দুষ্কৃতকারী দুর্মতি দুর্যোধন ছলে বলে কৌশলে ধর্মরাজের এই সততার সুযোগে সব গ্রাস করেছে, অদূর ভবিষ্যতেও করবে। তিনি এটাও ভেবেছিলেন, বনবাসের দুঃখ অবসানের পরেও ওরা রাজ্য ফিরিয়ে দেবে না। তাই তিনি ধর্ম-রাজের মনে বিদ্রোহের ভাব জাগাতে সচেষ্ট হয়েই শাস্ত্রীয় আলোচনার মাধ্যমে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আবার ভীম ও অর্জুনের মনেও প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়েছিলেন।

যাজ্ঞসেনীর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন—মহারাজ, দুর্যোধন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আমাদের বনে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছেন। অতএব একজন দুর্বৃত্তকে রাজত্ব করতে দেওয়াও অনুচিত। আপনি আদেশ দিন, আমরা, দুর্বৃত্তের কবল থেকে আমাদের হৃত রাজ্য উদ্ধার করি।

ভাইয়ের কথার উত্তরে শান্ত স্বরে যুধিষ্ঠির বললেন—ভাই তোমার এবং কৃষ্ণার কথার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। আমার জন্যই আজ তোমাদের এই শোচনীয় পরিণতি। আমি শঠতা করতে অক্ষম। তাই পাশা খেলায় অংশ নিয়েছিলাম। তবে তা থেকে নিরস্ত হতে না পারার কারণ হল ধৈর্যচ্যুতি ও ক্রোধ। ঐ ধৈর্যচ্যুতি ও ক্রোধের জন্যই আমার দ্বারা এ হেন আচরণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতএব আমি আবারও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ধর্মাচারণ না করে বল প্রয়োগে

ওদের রাজ্য অধিকার করতে পারি না। আমি তোমার বল এবং অর্জুনের গাণ্ডীবের পরে আস্থা রাখি। দ্রৌপদীর ঐ শোচনীয় লাঞ্ছনার পরেও যে আমি শান্ত ছিলাম, সেই দুঃখ আজ শেলসম আমার বুকে বাজে। কিন্তু চাষী যেমন বীজ বপন করে ফলের আশা করে। আমিও তেমনি অন্যায়ের বীজের ফলের আশা করছি, অতএব সময়ের অপেক্ষায় আমাদের থাকতেই হবে।

* * *

সে যুগে দ্রৌপদীর মত বিতর্কিত মহিলা আর জন্মায়নি—এ যুগে তো নয়ই। তিনি যে শুধু বিদুষী, সৌন্দর্যময়ী, শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন তা নয়। সাংসাবিক বিষয়েও ছিল তার অগাধ পারদর্শিতা।

কৃষ্ণ জায়া সত্যভামার সংগে তাঁর কথোপকথনে তার একটি সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়।

একদিন বনবাসকালে দ্রৌপদী যখন এক মহর্ষির আশ্রমে নির্জনে বসেছিলেন, তখন সেখানে কৃষ্ণ প্রিয়া সত্যভামা উপস্থিতি হয়ে কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—দ্রৌপদী, বলতো তুমি কি করে তোমার পাঁচ স্বামীর সকলের প্রিয় হলে ? তাঁরা তো দেখছি তোমাকে ছাড়া অন্য কোন রমণীর কথা চিন্তাও করেন না। এমন কি আজ পর্যন্ত তুমি তাঁদের কারও দ্বারা তিরস্কৃত বা ধিকৃত হওনি। সোমরসাদি ব্রত, উপবাস, তপস্যা, সঙ্গমাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণ বিদ্যা, জপ, হোম এর কোন্ উপায় অবলম্বন করে তুমি তাঁদের বশীভূত করেছ ? যদি তুমি তোমার স্বামীদের এই বশীকরণ বিদ্যা আমাকে শেখাও তবে আমিও কৃষ্ণকে বশীভূত করতে পারি।

যশোস্বিনী সত্যভামার কথা শুমে মৃদু হেসে দ্রৌপদী বললেন—সত্যভামা, অসৎ স্ত্রীগণই স্বামীকে বশ করার জন্য বিভিন্ন রূপ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেয়। তুমি আমাকে যে সব আচরণের কথা বললে তা তারাই অনুসরণ করে থাকে। আমি এসব কিছু করি না বা জানি না। তুমি বুদ্ধিমতী বিশেষতঃ পরমপতি শ্রেষ্ঠপতি অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণের মহিষী। তোমার এরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত। দেখ, স্বামী যদি

জানেন যে, স্ত্রী মন্ত্রপরায়ণ, তাহলে বিষাক্ত সাপ গৃহে থাকলে যেমন উদ্বিগ্ন থাকে, সেরূপ উদ্বিগ্ন থাকে। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির মনে কখনও শান্তি থাকে না। আর শান্তি না থাকলে সুখী হওয়া যায় না। আর এটা যেন স্বামী কখনও মন্ত্র দ্বারা বশীভূত হয় না। জিঘাংসু ব্যক্তিরাই উপায় দ্বারা শত্রুর উৎপাদন বা তাকে বিষ প্রদান করে থাকে! অনেক পাপপরায়ণা রমণী স্বামীদের বশ করবার জন্য ঔষধ প্রদান করে থাকে। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কারও জলাতঙ্ক, কারও কুষ্ঠ, কারও পুরুষত্বহানি, কেউ কেউ আবার জড়, অন্ধ ও বধির পর্যন্ত হয়েছে এরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে। অতএব কখনও এরূপ করা উচিত নয়।

সত্যভামা, আমি মহাত্মা পাণ্ডু তনয়দের সংগে যেরূপ আচরণ করি শোন—আমি কাম-ক্রোধ ও অহংকার ত্যাগ করে তাঁদের সংগে সৎ আচরণ করি। অভিমান ত্যাগ করে প্রণয় প্রকাশ করে তাঁদের চিত্তানুবর্তন করি। কখনও দুর্বাক্য দ্বারা তাদের মনে কষ্ট দেই না। কখনও তাঁদের ছাড়া অন্য কোন মানবকে মনে স্থান দেই না। তাঁরা স্নান, ভোজন বা উপবেশন না করলে কখনও আহার বা উপবেশন করি না। তাঁরা বাইরে থেকে ফিরে এলে তাঁদের আসন ও অন্য উপাচার দিয়ে অভ্যর্থনা করি। আমি প্রতিদিন সকালে ভালো করে গৃহ পরিস্কার, গৃহ উপকরণ মার্জনা ও রান্না করি। তাঁদের অন্নের যোগান দিয়ে তবে নিজে অন্ন গ্রহণ করি। দুষ্ট প্রকৃতির স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করি না। কটুবাক্য মুখে আনি না। সকলের সঙ্গে অনুকূল ও আলস্যশূন্য হয়ে কাল যাপন করি। পরিহাস সময়ে ছাড়া হাসি না। দ্বারে, অপরিষ্কার জায়গায় বা গৃহের বাইরে বাস করি না। উচ্চ হাস্য বা উচ্চগ্রামে কথা বলিনা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করে সব সময় সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবতী হয়ে স্বামীদের সেবা করে থাকি। স্বামীদের না দেখে এক মুহূর্তেও মনে মানসিক সুখ আসে না। স্বামী কোন আত্মীয়ের বাড়ী গেলে তার জন্য ফুল চয়ন করি, তাঁর মঙ্গলার্থে ব্রত উদযাপন করি। স্বামী যে সব দ্রব্য পান—সেবন বা ভোজন করেন না, আমিও

তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশ অনুসারে অলংকারে অলংকৃত হয়ে স্বামীর হিতানুষ্ঠান করি।

আমার শশ্রুমাতা আমাদের যে ধর্মোপাদেশ দিয়েছেন এবং শ্রদ্ধা, পূজা, জনসেবা প্রভৃতি যে সব কাজ আমার মনে জাগ্রত আছে তা আমি আনন্দের সংগে দিনরাত পালন করে থাকি। আমি সযত্নে সব সময় বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন করে এবং মৃদু, সত্যশীল, সাধু ও ধর্মপালক পতিদের ক্রুদ্ধ সর্প সমূহের মত জ্ঞান করে সেবা করে থাকি!

সত্যভামা! আমার মতে পতিগণকে আশ্রয় করে থাকাই স্ত্রীগণের সনাতন ধর্ম। পতিই নারীর দেবতা, একমাত্র গতি। সেইজন্য তাঁর মতের বিরুদ্ধাচারণ করা অনুচিত। আমি পতিদের অতিক্রম করে শয়ন, আহার এবং অলংকার পরিধান করি না এবং প্রাণান্তেও শাশুড়ির নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। সব সময় সাবধানতা, কার্যদক্ষতা ও গুরুজনদের প্রতি ভক্তি ও সেবাপরায়ণ দেখে স্বামীগণ আমার বশীভূত হয়েছেন।

সত্যভামা! আমি প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠে বীর প্রসবিনী আমার শাশুড়ি কুন্তীকে নিজ হাতে অন্ন পান করাই, আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি, কখনও তার চেয়ে উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন ভূষণ পরিধান করি না।

পূর্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে আট হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করতেন। তাঁদের পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত ছিল তিন হাজার কর্মচারী। তাছাড়া অষ্টআশি হাজার অতিথি সেখানে প্রতিপালিত হত। তাছাড়া মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্য গীত বিশারদ শত সহস্র দাসী ছিল। আমি তাদের সকলের নাম ধাম জানতাম। তাদের অন্নদান—সেবার সব ভার আমার পরে থাকত। শুধু এরাই নয়, দিনরাত শত সহস্র ক্ষুধার্ত, পীড়িত দুঃস্থ অতিথি সেবার ভারও আমার পরে ছিল। এছাড়া শত সহস্র অশ্ব, দশ অযুত হস্তীর তত্বাবধানের দায়িত্বও আমিই নিয়েছিলাম। এত সবের মাঝেও পতিদের সেবায় কোনদিন কোন ত্রুটি হয়নি।

আমি প্রথমে অতিথিদের ভোজন করাতাম। তারপর স্বামী ও দাস-দাসী পরিশেষে নিজে আহার করতাম। আমি মহারাজের সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতাম।

সত্যভামা, এইভাবে আমি আমার স্বামীদের প্রিয়তমা স্ত্রী হয়েছি। তুমিও আমার মত আচরণে লিপ্ত হও দেখবে তোমার স্বামী তোমার অনুরক্ত হয়েছেন।

দ্রৌপদীর বাক্যে পরম প্রীত হয়ে সত্যভামা তাকে আলিঙ্গন করে বললেন—দ্রৌপদী! দুঃখ কর না। তোমার মত সুশীলা সুলক্ষণা রমণীদের কখনও বেশীদিন দুঃখ ভোগ করতে হয় না। আমি আশা করি তুমি নিশ্চয়ই তোমার স্বামীদের নিয়ে নিষ্‌কণ্টকে রাজ্য ভোগ করবে।

* * *

বনের পর্ণ কুটিরে স্বামীদের সংগে দ্রৌপদী যখন বেশ সুখেই দিনাতিপাত করছিলেন সেই সময় ঘটল এক অঘটন।

পরশ্রীকাতর দুর্যোধনের আলয়ে একদিন দুর্বাসা মুনি আতিথ্য গ্রহণ করলে দুর্যোধন তাঁকে পরম যত্নে নিজ হাতে সেবা করলেন। তার সেবায় তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা বর দিতে চাইলে কুটচক্রী দুর্যোধন কর্ণের পরামর্শে দুর্বাসাকে তাঁর শিষ্য সহ একদিন দুপুরে যুধিষ্ঠিরের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করতে বললেন। আর আতিথ্য গ্রহণের শর্ত হল, যখন দ্রৌপদী ব্রাহ্মণ ও স্বামীদের ভোজন করিয়ে সুখে নিদ্রা যাবেন, তখন যেতে হবে।

দুর্বাসা তাতে সম্মত হয়ে প্রস্থান করলে, কর্ণ বললেন—দুর্যোধন এতদিনে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হল। পাণ্ডবেরা এবার দুর্বাসার কোপে পড়ে ধ্বংস হবে।

দুর্যোধনকে দেয় প্রতিশ্রুতি মত দুর্বাসা তাঁর দশহাজার শিষ্য সহ সেই সময় যুধিষ্ঠিরের আলয়ে উপস্থিত হলেন, যখন দ্রৌপদী নিজে অন্ন গ্রহণ করে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

যুধিষ্ঠির মহর্ষিকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে আপ্যায়ন করে বিনয়াবনত হয়ে

করজোড়ে বললেন—আপনারা আহ্নিকাদি শেষ করুন। আমি আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করছি।

মহর্ষি দুর্বাসা তখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে স্নানার্থে নিকটবর্তী এক সরোবরে গেলেন।

এদিকে দ্রৌপদী অতিথি সংকারের জন্য নিরতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঘরে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যার দ্বারা অতিথিদেব অন্নের সংস্থান হয়। আর মহাতেজা দুর্বাসা যদি স্নানান্তে আহার্য না পেয়ে, অভুক্ত অবস্থায় এখান থেকে ফিরে যান, তবে তাঁর অভিশাপে পাণ্ডবগণ ধ্বংস হবে। নিরুপায় হয়ে দ্রৌপদী তখন মনে মনে কংসনিসূদন শ্রীমধুসূদনকে কায়মনে ডাকতে লাগলেন।

অগতির গতি। বিশ্বের পতি ভক্ৎ বৎসল বাসুদেব দ্রুপদ-নন্দিনীর স্তবে তুষ্ট হয়ে তাঁর বিপদ বৃত্তান্ত অবগত হয়ে পার্শ শায়িনী রুক্মিনীকে পরিত্যাগ করে দ্রুত সেই কাননে দ্রৌপদীর কাছে হাজির হলেন।

দ্রৌপদীর মুখে তার বিপদের কথা শুনে বললেন—দ্রৌপদী তুমি আমায় কিছু খেতে দাও।

একথা শুনে লজ্জিতা হয়ে শান্ত স্বরে দ্রৌপদী বললেন—আপনি তো জানেন, আমার ভোজনের পর অন্নপাত্রে আর কিছু থাকে না।

—দ্রৌপদী আমি সত্যই বড় ক্ষুধার্ত। এখন আর ঠাট্টা করার সময় নেই। তুমি তোমার সেই শূন্য অন্ন পাত্রটিই এখানে নিয়ে এস।

নিরুপায় দ্রৌপদী অতঃপর তার অন্নপাত্রটি এনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখালেন। তাতে কিছু শাক ও ভাত ছিল। তিনি পরম যত্ন সহকারে তা খেয়ে বললেন—বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন।

অতঃপর ভীমসেনকে ডেকে বললেন—বৃকোদর, তুমি শীঘ্র গিয়ে ব্রাহ্মণদের ভোজনের জন্য ডেকে আন।

* * *

এদিকে দুর্বাসা ও তার সঙ্গী ব্রাহ্মণগণ স্নান করে উঠে নিজেদের উদরে হাত বোলাতে লাগলেন। পরম পরিতৃপ্তি সহকারে ভুরিভোজ

খেলে যেমন অবস্থা হয়—তাঁদের তখন সেই অবস্থা। তারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে লাগলেন। তাঁরা দুর্বাসাকে বললেন—মহর্ষি! আমাদের মনে হচ্ছে আমরা এই মাত্র পরম তৃপ্তিতে ভুরিভোজ সেরেছি। এখন যুধিষ্ঠিরের ওখানে আহার করব কি করে?

দুর্বাসা বললেন—আমরা অকারণ ধর্মরাজকে আমাদের আহার প্রস্তুত করতে বলে অপরাধী হলাম। এখন ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণ না আমাদের কোপানলে ভস্মীভূত করে। এখন সেখানে না গিয়ে চল আমরা পালিয়ে যাই।

শিষ্যগণ তখন দুর্বাসার নির্দেশানুযায়ী সেখান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

এদিকে ভীম তাঁদের খুঁজে না পেয়ে যুধিষ্ঠিরকে তা বললে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

যুধিষ্ঠিরকে চিন্তান্বিত দেখে চিন্তামনি শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ধর্মরাজ! আমি দ্রৌপদীর কথায় তাদের তৃপ্ত করেছি। তাঁরা আর আসবেন না।

এরপর দ্রৌপদী আরও বহুবার কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

* * *

পাণ্ডবেরা তখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন বন থেকে বনান্তরে। এক আশ্রমে থেকে অন্য আশ্রমে। ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত তাঁরা এলেন মহর্ষি তৃণবিন্দুর কাম্যক বনে।

একদিন তৃণবিন্দুর পুরোহিত ধৌম্যের আশ্রমে দ্রৌপদীকে কুটিরে রেখে পঞ্চ পাণ্ডব মৃগয়া করতে গেলে, সিন্ধু প্রদেশের রাজা জয়দ্রথ ঘুরতে ঘুরতে সেই আশ্রম প্রাঙ্গণে হাজির হলেন।

দ্রৌপদী তখন কুটির প্রাঙ্গণে একাকী গালে হাত দিয়ে বসে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলেন।

দূর দেখে দ্রৌপদীকে দেখে মুগ্ধ হলেন জয়দ্রথ। তিনি তার সঙ্গী কোটিকাস্তকে দ্রৌপদীর পরিচয় জানবার জন্য প্রেরণ করলেন।

কোটিকাস্থ দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তার পরিচয় জেনে এসে জয়দ্রথকে জ্ঞাত করালে জয়দ্রথ দ্রৌপদীর সম্মুখে গিয়ে তাঁকে

সম্বোধন করে বললেন—তুমি কেমন আছ? তোমার স্বামীদের সব কুশল তো?

দ্রৌপদীও তার কুশল বার্তা জিজ্ঞেস করে তাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বললেন—আমি তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করছি।

জয়দ্রথ দ্রৌপদীর আতিথ্য গ্রহণ না করে অতিশয় নির্লজ্জ পামরের মত বললেন—দ্রৌপদী, এখানে এই বনচারী বেশে তোমাকে মানায় না। তুমি আমার রথে চড়ে আমার রাজ্যে চল। আমি তোমাকে আমার প্রধানা মহিষীর আসনে বসাব।

ঘরের ভিতর ছুটে যেতে গিয়েও দ্রৌপদী থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—জয়দ্রথ, তোমার নীচাশয়তায় আমি বিস্মিত। তুমি জান না কাদের পত্নীকে তুমি এরূপ কুবাক্য বলছো? আমার মনে হয় ক্ষত্রিয় সমাজে তোমার মত নীচ মনের ব্যক্তির ঘরণী হবার যোগ্য কন্যা নেই। শৃগাল হয়ে তুমি ধর্মরাজের মত সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করার স্বপ্ন দেখছো? তুমি কি কোনদিন আমার স্বামী ভীম সেনকে দেখেছো? আমার তো মনে হয় তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মূর্ছা যাবে। তুমি কি জান না অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্য ধনুর্ধর বিশ্বে বিরল। আমার তো মনে হয় নকুল সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধেও তুমি পারবে না। কোন সাহসে তুমি এমন কুৎসিৎ শব্দ উচ্চারণ করলে?

—দ্রৌপদী, পাণ্ডবদের বল বিক্রমের কথা আমার অজানা নয়। তবে আমিও উচ্চবংশজাত ক্ষত্রিয়। এখন তুমি স্বেচ্ছায় আমার রথে চড়বে—না আমি বলপূর্বক তোমাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করব?

—জয়দ্রথ, আমি মহাবলসম্পন্না হয়ে কি জন্য দুর্বলের মত তোমার বশবর্তিনী হব। তুমি শত অত্যাচার করেও আমাকে তোমার বশীভূত করতে পারবে না। দেখ মহাবলী কৃষ্ণ ও অর্জুন যার সহায়. ক্ষুদ্র মানুষ তো দূরের কথা, ইন্দ্রও তাকে চুরি করতে পারে না।

এরপর দ্রৌপদী দুষ্ট স্বভাবের জয়দ্রথকে তার কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থের সুযোগ না দিয়ে পুরোহিত ধৌম্যকে সাক্ষী রেখে জয়দ্রথের রথে আরোহণ করলেন।

এদিকে মৃগয়ারত পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ যুধিষ্ঠির তার বাম পার্শ্বে শৃগালের চীৎকার, কাকের কর্কশ স্বর শুনে বিচলিত হলেন এবং ভ্রাতৃগণকে নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হয়ে ধৌম্যের মুখে সব শুনে জয়দ্রথের রথকে অনুসরণ করলেন।

পাণ্ডবদের কোলাহল করে এগিয়ে আসতে দেখে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে বলল—দ্রৌপদী, তোমার পঞ্চ স্বামী বোধহয় এদিকেই আসছে তুমি ওদের পরিচয় দাও।

—মূর্খ জয়দ্রথ, আজ তোমরা কেউ জীবিত থাকবে বলে আমার মনে হয় না। আগেই মূর্খের মত কাজ করেছ, এখন আর ওদের পরিচয় জেনে কি করবে? ঐ যে কাঞ্চনের মত গৌরবর্ণের উন্নত ললাট ও আয়ত চক্ষুর ব্যক্তিকে দেখছো উনিই আমার স্বামী কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। যারা জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির আশা করে তারা আমার ঐ পতির কার্যকলাপের অনুসরণ করে থাকে। উনি ধর্মপরায়ণ। শরণাগত শত্রুকেও উনি ক্ষমা করে থাকেন। অতএব যদি তুমি জীবনে বাঁচতে চাও, চাও নিজের মঙ্গল, তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করে করজোড়ে অবিলম্বে মহারাজের শরণাপন্ন হও।

আর ঐ যে শাল গাছের মত উঁচু, আজানুলম্বিত বাহু, যুগ্ম ভ্রূ-যুক্ত আরক্ত নয়ন যিনি বার বার ঠোঁট কামড়াচ্ছেন—উনি আমার দ্বিতীয় স্বামী ভীম। উনি কাউকেও বড় একটা ক্ষমা করেন না। শত্রুর শত্রুতা বিস্মৃত হন না। শত্রুর প্রাণ না নাশ করে কখনও শান্তি পান না।

আর তাঁর পেছনে যে ধনুকধারী বীরকে দেখছো উনি অর্জুন। ভয় লোভ বা মোহের বশবর্তী হয়ে তিনি কখনও ধর্মপথ পরিত্যাগ করেন না। তাই বলে দুষ্টকে দমন করতে নৃশংস হতেও তাঁর কার্পণ্য নেই।

আর তার পেছনে যাকে দেখছো। তিনি নকুল। অদ্বিতীয় খড়্গ যোদ্ধা। আজ রণে তার পরিচয় পাবে। আর সূর্যের মত তেজঃদীপ্ত সুঠাম যাকে দেখছো, ইনি আমার সর্ব কনিষ্ঠ স্বামী সহদেব। ওর মত বুদ্ধিমান সুবক্তা আর নেই। ধর্ম রক্ষার্থে উনি জীবন পর্যন্ত দিতে পারেন।

দ্রৌপদীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ ভ্রাতা জয়দ্রথের সৈন্যের পরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ভীম কোটিকাস্যের সারথির মুণ্ড ছেদন করে কোটিকাস্যকে নিধন করলে জয়দ্রথ বিপদ বুঝে পালাতে চেষ্টা করলে ভীম ছুটে গিয়ে তার চুলের মুঠি মুষ্টিতে চেপে তাকে শূন্যে তুলে মাটিতে আছাড় দিলেন এবং বুকে পা দিয়ে চেপে ধরলেন। দু'চার ঘুসি দিতেই জয়দ্রথ জ্ঞান হারাল।

অর্জুন জয়দ্রথের এই অবস্থা দেখে বললেন—মেজদা, ওকে মের না। ওর বিচার দাদা করবেন।

ভীম জয়দ্রথকে প্রাণে মারলেন না কিন্তু তার মস্তক মুণ্ডিত করে বললেন—তোকে সভার মাঝে আমাদের দাস বলে পরিচয় দিতে হবে। তা না হলে তোর মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। এই বলে তিনি তার দুটি হাত বেঁধে তাকে হাজির করলেন যুধিষ্ঠিরের কাছে।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে এরূপ শোচনীয় অবস্থায় দেখে দয়া পরবশ হয়ে ভীমকে বললেন—ভাই! ওর যা শাস্তি তা তো যথেষ্ট হয়েছে এবার ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।

—মহারাজ! এই নরাধম আমার দাসত্ব স্বীকার করেছে। অতএব একে ছেড়ে দেব কিনা তা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞেস করুন।

—তুমি যদি আমার কথা রাখা যুক্তিযুক্ত মনে কর তবে ওকে ছেড়ে দাও।

দ্রৌপদী ধর্মরাজের অভিপ্রায় ও ভীমের কথা বুঝতে পেরে ভীমকে বললেন—এই দুষ্ট দুরাচার তোমাদের দাসত্ব স্বীকার করেছে। তুমি ওর মাথা মুড়িয়েছ, প্রহারের দ্বারাও ওকে সমুচিত শাস্তি দিয়েছ। অতএব এখন আর ওকে ধরে রেখে কি হবে—ওকে মুক্তি দাও।

অতঃপর ভীম জয়দ্রথের বন্ধন খুলে দিলে, জয়দ্রথ যুধিষ্ঠির ও আশ্রমের মুনিদের পদধূলি নিয়ে যুধিষ্ঠিরের সামনে দাঁড়ালেন। তা দেখে দয়াপরবশ হয়ে ধর্মরাজ বললেন—জয়দ্রথ, তুমি যে কাজ

করেছ তা ক্ষমার অযোগ্য। মনুষ্য সমাজে তোমার মত হীন মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তোমাকে আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলাম। জীবনে আর কখনও এরূপ কাজ কর না। পরস্ত্রী হরণের মত হীন কাজ আর নেই। তুমি এখন তোমার স্বরাজ্যে ফিরে যেতে পার। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার সুমতি হোক।

● ● ●

সুখে দুঃখে হতাশায়, নিরাশার মাঝে পাণ্ডবদের বারোটি বছর অতিক্রান্ত হল। এগিয়ে এল সেই অজ্ঞাত বাসের বছরটি। পাণ্ডবেরা ঠিক করলেন তাঁরা মৎস্যরাজ বিরাটের কাছে ছদ্মনাম গ্রহণ করে বাস করবেন।

এরপর যুধিষ্ঠির নিজেকে যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার সাথী কঙ্করূপে, অর্জুন নারী বৃহন্নলার ছদ্মবেশে ও বিরাট রাজকন্যা উত্তরার নৃত্য গীতের শিক্ষিকা রূপে, ভীম বল্লভ নামে পাচকরূপে, নকুল অশ্বপালক গ্রন্থিক রূপে এবং সহদেব গো বিশারদ তন্ত্রীপাল নাম গ্রহণ করে বিরাট রাজার রাজ দরবারে নিয়োজিত হলেন।

সবশেষে পরিচারিকার বেশে রাজ অন্তঃপুরে মহারাণী সুদেষ্ণার কাছে হাজির হলেন দ্রৌপদী। তাঁর পরনে একখানি অতি ছিন্ন মলিন বস্ত্র। সুদীর্ঘ কেশদাম বেনী করে বাঁধা। হাতে এক জোড়া শাঁখা ও লোহা।

যতই মলিন বস্ত্র দ্রৌপদী পরে থাকুন আর দীন হীন ভাব প্রকাশ করুন না কেন, তাঁকে কেউ দাসীরূপে মেনে নিতে পারছিল না।

রাজমহিষী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? এখানে কোন্ প্রয়োজনে এসেছ?

—আমি সৈরিন্ধ্রী। আমি একটি কাজের জন্য এখানে এসেছি। কেউ যদি আমাকে থাকা ও খাওয়া দেয় তবে আমি তার কাছে থাকতে পারি।

—এ তুমি কি বলছো? তোমাকে দেখে তো মনে হয়, তুমি দাসদাসী রেখে খাবার উপযোগী।

—মহারাণী, আপনার কথা মিথ্যা নয়। একদিন আমার সব ছিল। আমি ছিলাম দ্রুপদ নন্দিনী দ্রৌপদীর প্রধানা সখী। আমি তাঁর কেশ প্রসাধন করতাম। তাঁর জন্য পুষ্প আহরণ করে মালা গাথতাম ও চন্দন লেপন করতাম। এরপর কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামার কাছেও কিছুদিন ছিলাম। আজ পঞ্চভ্রাতা রাজ্য হারা হয়ে বনে গেছেন, আমারও দুর্ভাগ্য দুঃখ সুরু হয়েছে।

—সৈরিন্ধ্রী, তুমি সৌন্দর্যের প্রতিমা। তোমার মত পদ্মপলাশ লোচনা মহিলা আমার নজরে পড়েনি। তোমার রূপের তুলনা নেই। তোমাকে আমার রাজ অন্তঃপুরে রাখতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমার ভয় হয়, স্বয়ং মহারাজের নজরে বা অন্য কোন পুরুষের নজরে পড়ে তুমি না কোন বিপত্তির কারণ হও।

মহারাণী, বিরাট রাজ বা অন্য কোন পুরুষ আমায় লাভ করতে পারবেন না, কারণ আমার পাঁচজন দুর্ধর্ষ স্বামী আছেন। তাঁরা সব সময় আমায় রক্ষা করেন।

—তবে তুমি সেই স্বামীদের সঙ্গে না থেকে এই বৃত্তি অবলম্বন করে এখানে থাকছো কেন?

—তাঁরা বর্তমানে খুব কষ্টে আছেন। তাই আমাকেও কষ্ট করতে হবে। আর একটি কথা, আমি কোন হীন কাজ করব না বা কারও উচ্ছিষ্ট খাব না।

—বেশ, তাই হবে। এখানে তোমার কোন হীন কাজ করতে হবে না।

* * *

সৌন্দর্যের প্রতিমা পরিচারিকা রূপী সৈরিন্ধ্রীর কয়েকটি মাস সুখে দুঃখে অতিবাহিত হল। তিনি যথাসম্ভব পুরুষের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে সচেষ্ট থেকেও একদিন অসাবধনতাবশতঃ বিরাট রাজার সেনাপতি কীচকের নজরে পড়ে গেলেন।

দ্রৌপদী সুদেষ্ণার কেশ প্রসাধনে রত ছিলেন, এমন সময় সেখানে কীচক প্রবেশ করে বিনা অনুমতিতে। কারণ তিনি শুধু রাজার সেনাপতিই ছিলেন না, তিনি রাজ মহিষী সুদেষ্ণার ভ্রাতাও।

দ্রৌপদী নত নেত্রে স্থান ত্যাগ করতেই কীচক সুদেষ্ণাকে বলেন—এই অলোকসামান্যা লাবণ্যময়ী কামিনীকে কোথায় পেলে? একে কেন পরিচারিকা করে রেখেছো? ওকে তুমি কষ্ট না দিয়ে আমায় দান কর। আমি ওকে আমার ঘরণী করে রাখব।

সুদেষ্ণা কীচকের কথার জবাব না দিয়ে অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালেন।

কীচক কিন্তু খুঁজে বের করলেন দ্রৌপদীকে। কাতর স্বরে বললেন—দেখ, তোমার মতো ভুবন ভোলানো রূপ আমি জীবনে দেখিনি। তোমার নবীন বয়স। এই বয়সে এমন হীন জীবন যাপন না করে আমাকে পতিরূপে গ্রহণ কর। তোমার জন্য আমি আমার সব ভার্যাদের ত্যাগ করতে রাজী আছি। তুমি সেখানে রাজেন্দ্রানীর মত সুখে থাকবে।

কীচকের এরূপ হীন অভিরুচির জবাবে পতিব্রতা বিদুষী দ্রৌপদী বললেন—আমি একজন হীন বংশজাতা দাসী। আপনার মত উচ্চবর্ণের মানী লোকের আমার প্রতি আসক্ত হওয়া অনুচিত। আমি পরস্ত্রী। পরস্ত্রীতে আসক্ত হওয়ার তুল্য পাপ আর নেই।

এসব শাস্ত্র ও সমাজ দুরাত্মা দুরাচারদের জন্য নয়। তাই কীচক প্রথমে তার শক্তির বিবরণ দিল। পরিশেষে বলল—তোমার উপযুক্ত পুরুষ আমি ভিন্ন তো আর দেখি না। আমি কথা দিচ্ছি তুমি যদি আমাকে বরণ কর, তবে এই রাজ্য, ধন, দাস-দাসী এমন কি আমি পর্যন্ত তোমার দাস হব।

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী কীচকের এরূপ কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য শুনে ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বললেন—দেখুন, আমি নিরাশ্রয়া ও অসহায়া নই। আমার পাঁচজন গন্ধর্ব স্বামী আছেন। তাঁরা একথা জানলে

আপনার জীবনের আশা ত্যাগ করতে হবে। ইচ্ছে করে মৃত্যুর গহ্বরে পা রাখবেন না। কু-মতলব ত্যাগ করে গৃহে ফিরে যান, নচেৎ আপনার ভাগ্যে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু জুটবে না।

কীচক তখন রাজ মহিষী সুদেষ্ণার কাছে গিয়ে বললেন—সুদেষ্ণা, সৈরিন্ধ্রীকে না পেলে আমি এ প্রাণ আর রাখব না।

ভাইয়ের এরূপ কাতরতায় সুদেষ্ণার মনে দয়ার উদ্রেক হল। তিনি বললেন—তুমি তোমার গৃহে গিয়ে সুরা ও অন্ন প্রস্তুত করাও, আমি তা আনবার জন্য সৈরিন্ধ্রীকে সেখানে পাঠাব, তুমি নির্জনে তোমার মনোবাসনা চরিতার্থ কর।

কীচক আশান্বিত হয়ে চলে গেলে সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীকে ডেকে তার ভাইয়ের ঘর থেকে পানীয় আনবার আদেশ করলে দ্রৌপদী বললেন—আমি সেখানে যেতে পারব না। আপনি অন্য কাউকে পাঠান। আর আমি কেন যেতে চাইছি না তাও তো আপনার অজ্ঞাত নয়।

—সৈরিন্ধ্রী, তোমার কোন ভয় নেই। আমি পাঠিয়েছি জানলে সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

দ্রৌপদী কীচকের বিলাস কক্ষে উপস্থিত হল। তাঁকে বস্ত্র ও অলংকার পরিধান করে তার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আগ্রহ দেখালে দ্রৌপদী বললেন—কীচক, তোমার হীন বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আমি এখানে আসিনি। আমাকে রাজমহিষী পানীয় আনার জন্য এই পান পাত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন।

উন্মত্ত কীচক দ্রৌপদীর ডান হাত চেপে ধরে তার দিকে আকর্ষণ করল। উত্তরীয় ধরে টানতেই দ্রৌপদী সজোরে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে ছুটে গেলেন রাজ সভা মাঝে যেখানে যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার বয়স্যদের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় নিয়োজিত ছিলেন।

কীচক সেখানে গিয়ে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্বক তাঁকে লাঞ্ছিতা করতে সচেষ্ট হলে দ্রৌপদী নিজ ভূজবলে তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে বিরাট রাজকে উদ্দেশ করে বললেন—মহারাজ! একজন নির-

পরাধিনী অবলার নিগ্রহ চোখে দেখেও কি আপনি নীরব থাকবেন? তবে কি বুঝব এ রাজ্যে কোন রাজা নেই, ধর্ম নেই? এ রাজ্যের রাজা একজন অধার্মিক পশু? সভাসদগণ! রাজার না হয় মতিভ্রম হয়েছে, আপনারা কীচকের এই আচরণের প্রতি দৃষ্টি দিন। কীচক অধার্মিক এবং বিরাট রাজাও ধর্মজ্ঞ নন, আর যারা এই রাজার উপাসনায় রত, তাঁরাও ধার্মিক বলে পরিগণিত হতে পারেন না।

দ্রৌপদীর কটূক্তিতে বিরাট রাজার মোহ ভঙ্গ হল। তিনি বললেন—আমি তোমাদের বিপদের বিষয় তো কিছুই জানি না। সব ঘটনা না জেনে কি করে এর মীমাংসা করব?

এবার দ্রৌপদী সব ঘটনার বিবরণ দেওয়ায় সভাসদেরা কীচককে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে কীচক দ্রুত সভা ত্যাগ করলো।

অতঃপর দ্রৌপদী তাঁর বসন ও কেশপাশ সংযত করে যুধিষ্ঠিরের কথায় সুদেষ্ণার কাছে ফিরে গেলেন।

দ্রৌপদীর মলিন বদন, সজল আঁখি এবং অবিন্যস্ত কেশ দেখে সুদেষ্ণা তার কারণ জিজ্ঞেস করে সব জানতে পেরে বললেন—তুমি যদি বল, আমি কীচককে শাস্তি দিতে পারি।

—তার আর প্রয়োজন হবে না মহারাণী। যাঁদের পত্নীকে সে লাঞ্ছিত করেছে তাঁদের হাতেই তার প্রাণ যাবে।

অতঃপর দ্রৌপদী মনে মনে কীচকের মৃত্যু কামনা করে, তাঁর আবাসে গিয়ে স্নান করে শুদ্ধ হলেন। কিন্তু দেহের জ্বালা তখনও জুড়ায়নি। অপমানের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে অপমানের প্রতিকার করতে তিনি গিয়ে হাজির হলেন ভীমের বিশ্রামাগারে। জাগালেন তাঁকে। রাত দ্বিপ্রহরে দ্রৌপদীকে দেখে বিস্ময়ান্বিত হয়ে তাঁর এখানে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করলে দ্রৌপদী বললেন—রাজা যুধিষ্ঠির যার স্বামী, তার জীবনে সুখ কোথায়? এর আগে দুঃশাসন আমাকে কৌরব সভায় এনেছিল—আজ কীচক। দ্রৌপদী ছাড়া আর কোন রমণী এরূপ অপমানিতা হয়েও জীবিত থাকে? তোমার

মত বলশালী স্বামী থাকতেও কেন আমি বার বার এরূপ লাঞ্ছিতা হচ্ছি? আমার আর বেঁচে থেকে কি হবে?

প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে কাছে বসিয়ে নিজ হাতে তার নয়নবারি মুছিয়ে দিয়ে বললেন—প্রিয়ে! সত্যিই তোমার এই দুর্দশার জন্য আমার বাহুবল ও অর্জুনের গাণ্ডীবকে ধিক্কার দেওয়া উচিত। কিন্তু ধর্মরাজ সময়ের প্রতীক্ষা করছেন। আর তো মাত্র কটাদিন। আর পনের দিন বাদে অজ্ঞাত বাসের সময় পার হবে—তখন সব কিছুর জবাব দেব। দেখ, অতীতে ভৃগুবংশীয় চ্যবন বনে বল্মীকভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তথাপি তার কন্যা সুকন্যা তার অনুগামিনী হয়েছিলেন। ভুবন বিখ্যাত রূপবতী চন্দ্রসেনা সহস্রবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধতম স্বামীর অনুচারিণী হয়েছিলেন। জনক দুহিতা সীতা অরণ্যচারী রামের সমভিব্যাহারিণী হয়ে রাক্ষসদের হাতে কত নিগ্রহ ভোগ করেছিলেন। তথাপি পতির অনুগমনে নিরস্ত হননি। রূপযৌবন সম্পন্না লোপামুদ্রা অলৌকিক ভোগ্য সমুদয় পরিত্যাগ পূর্বক অগস্ত্যের সহচারিণী হয়েছিলেন। মনস্বিনী সাবিত্রী যমালয় পর্যন্ত সত্যবানের অনুগমন করেছিলেন। দ্রৌপদী, তুমিও সেইসব পতিব্রতাগণের মত সদ্‌গুণসম্পন্না। অতএব আর কিছুদিন ধৈর্য ধর।

—আমি ধর্মপথ থেকে কখনও বিচ্যুত হইনি। তোমাদের মঙ্গল কামনায় সতত ব্রত উদ্‌যাপন করি। তোমাদের ভিতর, তোমার বল-বীর্যের পরে আমার গভীর আস্থা আছে। আমি কীচককে গর্বভরে বলেছিলাম, আমার পাঁচজন স্বামী আছে। তাঁরা যদি আজ তোমার এই কথা জানতে পারেন তবে তোমার ভবলীলা সাঙ্গ হবে। রাজ-মহিষীকেও আমি গর্বভরে একথা বলেছি। এখন তুমিই বল, তুমি ছাড়া আমার কথার মূল্য দেবার মত ব্যক্তি কোথায়? তুমিই আমাকে ভয়ংকর জটাশূরের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে, তুমিই ভাইদের সঙ্গে জয়দ্রথকে পরাজিত করেছিলে, এখন কীচককেও সংহার কর। ঐ দুরাত্মাই আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। যদি কাল রাতের ভিতর ঐ দুরাত্মার মৃত্যু না হয় তবে আমি বিষ পানে

প্রাণ ত্যাগ করব। কীচকের বশীভূত হওয়া অপেক্ষা আমার প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয়।

ভীমসেন বললেন—আমি কাল রাতেই কীচকের ভবলীলা সাঙ্গ করব। তবে কৌশলে আমাদের সে কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে আমি যা বলি শোন। বিরাট রাজার নৃত্যশালায় রাত্রে কেউ থাকে না। আর সেখানে এক মনোরম শয্যা পাতা আছে। তুমি রাতে কৌশলে লোভ দেখিয়ে কীচককে ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে—আমি সেখানে তার ভবলীলা সাঙ্গ করব।

পরদিন কীচক আবারও দ্রৌপদীর কাছে এসে তার বীরত্ব প্রকাশ করলে দ্রৌপদী তাঁকে রাতে নৃত্যশালায় যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

* * *

অন্ধকার নৃত্যশালায় দ্রৌপদীর বদলে নারীর ছদ্মবেশে বিছানায় শুয়েছিলেন স্বয়ং ভীমসেন।

দুরাত্মা কামাতুর কীচক উন্মত্তের ন্যায় ভীমসেনকে দ্রৌপদী ভেবে আলিঙ্গনে উদ্যত হলে ভীম তার চুলের ঝুঁটি ধরে বললেন—কীচক, আজ তোকে যমপুরীতে পাঠিয়ে সৈরিন্ধ্রীকে সুস্থ জীবন যাপন করার সুযোগ করে দেব।

এবার অন্ধকারে উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং কিছু সময়ের মধ্যে ভীম কীচককে ধরাশায়ী করে তার গলায় পা দিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করলেন।

বিজয়িনী দ্রৌপদী এইভাবে কীচককে নিধন করিয়ে সভাসদদের কাছে গিয়ে বললেন—সভাসদগণ পরস্ত্রীকে যে কামনা করে, তাদের নরপিশাচ কীচকের অবস্থা দেখে শিক্ষা নেওয়া উচিত।

উপস্থিত বুদ্ধি, বিদ্যা, চাতুর্য ও সৌন্দর্যের দ্বারা এইভাবে দ্রৌপদী তার সতীত্ব, অস্তিত্ব ও নারীত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অজ্ঞাত বাস শেষ হলে যুধিষ্ঠির স্বরাজ্যে ফিরে এলে দুর্যোধন তার প্রতিশ্রুতি রাখলেন না। পাঁচখানি গ্রাম চেয়ে জবাব

পেলেন যে, একটি সূচের অগ্রভাগে যেটুকু মাটি ওঠে, তাও তাঁরা দেবেন না।

তখন দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের মনে জাগালেন বিদ্রোহের অনল। তাঁদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করালেন।

যুদ্ধে জয় হল। আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় কাতর যুধিষ্ঠির ঠিক করলেন, অর্জুনের হাতে রাজ্যের ভার ছেড়ে দিয়ে তিনি নির্জন বনে গিয়ে আত্মশুদ্ধি করবেন।

চার ভাই মিলে যুধিষ্ঠিরকে নানাবিধ শাস্ত্রীয় বক্তব্য দ্বারা বুঝিয়েও তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে অসমর্থ হলে হাল ধরলেন দ্রৌপদী। বললেন—ধর্মরাজ! দ্বৈতবনে আপনার ভাইয়েরা শীত গ্রীষ্মে কাতর হয়ে পড়লে আপনিইতো বলেছিলেন—তোমরা যখন দুর্যোধনকে নিধন করে সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করবে তখন এই দুঃখ সুখে পরিণত হবে। তবে আজ কেন তা বিস্মৃত হচ্ছেন? মহারাজ! সকলের সঙ্গে মিত্রতা, দান, অধ্যয়ন ও তপোনুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম। ক্ষত্রিয়ের নয়। অসাধুগণের দমন, সাধুগণের প্রতিপালনই রাজাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যাঁর শরীরে ক্ষমা ও ক্রোধ, দান ও অদান, ভয় ও নির্ভয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ বিদ্যমান আছে, তাঁকেই ধার্মিক বলে। আপনি বিদ্যা, দান, সন্ধি, যজ্ঞ বা যাচ্ঞা দ্বারা এই পৃথিবী লাভ করেননি। দুর্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, দুঃশাসন, অশ্বত্থমা প্রভৃতি যোদ্ধাগণকে সংহার করেই তা অধিকার করেছেন। অতএব তা ভোগ করাই আপনার ক্ষাত্র ধর্ম।

মহারাজ আমার শ্বশ্রু মাতা বলেছিলেন—দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির অসংখ্য নরপতিকে বিনাশ করে তোমাকে পরম সুখে রাখবেন। সেই দূরদর্শিনী মহিষীর কথা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু আপনার মোহে এভাবে বুঝি তা মিথ্যা হবে।

এইভাবে দ্রৌপদী বহু যুক্তির অবতারণা করে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য শাসনে ও প্রজাপালনে বাধ্য করেছিলেন।

তিনি পতিব্রতা, পতি গর্বে গর্বিতা ছিলেন সত্য, কিন্তু নির্বিচারে,

দুরাচার অনাচার, অত্যাচারকে মেনে নেননি। প্রচ্ছন্নভাবে সকলের মনে তেজ, শক্তি, ধর্মীয় আচরণের অনুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যুক্তি তর্কের বাইরে গিয়ে কোন কাজ করেননি বা মেনে নেননি। তবুও তিনি স্বামীদের ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারেননি।

সুখে সমৃদ্ধিতে দেশকে শাসন করে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করে একদিন রাজ্যভার পৌত্র অর্থাৎ অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের হাতে অর্পণ করে যুধিষ্ঠির চার ভাই ও ভার্যা দ্রৌপদীকে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করার পথে প্রথমে দ্রৌপদীর পতন হল।

ভীম তখন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ধর্মরাজ! দ্রৌপদী তো পতিব্রতা সতীদের অন্যতমা। জীবনে কখনও অশাস্ত্রীয় অধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি বা অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেননি। তবে কেন তিনি স্বর্গে যাবার পথে এমন পতিত হলেন?

ভীমের কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—বৃকোদর, দ্রৌপদী পতিব্রতা, শাস্ত্রীয় আচারে নিষ্ঠাবতী এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু আমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে অর্জুনকে বেশী ভালোবাসতো। তার এই পক্ষপাতিত্বের জন্যই আজ তাকে তার ফল ভোগ করতে হল।

দ্রৌপদী ছিলেন বীরের পূজারী। বীরত্ব ও শাস্ত্রীয় বিধিতে নিষ্ঠ ছিলেন অর্জুন। ভীমের ছিল আসুরিক শক্তি। যুধিষ্ঠিরের শাস্ত্রীয়জ্ঞান ও ধর্মের প্রতি অচল নিষ্ঠা এ সবের মধ্যে সেজন্যই বোধহয় দ্রৌপদীর অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ছিল। তবুও দ্রৌপদীর মত নারী সে যুগে বিরল ছিল—আজও আছে। আজ ঘরে ঘরে দ্রৌপদীর মত নারীর বড় প্রয়োজন।

পতিব্রতা সতী সাবিত্রী

—মা, তুমি ভালো আছ তো? যে কাজে গিয়েছিলে তার সমাধান হয়েছে? মদ্র দেশের নরপতি অশ্বপতি কন্যা সাবিত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যা, আপনি আমাকে যে কাজে পাঠিয়েছিলেন তা পূরণ হয়েছে। তা জানাতেই আমি আপনার কাছে এসেছি,—সাবিত্রী বললেন।

অশ্বপতি দেবর্ষি নারদের সঙ্গে সভাকক্ষে বসে আলাপ করছিলেন। পিতা পুত্রীর কথা শুনে কৌতূহলী নারদ জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মেয়েটি তো বেশ বড় হয়েছে। ওকে পাত্রস্থ করছো না কেন?

—দেবর্ষি, ওর মনের মত পাত্র নির্বাচনের জন্যই ওকে আমি পাত্র-মিত্র ও সখীদের সঙ্গে মনের মত পতি নির্বাচনের জন্য তীর্থ পর্যটনে পাঠিয়েছিলাম। তা ও তো বলছে ওর মনের মত পতি নির্বাচন করেছে। ওর মুখেই সে কথা শুনুন। এই কথা বলে তিনি আবার সাবিত্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—মা, বল কাকে তুমি তোমার পতিরূপে নির্বাচিত করেছ?

—বাবা, তীর্থ পর্যটন শেষে বনে উপবনে ভ্রমণ করতে করতে এক অরণ্যে কাষ্ঠ আহরণ রত এক ঋষিতুল্য কুমারের দেখা পাই। তাঁকেই আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

—তিনি কি কোন ঋষি তনয়?

—না। তিনি শল্বাধিপতি দ্যুমৎসেনের পুত্র। দৈব দুর্বিপাকে দ্যুমৎসেন তার দুটি চোখ হারালে তাঁর বালক পুত্র সত্যবান সেই রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং জ্ঞাতিদের চক্রান্তে তিনি সর্বহারা হয়ে পিতা মাতাকে নিয়ে বনে বসবাস করতে বাধ্য হন। তিনি সত্যবাদী,

ধার্মিক এবং স্থায়পরায়ণ। রাজ ঐশ্বর্যের মাঝে লালিত হয়েও তিনি বনের তাপসের জীবন যাপনে বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ করেন না।

—দেবর্ষি, আপনি কি সত্যবানের বিষয়ে আর কিছু জানেন?

—অশ্বপতি, তোমার কন্যার পাত্র নির্বাচনকে আমি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই। সাবিত্রী সত্যই সূর্যের মত তেজস্বী, বৃহস্পতির মত বুদ্ধিমান, ইন্দ্রের মত বীর্যবান ও বসুধার মত ক্ষমাশীল পাত্রকে পতিত্বে বরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে! সত্যবান একজন অশ্ব-বিশারদ। শিশুকালে সে অশ্বের ছবি আঁকত, তাই তার আর এক নাম চিত্রাশ্ব। কিন্তু এতসব গুণের অধিকারী হয়েও সত্যবান স্বল্পায়ু। আজ থেকে একবছর পর তার মৃত্যুযোগ আছে।

একথা শুনে চমকে উঠলেন অশ্বপতি। কন্যাকে সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন—মা সাবিত্রী, আমি কোনদিন তোমার কোন কাজে বাধা দেইনি। পতি নির্বাচনেও আমি তোমায় অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি। কিন্তু তুমি অজান্তে একটি মারাত্মক ভুল করে ফেলেছো। সত্যবান রূপবান ও গুণবান রাজপুত্র। তোমার মত গুণবতী ও রূপবতীর যোগ্য। কিন্তু যে পাত্রের পরমায়ু মাত্র এক বছর তার করে কোন্ প্রাণে কন্যা সম্প্রদান করি? আর তুমিইবা নিশ্চিত বৈধব্য জেনে কি করে এমন পতিকে বরণ করতে পার?

পিতার একথা শুনে অবিচলিত চিত্তে দৃঢ়তা সহকারে সাবিত্রী বললেন—দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র নিপতিত হয়। কন্যাকেও লোকে একবার প্রদান করে "দদামি" এই কথা বলে। অতএব সত্যবান দীর্ঘায়ুই হোন আর স্বল্পায়ুই হোন, সগুণ বা নির্গুণই হোন, আমি যখন একবার তাঁকে পতিত্বে বরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তখন তিনিই আমার পতি। আমি প্রাণ বিসর্জন দেব, আজীবন অনূঢ়া থাকব, তবুও অন্য কাউকে পতিত্বে বরণ করব না।

সাবিত্রীর এই দৃঢ়তা দেখে ত্রিকালজ্ঞ দেবর্ষি নারদ শাল্বরাজকে বললেন—মহারাজ, তোমার কন্যা স্থিরপ্রতিজ্ঞ, দৃঢ়চেতা ও

ধর্মপরায়ণা। ওকে সংকল্পচ্যুত করা অসম্ভব। তুমি এখানেই ওর বিয়ে দাও।

অশ্বপতি ও সাবিত্রীকে আশীর্বাদ করে দেবর্ষি ঊর্ধ্বমার্গে যাত্রা করলেন।

রাজমহিষী সাবিত্রীর দুর্ভাগ্যের কথা শুনে এই বিবাহ থেকে তাকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করলেন। দ্যুমৎসেনও সব শুনে বললেন— চিরকাল সুখে পালিতা সাবিত্রী বনবাসের দুঃখ সইতে পারবে না। অতএব তার এ সংকল্প ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু সাবিত্রীকে তাঁর সংকল্প থেকে চ্যুত করা সম্ভব হল না।

* * *

সাবিত্রীর বিবাহ হয়ে গেল।

রাজকুমারী সাবিত্রী রাজাভরণ ত্যাগ করে তাপসীর বেশে সত্যবানের সহধর্মিণীর স্থান অধিকার করলেন। নবজন্ম হল তাপস সত্যবানের সহধর্মিণী তাপসী সাবিত্রীর।

প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে পতির চরণ বন্দনা করে সাবিত্রীর ঘুম ভাঙতো। তারপর তিনি অন্ধ শ্বশুরকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে তাঁর দেবার্চনার ব্যবস্থা করে গৃহকাজে লিপ্ত হতেন। স্বামী বনে কাঠ কাটতে যেতেন। ফিরে এলে ক্লান্ত স্বামীর সেবা করতেন। সকলের আহার শেষ হলে তিনি নিজে আহার গ্রহণ করতেন।

আদরে পালিতা সাবিত্রীর এই নতুন জীবনে কোন রূপ অসুবিধা হত না। কিন্তু মাঝে মাঝে দেবর্ষি নারদের ভবিষ্যৎ বাণীর কথা মনে পড়ে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়তেন।

মাঝে মাঝে সাবিত্রীকে বিমর্ষ দেখে সত্যবান ভাবতেন, হয়তো পিতা মাতাকে দেখবার জন্য বা বনবাসের ক্লেশে সাবিত্রীর মন খারাপ হয়ে পড়ছে। কিন্তু স্বামীর সুখ ও শ্বশুরের সেবা ছাড়া সাবিত্রীর মনে কখনও অন্য চিন্তা স্থান পেত না।

দেখতে দেখতে সুখে দুঃখে এক বছরের দোর গোড়ায় এসে পড়ল সময়ের সীমারেখা। এক বছর পুরতে আর মাত্র চার দিন বাকী।

সাবিত্রী তিন দিন নির্জলা উপবাস করে ব্রত উদ্‌যাপন করবেন ঠিক করলেন।

সত্যবান এই ব্রত উদ্‌যাপন থেকে নিরস্ত করতে সাবিত্রীকে অনেক অনুরোধ করেও তাকে সংকল্পচ্যুত করতে না পেরে পিতাকে সব বললেন।

সব কথা শুনে দ্যুমৎ সেন পুত্রবধূকে কাছে ডেকে সস্নেহে বললেন —মা, আমি শুনলাম তুমি ত্রিরাত্রি অনশন করে একটি ব্রত উদ্‌যাপন করছো?

—আপনি ঠিকই শুনেছেন।

—মা, রাজপুত্রী হয়ে বনবাসীর জীবন যাপনে তুমি বেশ কৃশ হয়ে পড়েছ, তার পরে যদি আবার এই কষ্টার্জিত ব্রত উদ্‌যাপন কর, তবে যে তোমার জীবনও সংশয় হতে পারে। তুমি তোমার সংকল্প ত্যাগ কর।

ঈষৎ হেসে সাবিত্রী বললেন—বাবা, আপনি তো চোখে দেখেন না, তবে কি করে বুঝলেন আমি বনবাসের কষ্ট সইতে পারছি না? আমি কৃশ হয়ে পড়েছি? যে কষ্ট আমার স্বামী ও আপনারা সইতে পারেন, তা আমি পারব না কেন? আপনি পরিতাপ করবেন না। এ ব্রত উদ্‌যাপন আমার জীবন মরণের, অস্তিত্ব রক্ষার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ ব্রত উদ্‌যাপনে আমি সমর্থ হব।

দৃঢ়চেতা সাবিত্রীর কথা শুনে দ্যুমৎসেন বুঝলেন সাবিত্রীকে সংকল্পচ্যুত করা অসম্ভব। তাই তিনি বললেন—চির আয়ুষ্মতী হও। তোমার ব্রত উদ্‌যাপন সার্থক হোক এই কামনা করি।

অনাহারে অনিদ্রায় জপে তপে তিন দিন কেটে গেল। প্রাতঃকৃত্য সেরে প্রদীপ্ত হুতাশনে হোমক্রিয়া সমাধা করে সাবিত্রী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, শ্বশুর ও শাশুড়িকে প্রণাম করলেন।

তাঁরা সকলে সমস্বরে আশীর্বাদ করলেন—তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষুণ্ণ হোক।

ব্রাহ্মণগণ তাঁদের আপনালয়ে প্রস্থান করলে সাবিত্রীর শ্বশুর ও শাশুড়ি বললেন—মা, এবার ব্রত ভঙ্গ করে আহার কর।

—আমার ব্রত এখনও শেষ হয়নি। আমি সূর্যাস্তের পর আহার করব।

এমন সময় সত্যবান প্রতিদিনের মত কুঠার হাতে বনে যাবার জন্য সচেষ্ট হলে সাবিত্রী তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বললেন—আমিও আজ তোমার সঙ্গে বনে যাব।

—সাবিত্রী, তুমি আজ তিন দিন অনাহারী। ব্রতোপবাসে তোমার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। পায়ে হেঁটে বনে গিয়ে তুমি একটা বিপদ ঘটাবে। অন্য দিন না হয় যেও।

— দেখ, স্বামী ও শ্বশুরকুলের জন্য ব্রতোপবাস করা স্ত্রীজাতির ধর্ম। সেই ধর্মপালনে তাদের কোন ক্লেশ হয় না। আর আজ যখন যেতে চাইছি—তখন আমায় বাধা দিও না।

—বেশ, তুমি তাহলে আমার বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে এস।

ধীর পায়ে সাবিত্রী গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর শাশুড়ির সামনে।

তাঁকে দেখে তাঁর শাশুড়ি জিজ্ঞেস করলেন—কিছু বলবে ?

—মা। আজ আমি আপনাদের কাছে একটি জিনিষ চাইব, দেবেন তো ?

—নিশ্চয়ই দেব।

—আপনার ছেলে শুধুমাত্র ফল আহার করে বনে যাচ্ছেন। আমার ইচ্ছে, আমিও তাঁর সঙ্গে যাই। আজ একবছর হল আমি এখানে এসেছি, কখনও এই কুটিরের সীমার বাইরে যাইনি। আজ বনের কুসুমিত কানন দেখতে বড়ই বাসনা জাগছে। যদি অনুমতি করেন তো আমি যেতে পারি।

দ্যুমৎসেন চিন্তা করলেন রাজকুমারী হয়ে, আদরে লালিতা হয়েও সাবিত্রী তাঁদের সঙ্গে বনবাসের দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করেছে। কোনদিন কিছু চায়নি। আজ যখন স্বামীর সঙ্গে বনে বেড়াতে যাবার

বাসনা জেগেছে, তখন তাকে বাধা দেওয়া অনুচিত। এসব ভেবে তিনি বললেন—যাও মা, তবে সাবধানে যেও।

* * *

বনের প্রাকৃতিক শোভা সাবিত্রীকে মুগ্ধ করল, সত্যবান আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বনের গভীরে প্রবেশ করে সুমিষ্ট ফলের সংগে সুবাসিত সুন্দর ফুলও আনলেন। মনের মত করে সাজালেন প্রেয়সীর কবরী ও অঙ্গলতাকে।

হঠাৎ তার মাথায় তীব্র যন্ত্রণা শুরু হল। তিনি প্রাণপ্রিয়া প্রণয়িনীর সামনে বসে পড়ে তার প্রসারিত উরুতে মাথা রেখে বললেন—সাবিত্রী, আমার মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা করছে, একটু টিপে দাও।

পতিপ্রাণা সাধ্বী সাবিত্রী বুঝলেন এই সেই ক্ষণ। দেবর্ষির বাক্য ফলতে শুরু করেছে। এবার তার স্বামীকে কেড়ে নিতে আসবে নিষ্ঠুর নিয়তি।

তিনি তাঁর স্বামীকে ক্রোড়ে টেনে নিয়ে মাথায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যবান ঘুমিয়ে পড়লেন। সাবিত্রী দেখলেন সত্যবানের মুখটা যন্ত্রণাবিকৃত, তার মাথায় স্বেদ বিন্দু জমেছে। কিছুক্ষণ পর তার সামনে এসে দাঁড়ালো সূর্যের মত তেজস্বী, শ্যামবর্ণ আরক্ত নয়নের এক ভীষণাকৃতি পুরুষ।

সাবিত্রী ঘুমন্ত স্বামীর মাথা ভূতলে রেখে সেই শ্যামবর্ণ পুরুষের কাছে করজোড়ে দণ্ডায়মান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—প্রভু আপনি কে? কি জন্যই বা এখানে এসেছেন?

সেই বিকট দর্শন পুরুষ বললেন—সাবিত্রী, আমি যমরাজ। কারও পরমায়ু শেষ হলে আমি তার আত্মা গ্রহণ করে নিজালয়ে নিয়ে যাই। তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠান সম্পন্না, তাই তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ, তা না হলে জীবলোকের কেউ আমাকে দেখতে পায় না। অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি জান যে, আজ তোমার পতির মৃত্যু দিন।

—ধর্মরাজ! একাজ তো আপনার দূতের। তা আপনি এসেছেন কেন?

—সাবিত্রী, তোমার স্বামী সত্যবান পরম ধার্মিক, সাধারণ যমদূতেরা একে নিয়ে গেলে অধর্ম হবে ভেবে আমি স্বয়ং এঁকে নিতে এসেছি। "কৃতান্ত"—এই কথা বলে যমরাজ সত্যবানের দেহ মধ্য থেকে এক পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে আকর্ষণ করে বন্ধনপূর্বক দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন।

ব্রতসিদ্ধা, পতিপ্রাণা সাবিত্রী সত্যবানের জড় দেহ ত্যাগ করে শোকাকুলচিত্তে যমরাজের অনুসরণ করলেন।

যমরাজ সাবিত্রীকে তাঁর পেছু পেছু আসতে দেখে বললেন—সাবিত্রী ফিরে যাও। সামাজিক রীতি পালন কর। সত্যবানের দাহনকার্য সমাধা কর। তোমার পতি তোমার সঙ্গে থাকার যতদিন অধিকার ছিল, ততদিনই সে তোমায় সঙ্গ দিয়েছে। এখন সে আমার।

যমরাজের কথা শুনে সাবিত্রী বললেন—আমার স্বামী যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব। এটাই সতী নারীর ধর্ম ও কর্ম। ধর্মরাজ! তপস্যা, গুরুভক্তি, স্বামীর স্নেহ, ব্রত এবং আপনার অনুগ্রহে আমার গতি অপ্রতিহত রয়েছে। এখন আমি আপনাকে কয়েকটি কথা বলছি দয়া করে শুনুন।—অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে এসে গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্ম পালন করেন না। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই আশ্রম ধর্ম পালন করে থাকেন। এসব ধর্মের মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্মই প্রধান। সব আশ্রমবাসীই প্রথমতঃ এই ধর্ম প্রতিপালন করে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে থাকেন। আমার মত লোক পূর্বোক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় আশ্রম অবলম্বনে অভিলাষী না, আর পণ্ডিতগণ প্রথম আশ্রমকেই প্রধান বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

সাবিত্রীর একথা শুনে যম বললেন—সাবিত্রী তোমার বক্তব্য যুক্তিযুক্ত। আমি তোমায় খুশী হয়ে বর দিতে চাই। সত্যবানের প্রাণ ছাড়া তুমি আর যে বর চাইবে আমি দেব।

সাবিত্রী বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা মহিলাদের অগ্রণী ছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদকে উপেক্ষা করা অনুচিত। এসব বিবেচনা করে তিনি বললেন—ধর্মরাজ! আপনি আমার অন্ধ শ্বশুরের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন। তিনি যেন তার শারীরিক সক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন।

—তাই হবে। এই মুহূর্তে তোমার শ্বশুর তার দৃষ্টি ফিরে পাবেন এবং একজন যুবকের মত বলবান হবেন। এবার তুমি ফিরে যাও। পথের ক্লান্তিতে তোমার ঘাম ঝরছে।

—ধর্মরাজ! স্বামীর সঙ্গে থাকলে পতিব্রতা নারীর কষ্ট হয় না। আপনি তো জানেন স্বামীই পত্নীর একমাত্র গতি। অতএব আপনি আমার স্বামীকে যেখানে নিয়ে যাবেন আমিও সেখানে যাব। দেখুন, সাধুগণের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হলে মিত্রতা জন্মে। সাধু সঙ্গ কখনও নিস্ফল হয় না। এইজন্য সব সময় সাধু সংসর্গে বাস করা উচিত।

—সাবিত্রী, তোমার কথা হৃদয়রঞ্জন, হিতকর এবং জ্ঞানগর্ভ। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া অন্য বর চাও।

—ধর্মরাজ! আমার শ্বশুর যেন তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পান এবং জীবনে স্বধর্ম ও রাজ্যচ্যুত না হন, এই বর দিন।

—বেশ তাই হবে। তুমি এবার ফিরে যাও।

—ধর্মরাজ! প্রজাগণ আপনারই নিয়মে নিগৃহীত হচ্ছে এবং আপনিই রীতি অনুযায়ী তাদের কামনা পূরণ করছেন, বাসনার বহ্নি জ্বালাচ্ছেন। এইজন্য আপনি বিশ্বখ্যাত। যাই হোক এবার আমার কটি কথা শুনুন—কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি আগ্রহ এবং অনুগ্রহ দান করাই সাধুদের সনাতন ধর্ম। বর্তমান বিশ্বে প্রায় সব মানুষই ভক্তিপ্রবণ। সজ্জনগণ শত্রুদেরও দয়া করে থাকেন। তবে আমার প্রতি আপনি এত নির্দয় কেন?

—সাবিত্রী, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে পানীয়ের যেমন সমাদর হয়, তোমার কথা সাধুদেরও আদরণীয় হওয়া উচিত। আমিও তোমার

কথায় খুশী হয়েছি। তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে কোন বর চাইবে আমি দেব।

বুদ্ধিমতী সাবিত্রী এবারও দেবতার এ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করলেন না। বললেন—ধর্মরাজ! আমার পিতার আমি ভিন্ন অন্য কোন সন্তান নেই। অতএব আমার পিতা যাতে শত পুত্রের জনক হয় এই বর দিন।

—বেশ তাই হবে। তোমার পিতা শত পুত্রের জনক হবেন। এবার খুশী মনে ফিরে যাও। তুমি কিন্তু অনেক দূর এসেছ।

—ধর্মরাজ! আমি আপনাকে আগে বলেছি, আবার বলছি, স্বামীর সংগে চলতে গিয়ে পথ যত কঠিন ও দুর্গম হোক আর তার সীমারেখা যত দীর্ঘই হোক, তা পতিব্রতা স্ত্রীদের গায়ে লাগে না। আমার মন এর চেয়েও দূরতর পথে ধাবমান হচ্ছে। আমি আবারও বলছি শুনুন—আপনি ভগবান বিবস্বনের পুত্র। এজন্য পণ্ডিতগণ আপনাকে বৈবস্বত বলেও অভিহিত করেন। আর ইহলোকের প্রজারা আপনার পক্ষপাতহীন ধর্মশাসনে বিচরণ করছে। এইজন্য আপনাকে লোকে ধর্মরাজ বলে। ধর্মরাজ! সাধু ব্যক্তিকে যতদূর বিশ্বাস করা যায়, আপনার প্রতি আমার ততদূর বিশ্বাস এখনও জন্মেনি, অথচ আপনি সাধুদের ঊর্ধ্বে। এইজন্য আপনার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তর করতে আপনার সঙ্গে এগোচ্ছি।

—সাবিত্রী, তোমার মুখে আজ আমি যে কথা শুনলাম, ইতিপূর্বে আর কারও কাছে শুনিনি। এখন তুমি আমার কাছে চতুর্থ বর প্রার্থনা কর এবং তা লাভ করে ফিরে যাও। তবে সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দেবার বর চাইবে না।

—বেশ, আপনি যদি আমায় বর দিতে চান, তবে এই বর দিন, যাতে সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্যশালী কুলবর্ধন একশত পুত্র জন্মে।

—বেশ তাই হবে। তুমি বলবীর্যশালী শত পুত্রের জননী হবে। এবার ফিরে যাও সাবিত্রী।

যমরাজের একথাতেও সাবিত্রী তাঁর যাত্রাপথ স্তব্ধ না করে বললেন—সজ্জনের ধর্মবৃত্তি চিরকালই সমান। সজ্জনেরা কখনও অবসন্ন বা ব্যথিত হন না। আর সজ্জনের সঙ্গে সজ্জনের সমাগম কখনও বিফল হয় না এবং সজ্জনের সামনে কখনও কেউ ভীত হন না। এই সজ্জনেরাই তাঁদের সত্য দ্বারা সূর্যকে চালনা করছেন। এই সজ্জনেরাই তপস্যা দ্বারা পৃথিবী ধারণ করছেন, এই সজ্জনেরাই ভূত ভবিষ্যতের গতি, এই সজ্জনেরা সজ্জন সমাজে কখনও অবসন্ন হন না। সাধুগণ পরস্পর অপেক্ষা না করে আর্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চিরকাল পরোপকার করে থাকেন। সাধুগণের অনুগ্রহ কখনও বিফল হয় না এবং তাঁদের কাছে অর্থ বা মানের হানি হয় না। অর্থ এবং মান দুইই সাধুর অব্যাহত থাকে অতএব সাধুগণ সকলের রক্ষাকর্তা।

—সাবিত্রী, আমি তোমার সুবিন্যস্ত ধর্ম সংহতি যুক্ত কথা যত শুনছি, ততই আমার ভক্তিবৃত্তি তোমার উপর উচ্ছলিত হচ্ছে। অতএব আবারও তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

—ধর্মরাজ ! স্বামীর ঔরসজাত পুত্র যেরূপ—জারজ পুত্র তদ্রূপ নয়। তাছাড়া পতিহীনা হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। অতএব আমার স্বামী সত্যবানের জীবন আমাকে দান করুন। আমি স্বামীহীন সুখ-স্বর্গ বা শ্রীর অভিলাষিনী নই। স্বামী ছাড়া জীবন-ধারণ করাতেও আমার প্রবৃত্তি নেই। আপনি আমাকে শত পুত্রের জননী হবার বর দিয়েছেন—আর এখন আপনিই আমার পতিকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি ধর্মরাজ হয়ে কি করে একজন সতীকে পতি ভিন্ন সন্তানের জননী হবার বর দিচ্ছেন ? আমার সন্তানদের লোকে জারজ বলবে, আমায় বলবে কুলটা বা দ্বিচারিণী। একজন সতী নারীর জীবনে এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তাই হয় আমার স্বামী সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দেবার বর দিন—নচেৎ আমার প্রাণ নিন। আজ আপনার কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সত্যবানের জীবন আপনার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তা না

হলে আমি প্রাণ ত্যাগ করব এবং আমাকে শত পুত্রের জননী হবার জন্য আপনি যে বর দিয়েছেন তা মিথ্যা হবে।

ধর্মরাজ সাবিত্রীর যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারলেন না। বললেন —তথাস্তু! সাবিত্রী, জীবনে এই আমি প্রথম হার স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। তোমার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দিলাম। তোমার স্বামী চারশ' বছর জীবিত থাকবেন। যজ্ঞ, ধর্ম, ও ন্যায়ের জন্য বিখ্যাত হবেন এবং ওর ঔরসে তোমার গর্ভে শত পুত্র জন্মাবে। তবে তারা তোমার পদবী বহন করবে। তারাও রাজ্য, পুত্র-পৌত্রী নিয়ে সুখে রাজত্ব করবে এবং সমাজে সমাদৃত ও সুবিখ্যাত হবে। তোমার পিতা ও মাতা মালবীর গর্ভে মানব নামে এক পুত্র এবং ইন্দ্রের মত আরও শত পুত্র হবে। এই কথা বলে যম স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

সতী সাবিত্রীর স্বামীর মঙ্গলের জন্য ব্রত উদ্‌যাপন সার্থক হল। সৃষ্টি হল নারী জগতে এক মহান ইতিহাসের। ধন্য সত্যবান, সাবিত্রীর মত স্ত্রীর স্বামী হতে পেরে। ধন্য তার শ্বশুর, তাঁর মত পুত্রবধূ পেয়ে। ধন্য ধরণী, তাঁর মত সাধ্বী রমণীর স্পর্শ পেয়ে। যতদিন সৃষ্টি থাকবে, ততদিন সাবিত্রীর নাম থাকবে।

পতি অনুগামিনী চিন্তা

প্রতিদিনের মত সেদিনও চিত্র সেনের কন্যা চিন্তার স্বামী শ্রীবৎস স্নান করতে বের হচ্ছেন, এমন সময় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ও শনিঠাকুর তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন।

ধর্মপরায়ণ নৃপতি তাঁদের সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, করজোড়ে মধুমাখা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—বলুন, আমি আপনাদের জন্য কি করব? আমার দ্বারা কি কোনরূপ অন্যায় আচরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে?

শ্রীবৎসের কথা শুনে রবিস্মৃত বললেন—মহারাজ! আজ আমার ও লক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তোমায় বলতে হবে, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তুমি বিচক্ষণ ও ন্যায়-পরায়ণ, তোমায় বিচার করে বলতে হবে আমাদের মধ্যে কার স্থান উঁচুতে।

—প্রভু! এতো আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনারা স্বর্গের দেবতা হয়ে আমার মত মর্ত্যের দীন সেবকের কাছে বিচারের জন্য এসেছেন। আমায় এজন্য একটি দিন সময় দিন। আমি আগামী কাল আপনাদের জানিয়ে দেব আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

গৃহে ফিরে রাজা সহধর্মিনী পাত্র মিত্র ও মন্ত্রীর সংগে পরামর্শ করে তাঁর সিংহাসনের দু'পাশে দু'খানা সিংহাসন রাখলেন। তার মধ্যে একখানা রূপার অন্যখানা সোনার।

* * *

বিচার সভা বসল।

রাজার বিচার সভায় আজ তিল ধারণের স্থান নেই। বিশ্বের ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। স্বয়ং শনিদেব ও লক্ষ্মীদেবী

আজ বিচারের জন্য মর্ত্যে আসছেন শ্রীবৎস রাজার দরবারে। দেব-দেবীকে দর্শন ও রাজার বিচারে কে শ্রেষ্ঠ হয়, তা দেখবার জন্য আজ আবালবৃদ্ধবণিতায় ভরে গেছে রাজ দরবার।

যথা সময়ে লক্ষ্মী ও শনি দু'জন এসে রাজার দু'পাশে রাখা দু'টি আসন দখল করে বসলেন।

সোনার আসনে বসলেন লক্ষ্মী আর রূপার আসনে শনি।

এবার তাঁদের মাঝখানে বসলেন বিচারপতি শ্রীবৎস।

বেশ কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে নানারূপ আলোচনা হল। শেষে শনিই জিজ্ঞেস করলেন—মহারাজ! এবার বল, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

একথা শুনে মৃদু হেসে শ্রীবৎস বললেন—ঠাকুর! আসন ও ছত্র দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে কে ছোট এবং কে বড়। সাধারণ ব্যক্তি রাজার বামে এবং শ্রেষ্ঠ দক্ষিণে বসে। আর সোনা সব সময়ই রূপার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

একথা শুনে তপন-তনয় শনিদেব ক্রুদ্ধ হয়ে ম্লান মুখে শ্রীবৎস রাজার আলয় ত্যাগ করে স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

লক্ষ্মী তখন শ্রীবৎস রাজাকে বললেন—মহারাজ! তোমার দ্বারা আজ আমার মান বৃদ্ধি হল। আজ থেকে আমি তোমার গৃহে চিরকাল অচলা হয়ে থাকব।

* * *

এই ঘটনার পর আরও বহু বছর কেটে গেল। শ্রীবৎস তাঁর রাণী চিন্তার সঙ্গে পরম সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

শনিদেব অবশ্য তাঁর পেছু পেছু ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। উদ্দেশ্য কোন ত্রুটি পেলে তাঁর ভিতর প্রবেশ করে তাঁর ক্ষতি সাধন করা।

সুযোগ একদিন মিলে গেল। একদিন স্নান করে সিংহাসনে উপবেশন করার সময় তিনি যে জল হস্ত পদ প্রক্ষালনের জন্য রেখে এসেছিলেন, তা একটি কৃষ্ণবর্ণের কুকুরে পান করল। দরবারের কাজ

সেরে তিনি আবার ঐ জলেই পদ প্রক্ষালন করলেন। ছিদ্রান্বেষণকারী শনিদেব এই ত্রুটি পেয়ে শ্রীবৎসরাজার দেহে, প্রবেশ করলেন অর্থাৎ শ্রীবৎস শনিদশাগ্রস্ত হলেন।

শনির কোপে পড়ে তাঁর বুদ্ধি ভ্রংশ হল। নষ্ট হতে লাগল তাঁর বৈভবাদি। হঠাৎ একদিন তাঁর দেব মন্দির ভেঙ্গে পড়ল। খাদ্যভাণ্ডারে আগুন লেগে সব খাদ্যশস্য নষ্ট হল। বিনা মেঘে বজ্রপাত হতে লাগল। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, উল্কাপাত হল। মহামারী, অনাহারে মারা গেল লক্ষ লক্ষ মানুষ ও গবাদি পশু। দলে দলে প্রজারা রাজার কাছে এসে সাহায্যের আবেদন জানালেন। অনেকে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যেতে লাগলেন। আর কেউ কেউ আবার রাজার দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগে অনীহা প্রকাশ করলেন।

রাজা শ্রীবৎস তিন দিন তিন রাত রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে প্রজাদের দুঃখে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। রাজার চোখে জল দেখে পতিব্রতা সতী চিন্তারও দু'চোখ জলে ভরে উঠলো।

উভয়ের কান্নার বেগ প্রশমিত হলে শ্রীবৎস চিন্তাকে বললেন—চিন্তা, বুঝতে পারছি শনি আমাকে বেশ কিছুদিন কষ্ট দেবেন। দেখ, এখনও ঘরে যা কিছু সম্পদ আছে তা এক জায়গায় জড়ো করে কোন বস্ত্রের ভিতর রেখে একটা পুঁটলি বাঁধ। আর তা নিয়ে তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও।

—আর তুমি ?

—আমার ভাগ্য আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব। বুঝতেই তো পারছো আমার জীবনে এখন বহু বিপর্যয় ঘটবে। আমার সঙ্গে থাকলে তোমাকেও তা ভোগ করতে হবে। তুমি তা পারবে না। আবার দুর্যোগ কেটে গেলে আমি তোমাকে নিয়ে আসব।

স্বামীর একথা শুনে চিন্তা বললেন—মহারাজ! সুখে-দুঃখে, জীবনে-মরণে, বিপদে-আপদে, জীবনসঙ্গিনীরই তো কাছে থাকা উচিত। আর এই মন্ত্র পড়েই তো আমরা উভয়ে অগ্নি ও নারায়ণ

শিলাকে সাক্ষী রেখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আজ তোমাকে এভাবে একা ফেলে আমি কোথায় যাব? তাছাড়া পতির দুর্দিনে কেউ বাপের বাড়ী যায় না। এতে শত্রু হাসবে। আমি তা সইতে পারব না। তোমার যা হবে, আমারও তাই হবে। শনিদশাগ্রস্ত হয়ে তোমার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে, তাই একথা বলছো। আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি তবে তোমার সেবা করতে, তোমায় বুদ্ধি বল ও সাহস যোগাতে পারব। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। তাছাড়া একবার ভেবে দেখ, গৃহিণী থাকলেই তাকে লোকে গৃহস্থ বলে। আর যেখানে উভয়ে থাকে সুখ সেখানেই। আজ শনিদশা-গ্রস্ত হয়ে যদি তুমি আমাকে ত্যাগ কর, তবে যে আরও দুঃখ পাবে।

চিন্তাকে তার পিত্রালয়ে পাঠাতে ব্যর্থ হয়ে সেই রাতেই শ্রীবৎস চিন্তাকে নিয়ে ঐ সামান্য সম্পদের পুঁটলিটি নিয়ে গভীর বনের দিকে যাত্রা করলেন।

নির্জন বনের পথে কিছুদূর এগোতেই এক বিশাল নদী দেখে থমকে দাঁড়ালেন দু'জন। কি করে নদী পার হবেন এই চিন্তায় যখন বিব্রত হলেন শ্রীবৎস, ঠিক তখন তাঁর সামনে একজন মাঝি একটি ভাঙ্গা নৌকা নিয়ে হাজির হল।

সামনে তরী দেখে শ্রীবৎস রাজা তার নিজ পরিচয় দিয়ে তাঁদের নদী পার করার আবেদন জানালে মাঝি বলল—মহারাজ! আমার তরী জীর্ণ ও ভগ্ন। বড় জোর দু'জন এক সঙ্গে পার হতে পারে। তিন জন নয়। তুমি বুদ্ধিমান ও বিবেচক, তাই চিন্তা করে দেখ ঐ পুঁটলিটা ভূমিতে রেখে তোমরা দু'জনে আগে পার হবে, না পুঁটলিটা আগে পার করে তোমরা দু'জনে পরে পার হবে?

মাঝির কথা শুনে রাজা আগে পুঁটলিটা পার করে পরে দু'জনে পার হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পুঁটলিটি নৌকায় তুলে দিলেন।

মাঝি তা নিয়ে মনের আনন্দে বেয়ে চলল। হঠাৎ দেখা গেল তারা বনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে কোন নদীও নেই মাঝি ও নৌকাও নেই।

শ্রীবৎস ও চিন্তা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন শেষ সম্বলটুকু হারাবার শোকে।

শ্রীবৎস বললেন—চিন্তা, শনি ছলনা করে আমাদের শেষ সম্বল-টুকুও চুরি করে পালিয়েছেন। তাছাড়া দেখ, আমারও তাঁর প্রকোপে পড়ে কেমন বুদ্ধি ভ্রংশ হল যে, আমরা না পার হয়ে ঐ ধন সম্পত্তির পুঁটলিটা তার নৌকায় তুলে দিলাম। এবার থেকে আমাদের খুব বিবেচনা করে কাজ করতে হবে।

* * *

ভোরের আলো ফুটে উঠবার আগে তারা চিত্রধ্বজ নামক এক মনোরম অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

মনোরম অরণ্যে একটি মনোহর সরোবর দেখে চিন্তা পতিকে বললেন—মহারাজ! আর চলতে পারছি না। এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। তুমিও তো ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। এখন আমরা উভয়ে এখানে স্নান করে কিছু সময় বিশ্রাম করি। চেষ্টা করলে বনফলে ক্ষুধারও নিবৃত্তি হতে পারে।

চিন্তাকে সরোবরের তীরে স্নান ও বিশ্রাম করার সুযোগ দিয়ে মহারাজ আহারের জন্য ফলের সন্ধানে বনে গেলেন এবং কিছু পাকা কুল সংগ্রহ করে ফিরে এলেন। স্নান করে উভয়েই সেদিন ঐ ফলেই তাঁদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করলেন।

এরপর তাঁরা বহু বন উপবন, পর্বত, নদ-নদী অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে আর একটি অরণ্যে বসবাস করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ফলমূল আহার করে এবং ঝর্ণার জল পান করে তাঁদের দিন বেশ ভালই কাটছিল।

এই সময় একদিন স্থানীয় বন সংলগ্ন এক নদীতে ধীবরেরা মাছ ধরতে এলে মাছ খাবার বাসনায় শ্রীবৎস তাদের কাছে কিছু মাছ খেতে চাইলে তারা বলল—দেখ, আজ সারাদিন জলে জাল ফেলে কিছু না পেয়ে এখন বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছি।

—বেশ তো, আমার কথায় আর একবার জলে জাল ফেল দেখবে প্রচুর মাছ পাবে।

অনিচ্ছা সত্বেও জেলেরা শ্রীবৎসের কথায় আবার জলে জাল ফেলল এবং সত্যিই প্রচুর মাছ পেল। তারা তখন একটি বড় শোল মাছ রাজাকে খেতে দিল।

মাছটি পেয়ে রাজা চিন্তার হাতে তা দিয়ে বললেন—চিন্তা, শুনেছি পোড়া শোল মাছ খেলে শনির দৃষ্টি কেটে যায়, তুমি আজ এই শোল মাছটি পুড়িয়ে আমাকে খেতে দেবে।

পোড়া শোল মাছ খেলে শনির দশা কাটে এটা জানতে পেরে চিন্তা পরমানন্দে আগুন জ্বেলে মাছটি পোড়ালেন। মনে মনে ভাবলেন—যাঁর পাতে শতেক ব্যাঞ্জন ও ক্ষীর, ননী-ছানা দিয়েছি এই পোড়া শোল মাছ আজ তাঁর পাতে দেই কি করে! এসব ভেবে তিনি ঐ মাছটি নদীতে ধুতে গেলেন। জলের কাছে মাছটি নিয়ে যেতেই মাছটি অকস্মাৎ প্রাণ ফিরে পেয়ে জলের ভিতর ছুটে পালাল।

এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে চিন্তা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। ভাবলেন, ক্ষুধার্ত রাজা খেতে এসে শোল মাছ পোড়া খেতে চেয়ে, তা না পেয়ে তার কারণ জিজ্ঞেস করবেন এবং যখন পোড়া মাছ পালাবার কথা শুনবেন, তখন তা বিশ্বাস করবেন না। ভাববেন আমি ক্ষুধার তাড়নায় তা ভক্ষণ করে এখন মিথ্যা বলছি।

কি করবেন ভেবে না পেয়ে চিন্তা কাঁদছেন, এমন সময় শ্রীবৎস এসে তার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে সব জানতে পেরে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—চিন্তা বৃথাই তুমি কাঁদছো, এসবই শনির ছলনা। স্বয়ং রামচন্দ্র তাঁর কোপে পড়ে বনবাসী হয়েছিলেন, সীতাকে লঙ্কার রাবণ হরণ করেছিল, দক্ষ রাজার যজ্ঞ পণ্ড হয়ে তাঁর ছাগলের মুণ্ড হয়েছিল, বলি পাতালে বন্দী হয়েছিল, বৈকুণ্ঠবাসী হরি কীটরূপ ধারণ করে গণ্ডকী পর্বতে ছিলেন। আমি সেই শনির কোপে পড়েছি। চিন্তা, আমার কপালে আরও দুর্গতি আছে।

এরপর আরও কিছুদিন অতিবাহিত হল শ্রীবৎস ও চিন্তার বনে-উপবনে। তারপর তারা স্থায়ী বসবাসের জন্য এবং অর্থ উপায়ের জন্য এক কাঠুরিয়া পল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন।

কাঠুরিয়াগণ শ্রীবৎসকে তাদের সঙ্গী করে নিলেন। শুরু হল এদের নতুন জীবন।

রাজা প্রতিদিন বনে কাঠ কাটতে যান আর চিন্তা কাঠুরিয়া রমণীদের মাঝে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। ধর্মীয় উপদেশমূলক নানারূপ কাহিনী শোনান। সকলেই মহারাণী চিন্তাকে রাণীর মত শ্রদ্ধা করে, তাঁর কথা শোনে।

শ্রীবৎস একদিন কাঠুরিয়াদের সঙ্গে কাঠ কাটতে গিয়ে ওদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর বনে প্রবেশ করে চন্দনের কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে এক বণিকের দোকানে বেঁচে উপযুক্ত দাম পেয়ে, তা দিয়ে মাছ, মাংস, দধি, মিষ্ট থেকে আরম্ভ করে প্রচুর সামগ্রী কিনলেন এবং সমস্ত কাঠুরিয়াদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন।

দীর্ঘদিন বাদে অতিথি সৎকার করতে পেরে শ্রীবৎস ও চিন্তার মনে আনন্দের বান ডাকল।

এইভাবে বেশ সুখেই দিন কাটছিল।

একদিন কাঠুরিয়াগণের সঙ্গে শ্রীবৎস কাঠ কাটতে গেলে, তাঁদের বসতির অনতিদূরে নদী দিয়ে এক সওদাগর বাণিজ্য তরী বেয়ে যেতে থাকলে, তার তরী চড়ায় আটকে গেল। শত চেষ্টা করেও নৌকা এক চুলও সরল না। এখন কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় গণকের বেশ ধরে শনি সেখানে এসে হাজির হলেন।

গণৎকারকে দেখে সমাদর করে বসতে দিয়ে বণিক বললেন—দৈবাচার্য, বলুন তো আমার নৌকা কেন চড়ায় ভিড়ল?

খড়ি পেতে গণনা করে দৈবচার্যরূপী শনি বললেন—তুমি বাণিজ্যে আসার সময় শনিপূজা করনি বলে তোমার তরী চড়ায় আটকা পড়েছে।

—এখন কি করলে আমার এই তরী জলে ভাসবে?

—দেখ, এখানে কয়েকশ' ঘর কাঠুরিয়া আছে। তাদের ভিতর একজন সতী ও পতিব্রতা রমণী আছে। সে যদি এসে তোমার তরী স্পর্শ করে তবেই তা জলে ভাসবে। নচেৎ নয়।

দৈবাচার্য শনি বিদায় নিলে সওদাগর তার এক আজ্ঞাবাহী ভৃত্যকে কাঠুরিয়া পল্লীতে পাঠালেন।

দরিদ্র কাঠুরিয়া ভার্যাগণ অর্থের প্রলোভনে দলে দলে এসে তরী স্পর্শ করল, কিন্তু তরী এক চুলও নড়ল না। তিনি তখন তার অনুচরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—কাঠুরিয়া রমণীদের সব এসেছে তো?

—না।

—আর কে বাকী আছে?

—একজন মাত্র রমণী আসেন নি। তিনি তাঁর পতির অনুমতি ভিন্ন কোথাও যান না।

সওদাগর বুঝলেন এই রমণীই তবে সেই পতিব্রতা রমণী। যাঁর স্পর্শে আমার তরী জলে ভাসবে। তিনি এও বুঝলেন, এই পতিব্রতা সতীর কাছে কোন অনুচর পাঠিয়ে কাজ হবে না। তাই তিনি নিজে কাঠুরিয়া পল্লীতে গিয়ে চিন্তার কুটিরের সামনে হাজির হয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে করজোড়ে কাতর স্বরে বললেন—পতিব্রতে, আমি বড় বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমায় পরিত্রাণ করুন। আমার বাণিজ্য তরী তীরে আটকে গেছে। পতিব্রতা সতীর পরশ ছাড়া তাকে জলে ভাসানো যাবে না। আপনার এই কাঠুরিয়া পল্লীর সব ভার্যারাই গিয়ে সে তরী স্পর্শ করেছে কিন্তু তরী জলে ভাসেনি। একমাত্র আপনি যাননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনিই সেই পরম সতী। আপনার পরশে আমার বাণিজ্য তরী জলে ভাসবে।

সওদাগরের কাতরতা চিন্তার অন্তর স্পর্শ করল। মধুর স্বরে তিনি বললেন—দেখুন, আমার স্বামী বাইরে গেছেন তাঁর অনুমতি ছাড়া আমি যাই কি করে?

—কিন্তু শরণাগত বিপদগ্রস্তকে রক্ষা করা, তার উপকার করাও কি শাস্ত্রীয় বিধি নয়?

সওদাগরের কথার যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করতে পারলেন না চিন্তা। কাতর শরণাগতকে রক্ষা করা শাস্ত্রীয় বিধি। তাতে ধর্ম রক্ষা হয়। অতএব ধর্ম রক্ষার্থে যদি আমি শরণাগত সওদাগরের হিতার্থে নদীতটে গিয়ে তার বাণিজ্য তরীকে উদ্ধার করি, তবে রাজা কিছু বলবেন না। এসব কথা চিন্তা করে চিন্তা সওদাগরের সঙ্গে নদীতটে গিয়ে করজোড়ে দেব দিবাকরের স্তুতি করে, তেত্রিশ কোটি দেবতাদের উদ্দেশ্যে বললেন—আমি যদি মনে প্রাণে পতিব্রতা সতী হই, স্বামী ছাড়া অন্য কারও কথা স্বপ্নেও চিন্তা না করি, তবে যেন আমি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে এ নৌকা জলে ভাসে।

এই কথা বলে তরী স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তা চড়া ছেড়ে জলে ভাসল।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সওদাগর মনে মনে চিন্তা করলেন—এই রমণী পতিব্রতা সতী তো বটেই কিন্তু মানবী নন। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবী। একে ত্যাগ করা যাবে না। আজ আমি একে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। যদি আবার কখনও তরী আটকে যায় তবে এর স্পর্শে তা জলে ভাসবে। এসব চিন্তা করে বণিক চিন্তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিলেন।

চিন্তা উচ্চৈস্বরে দিবাকরকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন—হে দিননাথ তুমি আমার রূপ গ্রহণ করে আমায় কুরূপা করে দাও। আমি যেন কারও লালসার শিকার না হই।

পতিব্রতা সতী চিন্তার কাতর কাকুতি মেশানো কান্না দিবাকরের হৃদয় স্পর্শ করল। তাঁর মনোবাসনা পূরণার্থে তিনি বললেন—চিন্তা, তুমি শোক পরিহার কর। আমি তোমার রূপ হরণ করলাম। মনে প্রাণে পতির প্রতি অচলা ভক্তি রেখ। তাঁকে আবার ফিরে পাবে। আর যখনই আমায় স্মরণ করে পূর্বের রূপ ফিরে চাইবে, পাবে।

দেখতে দেখতে আগুনে পুড়লে যেরূপ ঝলসানো চেহারা হয় অনুরূপ-রূপে রূপান্তরিতা হলেন চিন্তা।

সওদাগরের নৌকা দক্ষিণদিকে বয়ে চলল।

* * *

প্রতিদিনের মত কাঠ কেটে ফিরে শ্রীবৎস চিন্তাকে ডেকে সাড়া না পেয়ে অস্থির হয়ে কাঠুরিয়াদের কাছে চিন্তার খবর জিজ্ঞেস করে বণিক কর্তৃক চিন্তা হরণ হয়েছে শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

কাঠুরিয়াগণ তাঁকে সুস্থ করে তুললে তিনি বিলাপ করতে করতে পাগলের ন্যায় নদীতট ধরে ছুটতে লাগলেন। যাকেই দেখেন তাকেই বণিকের নৌকার কথা জিজ্ঞেস করেন আর তারা কোন সুন্দরী রমণীকে বিলাপ করতে শুনেছে কিনা তারও খোঁজ নেন।

এইভাবে বহু নগর বন-উপবন, নদী পর্বত পেরিয়ে অবশেষে ক্লান্ত শ্রান্ত শোকতপ্ত শ্রীবৎস চিত্তানন্দ নামক এক বনের মাঝে সুরভির আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

সুরভি রাজা শ্রীবৎসের পরিচয় পেয়ে তাঁর মুখে তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে বললেন—মহারাজ! তুমি এখানে নির্ভয়ে থাকতে পার। শনির দ্বারা এখানে তোমার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। গ্রহের ফেরে তুমি কষ্ট পাচ্ছ। গ্রহ কেটে গেলে আবার চিন্তার দেখা পাবে। তাই যতদিন শনির দশা না কাটে এখানেই অবস্থান কর।

সুরভির কথাতে শ্রীবৎস তাঁর আশ্রমেই থেকে গেলেন।

কিছুদিন বেশ সুখেই অতিবাহিত হল। চুপচাপ অলসভাবে বসে থাকতে কোনদিনও অভ্যস্ত ছিলেন না শ্রীবৎস। তাই তিনি সুরভির দুধ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে কাদা করে, চিন্তা দেবী ও তাল-বেতালকে স্মরণ করে যুগ্ম পাট তৈরী করতে লাগলেন। তাল-বেতালের দ্বারা সেই পাট সোনাতে পরিণত হল। এইভাবে শত সহস্র স্বর্ণপাট তৈরী করে তিনি স্তূপাকার করলেন এই আশা নিয়ে, যদি কোন

বাণিজ্য তরী এই পথ দিয়ে যায়, তবে তাদের কাছে এই পাট বিক্রি করে কিছু ধন উপার্জন করবেন।

একদিন সেই নদীপথে ঐ বণিকের বাণিজ্য তরীকে যেতে দেখে শ্রীবৎস তরী তীরে ভেড়াবার জন্য আহ্বান করলেন।

বণিক তরী তীরে ভিড়িয়ে শ্রীবৎসের কাছে এলে রাজা তাকে স্বর্ণপাটগুলি দেখিয়ে বললেন—দেখ, আমি এই স্বর্ণ পাটগুলি তৈরী করেছি। তুমি যদি এই স্বর্ণপাট সহ আমায় তোমার তরীতে স্থান দাও, তবে তোমাদের সঙ্গে বিদেশে গিয়ে এই স্বর্ণ পাট বিক্রি করে আমিও কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারি।

রাজার কথা শুনে সেই বণিক মহানন্দে তাঁকে নৌকায় নিয়ে গেলেন এবং তাঁর কর্মচারীদের স্বর্ণপাটগুলি নৌকায় তোলার আদেশ দিলেন।

সব স্বর্ণপাট নৌকায় তোলা হলে লোভী বণিক মনে মনে চিন্তা করল—সারাজীবন ব্যবসা করে যে ধন আমি লাভ করেছি, এ তার চেয়ে অনেক বেশী। আজ দৈবের বশে এ ধন যখন আমার হাতে এসেছে, তখন এ ধন আমি একা ভোগ করব।

এই কথা চিন্তা করে সে তার অনুচরদের আদেশ দিল শ্রীবৎসকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেবার।

আচমকা চার পাঁচজন ষণ্ডা মার্কা লোক শ্রীবৎসকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলতে সচেষ্ট হলে শ্রীবৎস চীৎকার করে বলতে লাগলেন—হে বিপদভঞ্জন মধুসূদন আমায় রক্ষা কর। চিন্তা, তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে? আর বুঝি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল না। এই দুষ্ট দুরাচার বণিকের কবলে পড়ে আজ আমার প্রাণ যেতে বসেছে।

সেই নৌকায় অবস্থান রত চিন্তা স্বামীর বিলাপ শুনে এগিয়ে এসে তার উদ্দেশ্যে একটি বালিশ ফেলে দিলেন এবং তাল-বেতাল তাঁর ভেলা হল। শ্রীবৎস ভেলায় ও বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে ভেসে চললেন।

এইভাবে ভাসতে ভাসতে শ্রীবৎসের ভেলা একদিন সৌতিপুর নগরের তীরে ভিড়ল।

রম্ভাবতী নামে এক মালিনীর পুষ্প বাগিচায় দীর্ঘদিন কোন পুষ্প প্রস্ফুটিত হচ্ছিল না। কিন্তু শ্রীবৎসের ভেলা সেখানে ভিড়তেই পুষ্প বাগিচায় পুষ্প প্রস্ফুটিত হল, মৃত বৃক্ষ সজীব হল। পাখীরা কলতানে মুখর হল।

এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখে মালিনী রম্ভাবতী পুষ্প বনে এসে এর কারণ অনুসন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কন্দর্পজয়ী রূপের শ্রীবৎসকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? তুমি কি স্বর্গের কোন দেবতা?

—আমি মর্ত্যের মানুষ। দৈব দুর্বিপাকে আমার বাণিজ্য তরী ডুবে যাওয়ায় আমি ভাসতে ভাসতে এখানে এসে পড়েছি।

—বেশ, তুমি যেই হও না কেন, তুমি মহাপুণ্যবান ব্যক্তি। তোমার আগমনে আজ আমার ফুল বাগিচায় প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। তুমি আজ থেকে আমার ভাগিনেয়র পরিচয়ে আমার আলয়ে থাকবে।

মালিনীর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে শ্রীবৎস তার আলয়ে রয়ে গেলেন।

* * *

শ্রীবৎস যে রাজার মালিনীর ঘরে আশ্রয় লাভ করলেন তাঁর নাম বাহুদেব। বাহুদেবের রূপে গুণে অতুলনীয়া কন্যা ভদ্রা, হরগৌরীর উপাসিকা ছিলেন। তার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গৌরী তাকে দর্শন দিয়ে তার মনের মত বর চাইতে বললে ভদ্রা বলল—মা ব্রহ্মময়ী, আমি যেন এ জন্মে শ্রীবৎসকে পতিরূপে পাই।

—বেশ তাই হবে। তোর পতি শ্রীবৎস বর্তমানে তোদের মালিনী রম্ভাবতীর ঘরে আছে। তার গলায় বরমাল্য দিয়ে তুই তোর মনোবাসনা পূরণ কর।

এদিকে বাসুদেব প্রচলিত রাজনীতি পালনার্থে ভদ্রার স্বয়ংবর সভার আয়োজন করে কন্যাকে বরমাল্য হস্তে স্বয়ংবর সভায় প্রেরণ করলে, ভদ্রা সভাসদদের উদ্দেশ্যে বললেন—আপনারা সকলে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। আর প্রার্থনা করুন, আমি যেন আমার মনের মত পতি লাভ করতে পারি। এই কথা বলে ভদ্রা চারদিকে তাকাতে লাগলেন। এমন সময় দৈববাণী শোনা গেল—ভদ্রা, তুমি যে পতিলাভে দ্বাদশ বর্ষ তপস্যা করেছ, সেই পতি রাজসভার বাইরে কদম গাছতলায় বসে আছেন। তিনিই মহারাজ শ্রীবৎস।

ভদ্রা তখন বরমাল্য নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং কদম গাছতলায় অবস্থানকারী শ্রীবৎস রাজার গলায় বরমাল্য দিয়ে করজোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এই দৃশ্য দেখে সমস্ত নৃপতিগণ ভদ্রাকে ছিঃ ছিঃ করতে করতে সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে মহারাজা বাসুদেব ঐ মেয়ের মুখ না দেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁকে বাইরে বসবাসের নির্দেশ দিলেন।

মহারাণী কন্যার সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে তাদের মালিনীর আশ্রয়ে পেয়ে কন্যাকে সন্ত্বনা দিয়ে বললেন—ভদ্রা, দেবী গৌরী ও স্বামীর পরে বিশ্বাস রেখো। তুমি সুখী হবে। আমি রোজ এসে তোমায় দেখে যাব।

* * *

সুখে দুঃখে আরও কিছুদিন কেটে গেল।

সুন্দরী ভার্যা ভদ্রার পরিচর্যাতেও চিন্তার চিন্তা দূর হল না শ্রীবৎসের। রাতদিন খালি এক চিন্তায় তিনি অস্থির হতেন, তাঁর চিন্তার কি করে দিন কাটছে। ভদ্রার সেবা ও অলস জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন শ্রীবৎস ভদ্রাকে বললেন—ভদ্রা, আমি এভাবে অলস জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত নই। তোমার বাবা তো এই নদী পথ দিয়ে যত বাণিজ্য তরী যায় তার কর নেন। আর তার জন্য তো তাঁর কোন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। তোমার বাবা যাতে সেই কাজটি আমায় দেন তার ব্যবস্থা কর।

ভদ্রা তার মায়ের কাছে স্বামীর এই মনোভাবের কথা জ্ঞাপন করলে তিনি বাহুদেবকে বলে জামাইকে ঐ কাজটি পাইয়ে দিলেন।

শ্রীবৎস শুধু চিন্তার জন্যই একাজটি বেছে নিয়েছিলেন। তাঁকে যে বণিক তার নৌকায় নিয়ে গেছে—যদি তার সন্ধান মেলে!

বেশ কিছুদিন নদীতটে বাণিজ্য কর গ্রহণ করতে করতে একদিন সেই বণিকের বাণিজ্য তরীর দেখা পাওয়া গেল।

শ্রীবৎস সেই তরীকে দেখে চিনলেন এবং তা আটক করে তাঁর রক্ষীবাহিনীদের দিয়ে নৌকায় যত স্বর্ণ পাট ছিল তা কূলে তুলে এনে জড়ো করলেন।

সেই বণিক তখন রাজ দরবারে গিয়ে বাহুদেবকে বললেন—মহারাজ! আপনার জামাতা আমার নৌকা থেকে জোরপূর্বক সর্বস্ব অপহরণ করেছে। জল কর ও বাণিজ্য কর গ্রহণ করার সংগে সংগে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়া নিতান্ত অনুচিত।

একথা শুনে ক্রোধান্বিত বাহুদেব নদীতটে ছুটে গিয়ে জামাতাকে জিজ্ঞেস করলেন—এ তুমি কি করেছ? কর গ্রহণ করার অধিকার তোমার আছে। কিন্তু কারও ধন অপহরণ করার অধিকার তো নেই। ওর স্বর্ণপাট ওকে ফিরিয়ে দাও।

—মহারাজ। এই বণিক অতি নীচ ও দুষ্ট প্রকৃতির। এইস্বর্ণপাটগুলি ওর নয়। এখুনি আপনি তার প্রমাণ পাবেন। এই পাটগুলি যদি ও দুখণ্ড করতে পারে তবে ওর—আর যদি আমি পারি তবে আমার।

—বেশ। সওদাগর তুমি এই স্বর্ণপাটগুলি দুখণ্ড কর। দুখণ্ড করে সেগুলি যে তোমার তার প্রমাণ দাও।

একথা শুনে সওদাগর একখানা কুঠার এনে স্বর্ণপাট খোলার জন্য সচেষ্ট হলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও স্বর্ণপাট দুখণ্ড করতে না পেরে লজ্জিত হলেন।

তখন শ্রীবৎস বললেন—সভাসদগণ! দেখুন সওদাগর কুঠারের আঘাতেও যে স্বর্ণপাট খুলতে পারল না, আমি হাতে করে সেই স্বর্ণপাট খুলে দিচ্ছি।

স্বর্ণপাট হাতে করে শ্রীবৎস রাজা তাঁর তাল-বেতালকে স্মরণ করলেন। সংগে সংগে তা দুখণ্ড হয়ে গেল।

তা দেখে সভাসদ্‌গণ পরম বিস্ময়ে তাঁদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে শ্রীবৎসের সামনে এসে তাঁর প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

শ্রীবৎস তখন তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁর জীবনের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলে রাজা বাহুদেব প্রাগদেশাধিপতি শ্রীবৎসকে বললেন—মহারাজ! আমি ও আমার রাজ্য তোমার অধীন। তুমি আমায় ক্ষমা কর। সত্যিই আমার কন্যার গৌরী পূজা সার্থক হয়েছে।

শ্রীবৎস বললেন—মহারাজ! আজ আপনি আমার গুরু। লঘুজনের কাছে গুরুজনের কোন অপরাধ হয় না। এখন এই দুষ্ট বণিকের বিচার করুন আর তার নৌকায় আমার চিন্তা বন্দী আছে তাঁকে উদ্ধার করুন।

একথা শুনে মহারাজ বাহুদেব নদীতটে ছুটে গেলেন এবং নৌকা থেকে চিন্তার বন্ধন মুক্ত করে বললেন—যাও মা, তোমার স্বামী তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

জরাগ্রস্ত গলিত ধবল চেহারার চিন্তাকে দেখে রাজা শ্রীবৎস জিজ্ঞেস করলেন—একি প্রিয়ে! তোমার অমন রূপ এমন হল কি করে?

তখন চিন্তা অকপটে স্বামীকে তাঁর কুরূপ হওয়ার কারণ বর্ণনা করে, সূর্যের স্তুতি করে তাঁর পূর্বের রূপ ফিরে চাইলেন এবং তা ফিরে পেলেন।

এবার শ্রীবৎস চিন্তাকে রাজ অন্তঃপুরে এনে তাঁর এখানে এসে ভদ্রা লাভের কাহিনী বর্ণনা করে ভদ্রার সংগে পরিচয় করালেন।

সব শুনে চিন্তা ভদ্রাকে ছোটো বোনের মত সাদরে কাছে ডেকে নিলেন এবং দুজনেই স্বামী সেবায় নিয়োজিত হলেন।

এদের গ্রহের ফের কেটে গেল এবং কিছুদিনের মধ্যে এরা আবার এদের স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন এবং খুব আড়ম্বরের সংগে শনিপূজা করলেন।

দেবপ্রিয়া সতী দময়ন্তী

বিদর্ভ দেশের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী দময়ন্তী ও নিষধ দেশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ নল—উভয়েই উভয়কে না দেখেও শিশুকাল থেকে উভয়ে উভয়ের কথা এত শুনেছিলেন যে, একে অপরের স্মৃতিকে মনের মাঝে পোষণ করতেন।

বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে নলরাজ দময়ন্তীকে একটিবার চোখের দেখা দেখবার জন্য তাঁদের অন্তঃপুরের উপকণ্ঠে এক নির্জন ক্রীড়া কাননে বাস করতে লাগলেন।

সেই বনের এক সরোবরে সোনার পালকযুক্ত কতকগুলি হাঁসকে চড়ে বেড়াতে দেখে তাদের মধ্যে একটি হাঁসকে নলরাজ ধরে ফেললেন।

হাঁসটি মানুষের কণ্ঠে বলতে লাগল—মহারাজ! আমায় মারবেন না। আমায় ছেড়ে দিন। আমি সব সময় আপনার আদেশ পালন করব। দেখুন, আমি এও জানি আপনি কেন রাজধানী ছেড়ে এই নির্জন ক্রীড়া কাননে বসবাস করছেন।

--কি জান?

—আমি জানি আপনি দময়ন্তীর সংগে কথা বলতে চান এবং আপনার কথা তাঁকে জানাতে চান।

--হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি আমার মনের কথা তাঁকে গিয়ে বলতে পারবে?

—পারব। আমি কৌশলে তাঁর কাছে এমন ভাবে আপনার গুণ কীর্ত্তন করব যে, সে সব সময় আপনার প্রতি আসক্ত থাকে।

হাঁসের মুখে একথা শুনে নলরাজ তার পরে বিশ্বাস রেখে তাকে ছেড়ে দিলেন।

এই হাঁসের মাধ্যমে নল ও দময়ন্তী পরস্পর পরস্পরের মনের কথা জানলেন এবং দময়ন্তী মনে মনে নলকেই তাঁর স্বামীরূপে বরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

* * *

যথা সময়ে বিদর্ভরাজ দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভার আয়োজন করে রাজাদের আমন্ত্রণ জানালেন। মর্ত্যলোকের সমস্ত নৃপতিগণের সংগে ধর্মরাজ, ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণদেবও দময়ন্তী লাভ করার মানসে মনুষ্য-রূপ ধারণ করে সেই সভার উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

আকাশ মার্গ থেকে দেবতারা দেখতে পেলেন নলরাজকে। শত সহস্র নৃপতিদের মধ্যে তাঁকে দেখে দেবতারা বিস্ময়ান্বিত হলেন। দেবকুলেও এরূপ দুর্লভ। দেবতারা চিন্তা করলেন, এই ব্যক্তি যদি স্বয়ংবর সভায় যায়, তবে তাঁদের কোন আশা নেই। তাই তাঁরা রথ পরিত্যাগ করে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়ে নলরাজকে বললেন— নিষধরাজ, তুমি ধর্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। অতএব তুমি আমাদের দূতের কাজ স্বীকার করে আমাদের সাহায্য কর।

নলরাজ দূতের কাজ করতে স্বীকার করে বিনীত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কে ? আর আমাকে দিয়ে আপনাদের কোন্ কাজ করাতে চান ?

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—নল, আমরা দেবতা। আমি দেবরাজ ইন্দ্র, ইনি অগ্নীশ্বর অগ্নি, ইনি জলেশ্বর বরুণ আর ইনি ধর্মরাজ যম। আমরা দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে এসেছি। তুমি আমাদের দূত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বলবে যে, সে যেন মর্ত্যের মানবদের উপেক্ষা করে আমাদের কাউকে পতিত্বে বরণ করে।

ইন্দ্রের কথা শুনে বিনয়পূর্ণ বচনে নলরাজ বললেন—দেবরাজ! আপনারা যে উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমিও সেখানে যাচ্ছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করবেন। আর দেখুন, যে পুরুষ স্বয়ং যে স্ত্রীরত্ন লাভে কৃতসংকল্প হয়, সে কখনই অন্যের জন্য তাঁকে প্রার্থনা করতে পারে না।

—নল, তুমি সত্যব্রত ও ধর্মপরায়ণ, অতএব পূর্বে অঙ্গীকার করে এখন অস্বীকার করলে সত্যভ্রষ্ট হবে।

—কিন্তু শত সহস্র রক্ষকগণ দময়ন্তীর গৃহ রক্ষা করছে। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমি সেখানে যাব কি করে?

—তোমার কোন ভয় নেই। আমাদের প্রভাবে তুমি অনায়াসে সেখানে যেতে পারবে।

অতঃপর দেবতাদের দূত হয়ে নল দময়ন্তীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

দময়ন্তী নলকে দেখে অবাক হলেন। ইনি কি তবে কোন দেবতা? মর্ত্যের মানব তো কখনও এত সুন্দর হয় না। তাছাড়া শত শত সশস্ত্র প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে ইনি এখানে এলেনই বা কি করে? ভালো করে নলকে দেখে তিনি রাজহংসের বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে চিনতে পারলেন যে ইনিই নল। তবুও অনুমানের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে? এখানে এলেন কি করে? এখানে আসবার কারণ কি?

—আমি দেবদূত। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি ও যমের দূতরূপে তোমার কাছে এসেছি। এদের সকলেই তোমায় পত্নীরূপে পেতে চায়। তাঁরা চায় আজকের স্বয়ংবর সভায় তুমি তাঁদের যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ কর।

একথা শুনে দময়ন্তী আর তাঁর মনের ভাব গোপন রাখতে পারলেন না। তিনি যে নলকে চিনতে পেরেছেন তার বহিঃ প্রকাশ ঘটিয়ে বললেন—মহারাজ! আপনি কেন নিজেকে বঞ্চনা করছেন? আপনি নিশ্চয়ই নিষধপতি নল। আমি আপনার প্রেরিত রাজহংসের মুখে আপনার গুণাবলীর বর্ণনা শুনে আপনাকেই আমার মনপ্রাণ অর্পণ করেছি। এখন আমাকে আপনি যেরূপ বলবেন আমি তাইই করব। কিন্তু যদি ঐ দেবতাদের মধ্যে কাউকে বরণ করতে বলেন, তবে সতী ধর্ম রক্ষার্থে এবং দ্বিচারিণী হবার হাত থেকে মুক্তি পেতে বিষ ভক্ষণ, অগ্নি বা জলে প্রবেশ বা উদ্বন্ধনে

আমাকে প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। এ ছাড়া তো অন্য কোন উপায় দেখছি না।

দময়ন্তীর কথা শুনে নল বললেন—স্বর্গের দেবতাগণ যাঁর পাণি গ্রহণে মর্ত্যে আসেন সেই মানবীর মত সৌভাগ্যবতী কজন হতে পারে? কেন তুমি মর্ত্যের একজন সামান্য মানবের জন্য এই সৌভাগ্যকে স্বীকৃতি দিচ্ছ না? দেখ, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকারী দেবতাদের পায়ের ধুলিকণার যোগ্যও নই। অতএব তুমি তাঁদের ভজনা কর। তুমি কি জান না দেবতাদের অপ্রিয় আচরণ করলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। অতএব তুমি তাঁদের কাউকে পতিত্বে বরণ করে আমার প্রাণ রক্ষা কর। তাছাড়া যদি তুমি দেবতাকে বরণ কর—তবে উত্তম পরিচ্ছদ, বিচিত্র দিব্যমাল্য ও বহুবিধ উৎকৃষ্ট অলংকার পরিধান করতে পারবে। দেখ যিনি এই পৃথিবীকে ইচ্ছে করলে তাঁর অধীনে আনতে পারেন—কোন্ নারী তাঁকে কামনা করে না? যাঁর দণ্ডভয়ে ভীত হয়ে প্রাণীগণ ধর্মারাধনা করে থাকে, তিনি কোন্ রমণীর কামনার নন? যিনি দৈত্য-দানব হন্তা, সুরগণের পিতা ও ধর্মের রক্ষক হয়ে স্বর্গরাজ্য ভোগ করছেন, কোন্ কামিনী সেই মহেন্দ্রকে না চায়? তবে আমার ইচ্ছা যে, তুমি এই দেবগণের মধ্যে বরুণ দেবকে পতিরূপে বরণ কর।

একথা শুনে দময়ন্তীর ভ্রু-গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলল। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি বললেন—মহারাজ! দেবতাদের আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, তবে আমি সত্য করে বলছি আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করব।

—দময়ন্তী! আমি দেবতাদের দূতরূপে তোমার কাছে এসেছি। সুতরাং তাঁদের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাঁদের জন্য তোমায় কামনা করে, এখন কিভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমার পাণিগ্রহণে সম্মত হই? তবে যদি আমার দূতের ধর্ম রক্ষা করে, আমার স্বার্থ-সাধনের কোন প্রকার প্রতিবিধান করতে সমর্থ হও, তবে আমি তোমার পাণিগ্রহণে সম্মত হতে পারি।

—মহারাজ! আমি যা বলি তা শুনলে আপনি নির্দোষ হতে পারবেন।

—কি সে উপায়?

—আপনিও দেবরাজ, ধর্মরাজ, অগ্নিদেব ও বরুণদেব সহ আমার স্বয়ংবর সভায় আসবেন। আমি সেই দেবগণের সামনেই আপনার গলায় বরমাল্য প্রদান করব। তাহলে আপনার এ বিষয়ে আর কোন দোষ থাকবে না।

নল দেবতাদের কাছে ফিরে এলে, দেবরাজ জিজ্ঞেস করলেন—নল, তুমি কি দময়ন্তীকে দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—বেশ। কিন্তু সে আমাদের অভিলাষ পুরণে আগ্রহী না অনাগ্রহী?

—আমি আপনাদের সব কথা তাকে বললে, সে বলেছে স্বয়ংবর সভায় আমাকেও আপনাদের সাথে যেতে। সেখানে সে আপনাদের সামনে আপনাদের সাক্ষী রেখেই আমার গলায় বরমাল্য প্রদান করবে। এখন আপনাদের যা অভিরুচি হয় করুন।

দেবগণ নলকে নিয়ে দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

মহারাজ ভীম শুভকাল, পুণ্যতিথি ও পবিত্রক্ষণে মহীপালগণকে স্বয়ংবর সভায় আহ্বান করলেন।

অনন্তর দময়ন্তী স্বীয় প্রভার প্রভাবে ভূপালগণের নয়ন-মন অপহরণ করে স্বয়ংবর সভায় প্রবেশ করলেন। রাজগণ একদৃষ্টে রাজনন্দিনী দময়ন্তীকে দেখতে লাগলেন।

এদিকে দময়ন্তীর চোখ সমস্ত জায়গায় নলকে খুঁজতে লাগল। হঠাৎ দেখলেন, এক জায়গায় পাঁচজন নল বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে কে প্রকৃত নল তা বুঝতে না পেরে, তিনি দেবতাদের শরণাপন্ন হলেন।

দেবতাদের উদ্দেশ্যে কৃতাঞ্জলী পুটে বললেন—হে দেবগণ!

আমি নিষধাধিপতিকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি। আমি জ্ঞানতঃ অন্য পুরুষগামিনী হয়ে পাপাচারিণী হতে চাই না। হে সুরাধিপতি আমাকে আমার যথার্থ পথের দিশা দেখান। আমি নল-রাজকে পতিত্বে বরণ করার ব্রতানুষ্ঠান করছি। আপনারা যথার্থরূপে তাঁকে নির্দেশ করুন। আপনারা আপনাদের স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ করলে আমি পুণ্যশ্লোক নলরাজকে চিনতে পারবো। যদি আপনারা আমাকে আমার পতি নির্বাচনের পথ না দেখান, তবে সতী দময়ন্তী দ্বিচারিণী হওয়া থেকে মুক্ত হতে আত্মঘাতী হবে।

দময়ন্তীর এরূপ কারুণ্যপূর্ণ পরিবেদন বাক্য শ্রবণ করে নলের প্রতি দময়ন্তীর প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি জন্মেছে বুঝতে পেরে, দেবতারা স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ করলেন।

তখন দময়ন্তী দেখলেন, ঐ পাঁচজন নলের মধ্যে একজন ভূমি স্পর্শ করে বসে আছেন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম জমেছে। আর চারজন ভূমি স্পর্শ করেনি এবং তাঁদের কপালও ঘর্মাক্ত হয় নি।

বুদ্ধিমতী দময়ন্তী দেবতা ও নলের পার্থক্য বুঝতে পেরে ভূমি স্পর্শ করে বসে থাকা নলকে বরমাল্য প্রদান করে পতিত্বে বরণ করলেন।

যে সব নৃপতিরা দময়ন্তী লাভে একান্ত কাতর হয়েছিলেন, তাঁরা হায় হায় করতে করতে স্থান ত্যাগ করলেন এবং যাঁরা নিরপেক্ষ তাঁরা যোগ্য বরের করে দময়ন্তী গেছেন দেখে সুখী হলেন। দেবতাগণও দময়ন্তীর দৃঢ়তায় ও পতিব্রততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

নলরাজ প্রীত ও প্রসন্ন মনে দময়ন্তীকে আশ্বাসদান পূর্বক বললেন—কল্যাণি! তুমি দেবতাদের সামনে মর্ত্যের সামান্য মানব আমাকে পতিত্বে বরণ করে আমার মান বাড়ালে। আমিও অঙ্গীকার করছি, তোমার এই ত্যাগের মর্যাদা রক্ষার্থে যতদিন জীবিত থাকব, আমি তোমারই প্রণয় পরবশ হয়ে থাকব।

দময়ন্তীও তার স্বামী নলকে প্রণাম করে বললেন—প্রভু! আমি আজীবন আপনার সেবিকা হয়ে থাকব।

দেবতাগণ সন্তুষ্ট হয়ে নলরাজকে চারটি বর দিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—নল, তুমি আজ থেকে সব সময় আমায় দেখতে পাবে এবং অন্তে পরম গতি লাভ করবে।

অগ্নি বললেন—নল, তুমি যখনই আমায় স্মরণ করবে আমি সেখানে আবির্ভূত হয়ে তোমার মনোরথ পূরণ করব।

যম বললেন—নল, তুমি যেমন ভাবেই রান্না কর না কেন, তা সুস্বাদু হবে, আর তোমার ধর্মনিষ্ঠাও অবিচলিত থাকবে।

বরুণ বললেন—নল, তুমি আমার এই চিরস্থায়ী সুগন্ধি মাল্য গ্রহণ কর। আর তুমি আমাকে যখনই ডাকবে, আমি স্বশরীরে সেখানে হাজির হব।

দেবতারা সকলে চলে গেলেন স্বর্গধামে।

এদিকে মহাধুমধামের সাথে তাঁদের বিবাহ পর্ব সমাধা হল।

দেবতারা নল দময়ন্তীকে আশীর্বাদ করে ফিরে আসছেন এমন সময় পথের মাঝে তাঁদের কলি ও দ্বাপরের সাথে দেখা হল। দেবরাজ কলিকে জিজ্ঞেস করলেন—কলি! তুমি দ্বাপরের সাথে কোথায় যাচ্ছ?

কলি বলল—আমি দময়ন্তীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়ে তাঁকে লাভ করবার অভিপ্রায়ে তার স্বয়ংবর সভায় যোগ দিতে যাচ্ছি।

সুরনাথ সহাস্যে বললেন—কলি, স্বয়ংবর সভা শেষ হয়ে গেছে। ভীমনন্দিনী আমাদের সামনেই নলরাজকে পতিত্বে বরণ করে তাঁকে বরমাল্য প্রদান করেছে।

ইন্দ্রের কথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কলি বলল—দেবরাজ! দময়ন্তী সামান্যা মানবী হয়ে দেবতাদের উপেক্ষা করে একজন সামান্য মানবকে বরণ করেছে অতএব এর শাস্তি হওয়া উচিত।

দেবতারা সমস্বরে বললেন—দময়ন্তীর কোন অপরাধ নেই। সে আমাদের আদেশানুসারেই নলকে বরণ করেছে। তার মত গুণসম্পন্ন নরপতিকে যে কোন কামিনীই পতিত্বে বরণ করবে। ভেবে দেখ, যে ব্যক্তি বিশ্বের ধর্মের মর্মাভিজ্ঞ, ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর ও

চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেছে, যে ব্যক্তি ভুলক্রমেও কোনদিন মিথ্যা বলে না, সর্বদা অহিংস ও দৃঢ়ব্রত, যে ব্যক্তি সত্য, ধৃতি, জ্ঞান, তপস্যা, শৌচ, ইন্দ্রিয় সংযম ও সমগুণে অলংকৃত, সে ব্যক্তি শাপ প্রদানের যোগ্য নয়।

কলি ও দ্বাপরকে এইরূপ তিরস্কার করে দেবরাজ, অগ্নি, যম ও বরুণ সহ স্বর্গে গমন করলেন।

অনন্তর কলি দ্বাপরকে সম্বোধন করে বলল—দ্বাপর। তুমি যাই বলনা কেন, আমি শান্ত হব না। যে কোন প্রকারে হোক না কেন নল দময়ন্তীর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নলকে রাজ্যচ্যুত করব। তুমি আমায় কথা দাও, আমার কার্য সম্পাদনে আমায় সাহায্য করবে।

—করব, বলে দ্বাপর অঙ্গীকারবদ্ধ হল।

নল ও দময়ন্তী পরমসুখে কিছুদিন ভীমের আদেশানুসারে তাঁর রাজ্যে বসবাস করে স্বরাজ্যে ফিরে এলেন।

শচীপতির সাথে শচীর সহবাস যেমন পরম সুখের, দময়ন্তীও নলের সাথে তেমনি সুখে কাল যাপন করতে লাগলেন।

নল দিনকরের মতো প্রতাপশালী হয়ে হৃষ্ট মনে রাজকার্য পরিচালনা করে, প্রজাদের চিত্ত জয় করে, তাদের একান্ত অনুরক্ত হয়ে উঠলেন।

ভুরিদক্ষিণ, অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করে পরিশেষে পরম রমণীয় বন ও উপবনে দময়ন্তীর সাথে বিহার করতে লাগলেন।

কিছু কালের মধ্যেই নলের ঔরসে দময়ন্তীর গর্ভে এক পুত্র ও কন্যার জন্ম হল। পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন ও কন্যার নাম ইন্দ্রসেনা রাখা হল।

দীর্ঘ এগারো বছর নলের পিছনে ঘুরে বেড়ালেন কলি। কিন্তু কিছুতেই তাঁর এমন কোন ছিদ্র খুঁজে পেলেন না, যার অজুহাতে তিনি তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে, তাঁর অনিষ্ট সাধনে ব্রতী হন।

অবশেষে একদিন সুযোগ এসে গেল। কলি যে ছিদ্রান্বেষণে দীর্ঘ একাদশ বর্ষ নলের পেছনে পেছনে ঘুরেছিলেন তা পেয়ে গেলেন।

নল সেদিন মূত্র পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র জলস্পর্শ করে হস্ত প্রক্ষালন না করে সন্ধ্যা করতে ব্রতী হলে তাঁর ভিতর কলি প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

নলের দেহে কলি প্রবেশ করে, তার ভ্রাতা পুস্করেব কাছে গিয়ে বললেন—পুস্কর! তুমি কি রাজ্যলাভ করতে চাও?

—চাই। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ, ধর্মপরায়ণ নলের কাছ থেকে কি করে আমি তা লাভ করতে পারি?

—পারবে। যদি আমার কথা শুনে চল তো তা পারবে।

—বলুন, আমায় কি করতে হবে?

—তুমি নলকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ জানাও। তুমি পাশা খেলায় যা বাজী রাখবে তাতে জয়ী হবে।

এই কথা বলে কলি গেলেন দ্বাপরের কাছে। তাকে বললেন—দ্বাপর। তোমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে আছে?

—আছে। বল, আমায় কি করতে হবে?

—তুমি পুস্করের পাশার ভিতরে প্রবেশ কবে তাব দেয় দানের পক্ষে পাশা ওল্টাবে এবং তাকে জেতাবে।

দ্বাপর তাতে সম্মত হলে কলি প্রস্থান করলেন।

ধর্মপরায়ণ নলরাজ তাঁর ভ্রাতা পুস্করের দ্বারা বারবার পাশা-খেলার আমন্ত্রণ পেয়ে অবশেষে অসহিষ্ণু হয়ে তাঁর সাথে পাশাখেলার সময় নিরূপণ করলেন। দয়মন্তী নলকে পাশা খেলতে বারণ করলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না। কারণ কলি তখন তাতে উপবিষ্ট হয়েছেন। তিনি দময়ন্তীর সামনেই ভ্রাতা পুস্করের সাথে দ্যুত ক্রীড়ায় রত হলেন। পাশার বাজীতে একে একে তিনি কলি ও দ্বাপরের প্রভাবে সর্বস্ব হারলেন। বন্ধু বান্ধবগণ ধর্মপরায়ণ রাজাকে পাশাখেলায় উন্মত্ত দেখে বার বার ঐ খেলা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করাব জন্য সচেষ্ট হলেন, কিন্তু কিছুতেই সেই সর্বনাশা খেলা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হলেন না।

রাজার এইরূপ সর্বনাশের সংবাদে রাজমন্ত্রী ও পরিজনেরা যাঁরা

সতত রাজার হিত চিন্তা করেন, তাঁরা ছুটে এলেন রাজাকে এই সর্বনাশের খেলা থেকে নিবৃত্ত করতে—কিন্তু সমর্থ হলেন না।

তখন তাঁরা গিয়ে মহারাণী দময়ন্তীর কাঁছে কেঁদে পড়লেন। বললেন—মহারাণী! আজ রাজ্যের মহা অমঙ্গল দেখা দিয়েছে। রাজা উন্মত্তের মত পাশা খেলে ধন-দৌলত সব হেরে বসেছেন। তাঁর এখনও চেতনা আসে নি। আমরা কিছুতেই তাঁকে এই সর্বনাশা খেলা থেকে বিরত করতে পারি নি। এখন আপনি যদি একবার সচেষ্ট হন।

মহারাণী দময়ন্তী তখনই পুত্রকন্যা সহ রাজার কাছে গিয়ে হাজির হয়ে নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করে বললেন—নাথ! তুমি ধর্মজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ নৃপতি হয়ে কেন তোমার প্রকৃত হিতৈষী মন্ত্রী ও পরিজনের কথার মর্যাদা দিচ্ছ না? কেন এভাবে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছ? এ খেলা পরিত্যাগ করে ফিরে চল। কিন্তু রাজা নল তখন কলি কর্তৃক এরূপ আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, রাজমহিষীর কথার কোনরূপ মর্যাদা দিলেন না।

মন্ত্রী, হিতৈষী পরিজনগণ তাঁদের স্বগৃহে প্রত্যাগমন করলেন।

দময়ন্তী রাজার সারথীকে ডেকে বললেন—সারথি! দেখ মহারাজের তুমি একান্ত অনুরক্ত ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। মহারাজ পুষ্করের প্ররোচনায় তাঁর সর্বস্ব হারাতে বসেছেন। এখন তুমি যদি আমার এই পুত্র ও কন্যাকে তাদের মাতুলালয় ভীমনগর কুন্তীপুরে রেখে আস, তবে আমার প্রভূত উপকার হয়।

—কিন্তু মা, মহারাজের যদি কোনো প্রয়োজন হয়?

—হবে না। তুমি ওদের সেখানে রেখে ওদের সাথে সেখানে বসবাস করতে পারো, অথবা অন্যত্র যেতে পারো।

—মা, মহারাজ কি আমায় পরিত্যাগ করেছেন?

—না। সময়মত তিনি তোমাকে ডাকবেন।

সারথী বৃথা বাক্য ব্যায় না করে রাজপুত্র ইন্দ্রসেন ও রাজকন্যা ইন্দ্রসেনাকে নিয়ে বিদর্ভ দেশের ভীমনগরের কুন্তীপুরে উপস্থিত হয়ে

তাদের সেখানে রেখে রথ ও অশ্ব পরিত্যাগ করে পায়ে হেঁটে অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হল এবং নলের সারথী বলে পরিচয় দিয়ে রাজা ঋতুপর্ণের সারথী হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল।

এদিকে পুষ্কর মহারাজ নলের সর্বস্ব পাশার পণে অপহরণ করে উপহাস করে বলল—মহারাজ! তুমি তো তোমার সব হারিয়েছ। এখন বাকী আছে শুধু রাজমহিষী দময়ন্তী। এখন কি সেই দময়ন্তীকে বাজী রেখে খেলবে?

পুষ্করের এরূপ কটূক্তি শ্রবণে নলের হৃদয় বিদীর্ণ হল। কিন্তু পত্নীকে বাজী রেখে খেলার মত দুর্বুদ্ধি বা অধঃপতন তখনও তাঁর হয়নি। তাই তিনি তাঁর গায়ের সমস্ত অলংকার খুলে সাধারণ বস্ত্র পরিধান করে অন্তঃপুরে থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

বাইরে বেরিয়ে দেখেন তার সোনার প্রতিমা সাধ্বী স্ত্রী দময়ন্তীও রাজাভরণ ত্যাগ করে তাঁরই মত বস্ত্র পরিধান করে তাঁর সাথে নগর ত্যাগে কৃতসংকল্প হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

দময়ন্তীর নিরাভরণ বেশ দেখে নলের অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠল। তিনি বললেন—দময়ন্তী, তুমি কি পিত্রালয়ে গিয়ে থাকতে পারবে না?

—স্বামী! পতির পথই সতীর পথ। একথা জেনেও কেন তুমি আমায় পাপাচারে লিপ্ত হতে বলছ?

মহারাজ নল আর কথা না বাড়িয়ে পত্নীর হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়লেন। তাদের এইরূপ দুরবস্থা দেখে বন্ধু-বান্ধব ও হিতৈষীগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অনেকেই এগিয়ে এলেন তাঁদের গৃহে এঁদের আশ্রয় দিতে। কিন্তু পুষ্কর তখন নগরের ভিতরে ঘোষণা করে দিলেন: যে ব্যক্তি নলের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁকে আশ্রয় দেবে—তার প্রাণদণ্ড হবে।

পুষ্করের এইরূপ বিদ্বেষপূর্ণ কঠোর আদেশের ভয়ে আর কেউ নলকে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় দেবার সৎসাহস দেখাল না।

ফলে নিজের বাহুবলে শাসিত রাজ্য ত্যাগ করে নল একটি

গাছতলায় তিনদিন মাত্র জল পান করে কাটিয়ে এক বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে ফলমূল আহার করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। বনে ফলমূল আহার করে বেশ কিছুদিন তাঁদের কেটে গেল। এক বনের ফল ফুরিয়ে গেলে তাঁরা অন্য বনে যান। এইভাবে বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়ালেন বেশ কয়েক বছর। একদিন তাঁদের ফলও জুটল না। ক্ষুধায় কাতর হয়ে তাঁরা যখন ভাবছেন যে কি করবেন, তখন তাঁদের দৃষ্টিপথে কতকগুলি পক্ষী পতিত হল। তা দেখে রাজা মনে মনে ভাবলেন আজ আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এই পক্ষীদের দ্বারা আমরা আজ আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করব। এই কথা চিন্তা করে রাজা তাঁর পরিধেয় বসন দ্বারা পাখীদের আবদ্ধ করলে তারা সেই বসন নিয়ে আকাশ পথে উড়ে চলল এবং রাজাকে বস্ত্রহীন দেখে বলল—ওহে, অবোধ বীরসেনসুত নল! তুমি যে পাশায় হারলে তার ভিতর আমরা ছিলাম। আজ পাখীরূপে আবার তোমার বস্ত্র অপহরণ করলাম।

অনন্তর রাজাকে বিবস্ত্র দেখে দময়ন্তী তার বস্ত্রের অর্ধেক ছিঁড়ে দিয়ে রাজার লজ্জা নিবারণ করলে মহারাজ বললেন, দময়ন্তী যাদের কোপে পড়ে আমি আজ রাজ্যচ্যুত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে আর্তকণ্ঠে জীবনযাত্রা করছি, যাদের প্রভাবে নিষধবাসীরা আমায় সম্মান করেনি, সেই অক্ষ আজ পক্ষীরূপ ধারণ করে আমার বস্ত্র হরণ করল। দেখ, আমার চেতনা ও বুদ্ধিও ওরা হরণ করেছে। এখন তুমি আমার কথা শোন।

এই পথ অবন্তীনগর ও ঋষ্যমুখ পর্বত অতিক্রম করে দক্ষিণাভিমুখে গিয়েছে। এখানে বিবিধ ফল-ফুলে পরিপূর্ণ মহর্ষিগণের আশ্রমও দেখা যাচ্ছে। এই পথে বিদর্ভ দেশে যাওয়া যায় এবং এই পথ লোকালয়ে গিয়েছে। এর দক্ষিণভাগের দেশকে দক্ষিণাপথ বলে। এর যে কোন একটি পথে তুমি গিয়ে সুখে জীবন-যাপন করতে পার। বুদ্ধি ভ্রষ্ট আমার সাথে থেকে তোমার দুঃখ নিরন্তর বাড়বে। আবার আরও দুঃখে পতিত হতে পার।

একথা শুনে অতিশয় দুঃখিত হয়ে দময়ন্তী বললেন—মহারাজ! তুমি রাজ্য ধন ও তোমার পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত হারিয়েছ। এই জনশূন্য অরণ্যে তোমায় একাকী রেখে আমি কি অন্যত্র যেতে পারি? শাস্ত্রকাররা বলেছেন—সর্ব প্রকার দুঃখে ভার্যাই মহৌষধীরূপ। ভার্য্যাসম ঔষধ আর কিছুই নেই।

নলরাজ বললেন—প্রিয়ে! তুমি ঠিক কথাই বলেছ। দুঃখিত ব্যক্তির ভার্যাই পরম মিত্র। দেখ, আমি তোমাকে ত্যাগ করার কথা চিন্তা করি না—আবার তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যাও তাও বলি না। তুমি কেন ভীত হচ্ছ? আমি বরং আত্মাকে পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু তোমার বিরহে ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকতে পারব না।

—প্রভু! যদি আমাকে পরিত্যাগ করার ইচ্ছা না থাকে, তবে কিজন্য তুমি আমাকে বিদর্ভদেশের পথ নির্দেশ করলে? দেখ, আমার জ্ঞাতিগণের কাছে যাওয়া যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে সেখানে আমি একা যাব না। আমরা উভয়েই যাব। আর সেখানে তুমি বিদর্ভরাজ কর্তৃক আদৃত ও সৎকৃত হয়ে আমাদের গৃহে পরম সুখে কালযাপন করতে পারবে।

—প্রিয়ে! তোমার পিতার যেরূপ ঐশ্বর্য, তুমি নিশ্চয়ই জান আমারও সেরূপ ঐশ্বর্য ছিল। কিন্তু এখন নিতান্ত দুরাবস্থাগ্রস্ত হয়ে কোনো প্রকারেই সেখানে যেতে পারবো না। পূর্বে সেখানে সমৃদ্ধি সহকারে গিয়ে তোমার হর্ষ বর্ধন করেছিলাম, এখন সেখানে নিতান্ত দীনবেশে প্রবেশ করে তোমার শোক বর্ধন করতে পারব না।

দময়ন্তী সে কথা শুনে স্বামীকে আর পিত্রালয়ে যাবার জন্য বললেন না।

অতঃপর উভয়ে একটি বস্ত্র পরিধান করে ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হয়ে বনের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে, অবশেষে বনের মাঝে এক বৃক্ষশাখার তলে শয়ন করলেন।

পথ চলার ক্লান্তিতে নিতান্ত অবসন্ন হয়ে দময়ন্তী শয়ন করার সাথে সাথে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

নিষধরাজ নলের অন্তঃকরণে প্রিয়ার দুঃখ এবং নিজের শোচনীয় পরিণতির চিন্তা জাগরূক হওয়ায় তিনি নিদ্রিত হতে পারলেন না। বার বার পূর্ব স্মৃতি মনের মাঝে ফুটে উঠে তাঁকে অস্থির করে তুলল। তাঁর অস্থির মনের মাঝে বহু চিন্তা দানা বেঁধে উঠলো। তিনি ভারতে লাগলেন, এই বনে বনে ভ্রমণ করেই কি জীবন কাটবে? এভাবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? কিন্তু মৃত্যুতেই কি শান্তি আসবে? পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে, অনাহারে আর অনিদ্রায় দময়ন্তীর সোনার বর্ণে কালি পড়েছে। আজ আমার জন্য ওর এই দুর্গতি। আমার প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় ওকে আজ এই দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। আজ যদি আমি ওকে পিত্রালয়ে যেতে বলি, ও কিছুতেই যাবে না। এইরূপ চিন্তা করে পাশে পড়ে থাকা একখানা ছুরি পেয়ে তা দ্বারা তার দুজনে যে একই বস্ত্র পরিধান করেছিলেন তা ছিন্ন করে, পতিব্রতা স্ত্রীকে এককী বনের মাঝে পরিত্যাগ করে বনান্তরে যাত্রা করলেন।

* * *

যথা সময়ে গভীর নিদ্রাভিভূতা দময়ন্তীর নিদ্রা ভঙ্গ হল। চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন তাঁর পাশে স্বামী নেই। তাঁর বস্ত্রের যে অর্ধাংশ তিনি পরিধান করেছিলেন তা ছিন্ন। পাশেই পড়ে আছে একখানা ছুরি।

বুদ্ধিমতী দময়ন্তীর বুঝতে অসুবিধা হল না যে, এই নির্জন বন প্রান্তরে তাঁর স্বামী তাঁকে একাকিনী পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। তিনি বুঝে পেলেন না যে, তার অমন ন্যায়বান ধর্মপরায়ণ স্বামী কি করে তাঁকে একাকী কানন মাঝারে ফেলে রেখে পালালেন? সতীর ধর্ম পালনার্থে সম্মান ত্যাগ করেও যিনি স্বামীর অনুগামিনী হয়েছিলেন—তাঁকে কি করে তিনি এই বিপদের মাঝে ফেলে পালালেন।

পরিশেষে শোকসন্তপ্তা, পতিব্রতা দময়ন্তী বললেন—মহারাজ! যার প্রভাবে তুমি আজ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে আমায় ত্যাগ করে চরম দুঃখের মাঝে ফেললে, সেই পাপাত্মা পুরুষকেও আমাপেক্ষা অধিকতর দুঃখ ভোগ করতে হবে। আমি যদি পতিব্রতা সতী হই, আর জীবনে স্বামীকে ছাড়া অন্য কাউকে চিন্তার মাঝে স্থান দিয়ে না থাকি, তবে আমার এ অভিশাপ বৃথা যাবে না।

এমন সময় একটি বিষাক্ত সাপ দময়ন্তীকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে দময়ন্তী তাঁর স্বামীর নাম ধরে করুণ সুরে বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন।

দময়ন্তীর বিলাপ শুনে এক ব্যাধ ঘটনাস্থলে এসে অজগরটিকে মেরে দময়ন্তীকে বিপদমুক্ত করে দময়ন্তীকে তাঁর একাকী বনে বিচরণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় দময়ন্তী অকপটে তাকে তাঁর দুঃখের কারণ বর্ণনা করলেন।

পাপাত্মা ব্যাধ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, তাঁকে মধুর ভাষণে তোষণ করে, তাঁর প্রতি অশোভন আচরণ করতে উদ্যত হলে, রোষান্বিতা হয়ে দময়ন্তী তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললেন—যদি আমি সতী হই এবং নল ছাড়া অন্য কোন পুরুষের কথা কোনদিন চিন্তার মাঝেও স্থান দিয়ে না থাকি, তাহলে এই মুহূর্তে তোর মত দুরাত্মার মৃত্যু হোক।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যাধ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

* * *

ভীমরাজ নন্দিনী দময়ন্তী শোকাকুলচিত্তে আবারও স্বামীর অনুসন্ধানে এ বন সে বন ঘুরে একটি রাস্তার মাঝে এসে উপস্থিত হলে একদল বণিকের সম্মুখীন হলেন। তারা দময়ন্তীর জীর্ণ শীর্ণ বেশ দেখে বলল—তুমি কে? কার ঘরণী?

দময়ন্তী তখন তার এই বনপথে একাকী ভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করলে তাঁরা দময়ন্তীকে তাঁদের যাত্রা পথের সঙ্গী করে নিলেন।

কিছুদূর এগোতেই সেই বণিকদল একদল উন্মত্ত হাতীর কবলে পড়ে কেউ প্রাণ হারাল, কেউ আহত হল। যারা বেঁচে রইল তাদের ধারণা হল—দময়ন্তী ডাইনী, অপয়া। ওকে সঙ্গে নেওয়ায় তাদের এই বিপর্যয়। অতএব ওকে পুড়িয়ে মার।

দময়ন্তী একথা শুনে এক ঝোঁপের আড়ালে আত্মগোপন করে রাত অতিবাহিত করলেন এবং ভোর হবার আগেই হাঁটা শুরু করলেন এবং চেদিরাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন।

তখন দিনের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

অর্ধবস্ত্র পরিহিতা মলিনবর্ণা, এলোকেশী দময়ন্তীকে পুরবাসীগণ পাগলিনী ভেবে তাকে ঘিরে নানারূপ কটূক্তি করতে লাগলেন। রাজপ্রাসাদের উপরে দাঁড়িয়ে থেকে রাজমাতা এ দৃশ্য দেখে একজন পরিচারিকাকে সেখানে পাঠিয়ে দময়ন্তীকে ডেকে আনলেন।

দময়ন্তী কাছে এলে রাজমাতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—মা, তুমি কে? তোমাকে তো সাধারণ ঘরের দুঃখিনী মহিলা বলে বোধ হয় না। তোমার গায়ে কোন অলংকার নেই। বস্ত্র ছিন্ন, তবুও তোমার অঙ্গ-লাবণ্য জলদনিবাসিনী সৌদামিনীর মত শোভা পাচ্ছে। বল তুমি কে?

দময়ন্তী বললেন—আমি পতিব্রতা সদকুলোদ্ভবা সৈরিন্ধ্রী। কেবল ফলমূল আহার করে জীবন ধারণ করি। আমার স্বামী ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমার কষ্ট দূর করতে না পেরে আমায় বনের মাঝে ফেলে পালিয়ে যান। আমি তাঁর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

—সৈরিন্ধ্রী, তুমি মেয়ে হয়ে একাকী এই বিশাল পৃথিবীতে কোথায় তাকে খুঁজবে? তার চেয়ে তুমি আমার এখানে থাক। আমি আমার লোকজন দিয়ে তোমার স্বামীর খোঁজ করব।

সুবাহু রাজমাতার কথা দময়ন্তীর ভাল লাগল। আশান্বিতা হয়ে দময়ন্তী সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে বললেন—মা, আপনার আলয়ে আপনার আশ্রয়ে থাকতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে আমাকে কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

—বল

—আমাকে কখনও পা ধুইয়ে দিতে বলবেন না। কারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করতেও নয়। আর আমি স্বেচ্ছায় কোন পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কথা বলব না। তবুও যদি অসাবধানতাবশতঃ কারও নজরে পড়ি, আর সে আমার পাণি গ্রহণ বা আমায় নিপীড়ণ করতে সচেষ্ট হয়, আপনি তার প্রাণদণ্ড দেবেন। আর আমার স্বামীর খোঁজে যাকে পাঠাবেন সে এসে আমায় তার সন্ধান দিলে আমাকে সেখানে যাবার অনুমতি দিতে হবে।

রাজমাতা একথা শুনে দময়ন্তীকে আশ্বাস দিলে তিনি রাজমাতার কন্যা সমবয়সী সুনন্দার সঙ্গে কন্যা স্নেহে রাজপ্রাসাদে বসবাস করতে লাগলেন।

* * *

এদিকে নল রাজা পত্নীর বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে গভীর বনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে দাবানল দেখে গতি স্তব্ধ করলেন। কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় সেই দাবানলের ভিতর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—কোথা তুমি পুণ্যশ্লোক নলরাজ। আমায় এই চরম বিপদ থেকে মুক্ত কর।

নল দাবানলের ভিতর থেকে মনুষ্যকণ্ঠে তার নাম শুনে এগিয়ে গেলেন এবং দেখলেন একটি অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

নলকে দেখে সেই সাপটি বলল—মহারাজ! আমার নাম কর্কোটক। আমার নড়াচড়া করার শক্তি নেই। মহর্ষি নারদের অভিশাপে আজ আমার এই অবস্থা। আমায় আপনি দাবানল থেকে উদ্ধার করুন। আমি চিরকাল আপনার শুভকাজে নিয়োজিত থাকব।

নল সাপটিকে দাবানল থেকে উদ্ধার করার পর সাপটি হঠাৎ নলের মাথায় দংশন করল। নলের গাত্রবর্ণ নীলবর্ণ হয়ে গেলে নল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন সাপটি বলল—মহারাজ! আপনার

পরিচিত জনেরা আপনাকে এই দুরবস্থায় দেখলে টিটকারী দিতে পারে বা আপনিও লজ্জিত হতে পারেন তাই আমি আপনাকে বিরূপ করলাম। আর তীব্র বিষ ছড়িয়ে দিলাম সে খলের দেহে, যে বর্তমানে আপনার দেহের ভিতর অবস্থান করে আপনাকে ক্লেশ দিচ্ছে। সেই পাপী বিষের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে অতি কষ্টে আপনার দেহে অবস্থান করবে। ঋতুপর্ণ রাজার কাছে যান। নাম জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনার নাম বাহুক। আপনি রথ চালাতে সুনিপুণ।

*   *   *

কর্কোটের কাছ থেকে পাওয়া একখানি নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তার কথানুযায়ী নল ইক্ষাকুবংশীয় ঋতুপর্ণের কাছে উপস্থিত হলেন।

ঋতুপর্ণ তাঁর কথা শুনে তাঁকে দশ হাজার সুবর্ণ মুদ্রা বেতন দেবার অঙ্গীকার করে প্রধান অশ্বাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করলেন। নল রাজ বর্ষ্ণেয় ও জীবল নামে দুই অনুচরের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সচেষ্ট হলেন।

অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, তিনটির সুব্যবস্থা হলেও নলের মনে শান্তি ছিল না। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রীর জন্য বিলাপ করে অশ্রু বিসর্জন করতেন। একদিন তার পরিচারক জীবল তাকে জিজ্ঞেস করল—বাহুক, তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় যে রমণীর জন্য পরিতাপ কর, সে কে?

—জীবল, সে এই মূঢ়মতির গুণবতী সতী স্ত্রী। আমি তাঁর কথা না শুনে পাশা খেলে রাজ্য হারাই। সেই সাধ্বী আমার সংগে বনবাসের দুঃখ ভোগ করে নিজের পুত্র কন্যাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করে, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন আমি তাঁকে নির্জন কাননে একাকী ত্যাগ করে চলে এসেছি।

—তা, তখন না হয় তোমার অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল না। এখন তো হয়েছে। এখন তুমি তাদের খোঁজ করে এখানে আনতে তো পার?

—হায়, সে কি আর বেঁচে আছে ? হয়তো কোন হিংস্র জন্তুর পেটে গেছে। নচেৎ অনাহারে প্রাণ হারিয়েছে।

—তুমি খারাপটা ভাবছো কেন, সে তো তোমার মত এমন কোন ভাল জায়গায় আশ্রয়ও পেতে পারে।

—তাই যেন হয় জীবল। তাই যেন হয়।

*　　*　　*

এদিকে বিদর্ভরাজ ভীম তার কন্যা ও জামাতার রাজ্য ত্যাগের খবর পেয়ে রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন, যে ব্যক্তি তাঁর কন্যা ও জামাতার খবর এনে দিতে পারবে, তিনি তাকে এক হাজার গাভী, একটি গ্রাম ও বাসস্থানের জন্য রাজপ্রাসাদ তুল্য প্রাসাদ দেবেন এবং সারাজীবন ভরণ পোষণ করবেন।

একথা শুনে দলে দলে বহু ব্যক্তি নানা দেশে ঘুরেও দময়ন্তী বা নলের কোন সংবাদ আনতে পারলেন না। কিন্তু সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহু দেশ ঘুরতে ঘুরতে চেদি দেশে রাজ উদ্যানে দময়ন্তীকে আবিষ্কার করলেন।

তিনি দময়ন্তীর কাছে এগিয়ে গেলেন এবং তার কাছে নিজ পরিচয় দিলেন।

রাজভগ্নী সুনন্দা দময়ন্তীকে পর পুরুষের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে রাজমাতাকে তা জ্ঞাপন করলে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সুদেবকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে ? আর তোমার সঙ্গে আলাপ করে সৈরিন্ধ্রী কাঁদছে কেন ?

—মা, এ সৈরিন্ধ্রী নয়—এর নাম দময়ন্তী। বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। এর স্বামী বীর সেনের পুত্র পুণ্যশ্লোক নলরাজ। ভাইদের সঙ্গে পাশা খেলে সর্বস্ব হেরে দময়ন্তীকে নিয়ে বনবাসে যান। তারপর কি করে যে দময়ন্তী সৈরিন্ধ্রী হল, গৌর বর্ণ মলিন হল, ক্ষীণ হল দেহলতা তা তো আমি জানি না।

একথা শুনে রাজমাতা দময়ন্তীর কাছে এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে তার মুখখানা ধরে, তার ভিতর একটি জড়ুল চিহ্ন আবিষ্কার করে তাকে

দু'হাতে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বললেন—দময়ন্তী, আমি তোমার মাসী। আমার পিত্রালয় দশার্ণ নগরে। তোমার মা ও আমি রাজা সুদামার কন্যা। জন্মের সময় থেকেই এই জড়ুল তোমার ছিল। তুমি এত সুন্দরী ছিলে যে, তোমাকে আমি সব সময় আমার কোলে রাখতাম। তুমি কখনও আমায় ছেড়ে তোমার মায়ের কোলে যেতে না।

রাজমাতা দময়ন্তীর আপন মাসী একথা জানতে পেরে দময়ন্তী তাঁকে প্রণাম করে বললেন—মাসিমা, সম্পর্কের পরিচয় আজ হলেও আমি এখানে অনাত্মীয়র মত ছিলাম না। আমি রাজকন্যার মতই সমাদর পেয়েছি। এবার আমার দাদার বিশেষ বন্ধু এই সুদেবদার সঙ্গে আমাকে বাড়ী যাবার অনুমতি দিন। সেখানে দাদা ও বাবা-মা আমার সংবাদ না পেয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

একথা শুনে রাজমাতা পরম সমাদরে সুদেবকে রাজ অন্তঃপুরে নিয়ে পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়ে প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়ে তার সঙ্গে দময়ন্তীকে পাঠিয়ে দিলেন।

* * *

দময়ন্তী পিতৃগৃহে এসে সমাদৃতা হলেন—কিন্তু রাতদিন তাঁর চোখের জল ঝরতে লাগল।

তিনি রাজাভারণ ত্যাগ করে, অর্ধছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও একবেলা আহার করে স্বামীর প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

যদিও দময়ন্তীর পিতা নলের খোঁজে বহু অনুচরকে নিয়োজিত করেছিলেন, তবুও সুদেবের পরে বেশী আস্থা রাখতেন তিনি। কারণ সুদেব তাঁর কন্যার খোঁজ এনেছে।

সুদেব নলের খোঁজে যাবার আগে দময়ন্তীর সঙ্গে দেখা করে বললেন—দময়ন্তী, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে যাচ্ছি। তুমি তোমার স্বামীকে চেনার কোনরূপ বিশেষ নিদর্শন আমাদের জানাও। তাতে তাঁকে খুঁজে পেতে আমাদের সুবিধাই হবে।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি কোন রাজদরবারে আশ্রয় পেয়েছেন।

তাই প্রতিটি রাজদরবারে গিয়ে বলবেন, ওহে শঠ! তোমার প্রণয়িনী তোমাতে নিতান্ত অনুরক্তা। তুমি ও সে এক বস্ত্র পরিধান করে বনের মধ্যে নিদ্রিত ছিলে—তখন তুমি অর্ধেক বস্ত্র ছেদন করে তাকে একাকিনী বনের মাঝে ফেলে পালিয়েছ। সে কিন্তু আজও ধর্ম প্রতিপালনার্থে এবং তোমার আদেশ পালনার্থে সেই অর্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্বক, অশ্রু বিসর্জন করে তোমার প্রতীক্ষায় কাল যাপন করছে। পত্নীকে সর্বদা রক্ষা ও প্রতিপালন করা পতির ধর্ম। ধর্মজ্ঞ হয়েও তুমি কেন তার বিপরীত আচরণ করলে?

একথা শোনার পর যদি ঐ রাজদরবারের কেউ এসব কথার জবাব দেয়, তাহলে তার হাতে এই পত্র দেবেন। আর আমার এই পত্র ও কথার জবাব যিনি দেবেন, তাকেই নল রাজা বলে জানবেন।

*   *   *

এই ঘটনার পর আরও কিছুদিন গত হল। নলের কোন সংবাদ এল না। তখন একদিন পর্ণাদ নামে এক ব্রাহ্মণ দময়ন্তীর কাছে গিয়ে বললেন—রাজকুমারী, আমি নলের খোঁজে একদিন অযোধ্যানগরীতে গিয়ে মহারাজ ঋতুপর্ণের সঙ্গে দেখা করে আপনার বক্তব্যগুলি অন্যভাবে পেশ করে কারও কাছ থেকে কোনরূপ জবাব না পেয়ে ফিরে আসছি এমন সময় বাহুক নামে এক ব্যক্তি আমাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন—শ্রেষ্ঠা রমণীগণ চরম বিপদের মাঝে পড়েও আত্মরক্ষা করে থাকে। এইজন্য ঐসব পতিব্রতারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। পতিব্রতারা স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েও কখনও ক্রুদ্ধ হন না, বরং সৎপথ অবলম্বনপূর্বক জীবন ধারণ করেন। অতএব যে নলরাজ তার চেয়েও দুরবস্থায় পড়ে, পত্নীর দুঃখ সইতে না পেরে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা অনুচিত। সে তাঁর পত্নীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত এবং প্রতি মুহূর্ত পত্নী বিরহ জ্বালায় কাতর।

সেও অতি হীন জীবন-যাপন করছে। তার অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে তার প্রতি ক্রোধ অনুচিত।

রাজকুমারী, আমি সেই বাহুকের মুখে একথা শুনে আপনার কাছে এলাম। এখন এই বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় বলুন।

দময়ন্তী ব্রাহ্মণকে অর্থদ্বারা তোষণ করে সুদেবকে একবার তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

কিছুক্ষণ পর সুদেব দময়ন্তীর সামনে উপস্থিত হলে দময়ন্তী বললেন—সুদেবদা, আজ আপনার জন্যই আমি আমার পিতামাতা ও পুত্রকন্যার সঙ্গে বসবাস করছি। এবার অযোধ্যাতে গিয়ে আমার স্বামীকে আনতে হবে।

—বাহুকই যে তোমার স্বামী তা জানলে কি করে? সে তো তোমার সব কথা শুনেও এল না। এখন যদি না আসতে চায়?

—যাতে সে অবিলম্বে এখানে আসে, তার জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করেছি।

—আপনি অযোধ্যায় গিয়ে মহারাজ ঋতুপর্ণকে বলবেন যে, আগামীকাল ভীমস্থতা দময়ন্তীর আবার স্বয়ংবর হবে। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দময়ন্তী তার দ্বিতীয় পতিকে বরণ করবেন। আপনার ইচ্ছে হলে আপনিও সেখানে যেতে পারবেন।

* * *

দময়ন্তীর কথা মত সুদেব অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণকে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরের কথা জ্ঞাপন করলে ঋতুপর্ণ তাঁর সারথি বাহুককে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর সভার কথা জানিয়ে রথ প্রস্তুত করতে বললেন।

নলরাজ মনে মনে চিন্তা করলেন দময়ন্তীর মত বুদ্ধিমতী পতিব্রতা রমণী দুঃখে বিমোহিত হয়ে এরূপ অনুষ্ঠান করবে এ অসম্ভব। আমার জন্যই নিরুপায় হয়ে সে অনুরূপ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

যা হোক সেখানে উপস্থিত হয়েই দেখা যাক না কেন আসল ঘটনাটি কি ?

তখন বাহুক বেগগামী চারটি অশ্বকে রথে যোজনা করে মহারাজ ঋতুপর্ণকে নিয়ে বিদর্ভ নগরীর দিকে ধাবিত হলেন।

নদ-নদী, বন-উপবন ও পর্বত পেরিয়ে বায়ু বেগে রথ ছুটে চলল।

এই সময় ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। নলের দেহে অবস্থিত যে কলি কর্কোটক সাপের দংশনে বিষ জ্বালায় জ্বলে মরছিল তার কাল শেষ হতে সে নলের দেহ হতে বহিষ্কৃত হয়ে স্বমূর্তিতে প্রকাশ পেল।

নলরাজ যে কলির প্রভাবে এত দুঃখ পেয়েছিলেন তাকে সামনে দেখে, ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কলি নলরাজকে বললেন—মহারাজ ! ক্রোধ সংবরণ করুন। আমার কৃতকর্মের সাজা আমি পেয়েছি। আপনি আপনার মহীয়সী পত্নীকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করে এলে তিনি আমায় অভিশাপ দেন যেন, আমি তার চেয়েও জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করি। তারই ফল স্বরূপ কর্কোটকের দংশনে আমি যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম। এখন আমি আপনার শরণাগত। অতএব আমাকে রক্ষা করা আপনার কর্তব্য।

নল আর কলিকে কিছু বললেন না। আর কলি নলের কীর্তি ধরাধামে প্রচার করবেন বলে স্থান ত্যাগ করলেন।

* * *

অতঃপর তিনদিনের পথ একবেলায় অতিক্রম করে সন্ধ্যের সময় নল বিদর্ভ নগরীতে উপস্থিত হলেন।

নলের রথের শব্দ শুনে দময়ন্তী বুঝতে পারলেন এই গগনভেদী শব্দে দ্রুত রথচালনা করা নল ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলেন—আজ যদি এখানে উপস্থিত হয়েও নলরাজ আমার সঙ্গে দেখা না করেন, তবে আমি আগুনে আত্মাহুতি

দেব। আমি কোনদিন তাঁর সঙ্গে মিথ্যাচারণ করিনি, তাঁর মঙ্গলের জন্য যা করবার করেছি। তাঁর সঙ্গে বনবাসী হয়েছি। আজও দীন দুঃখীর জীবন-যাপন করছি। তবে তিনি কেন আমার প্রতি বিরূপ হবেন!

এদিকে মহারাজ ভীম হঠাৎ বিনা আমন্ত্রণে ঋতুপর্ণের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

রাজা ঋতুপর্ণ ভীমরাজের এই প্রশ্নে অবাক হয়ে ভাবলেন, তাই তো এখানে তো অন্য কোন রাজা বা ব্রাহ্মণদের দেখছি না। স্বয়ংবর সভার আয়োজন দেখছি না—তবে কি বলি? এসব চিন্তা করে বললেন অনেকদিন থেকে আপনার রাজ্য ও আপনাকে দেখার সাধ ছিল, তাই হঠাৎ চলে এলাম।

মহারাজ ভীমের মনে কেমন যেন সন্দেহ দেখা দিল। শত শত যোজন পথ অতিক্রম করে শুধু রাজ্য ও রাজাকে দেখতে ঋতুপর্ণ এসেছেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবুও তিনি রাজা ঋতুপর্ণকে বিশ্রামাগারে পাঠিয়ে অন্তঃপুরে ফিরে গেলেন।

এদিকে দময়ন্তী ধৈর্য ধরতে না পেরে তার দূতী কেশিনীকে ঋতুপর্ণের সারথির কাছে পাঠালেন।

দময়ন্তীর নির্দেশে কেশিনী বাহুকের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন—মহাশয় আপনারা কখন অযোধ্যানগর থেকে যাত্রা করেছিলেন, আর এখানেই বা কি জন্য এসেছেন?

মৃদু হেসে বাহুক বললেম—কোশল রাজ গতকাল দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবর হবে শুনে শতযোজন পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন।

—আচ্ছা এই তৃতীয় ব্যক্তি কে, কার অধীন আর আপনিই বা কার অধীন?

—এই তৃতীয় ব্যক্তি পুণ্যশ্লোক নলরাজের সারথি। এর নাম বার্ষ্ণেয়। নল রাজ্য ত্যাগ করে বনে গেলে ইনি ঋতুপর্ণের কাছে সারথি হতে চাইলে, তিনি তাকে সে পদে নিয়োগ করেন। আর

আমি অশ্ববিশারদ বলে নল রাজা আমাকেও ঐ সারথির পদে নিয়োগ করেন।

—আচ্ছা, নলরাজ কোথায় গেছেন তা কি ঐ বার্ষ্ণেয় বলতে পারে?

—না।

এরপর ঋতুপর্ণের রাজসভায় পর্ণাদ দময়ন্তীর সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা জিজ্ঞেস করলে বাহুক তার উত্তরে যা বলেছিলেন তাই বললেন এবং সংযম হারিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

কেশিনী অতঃপর দময়ন্তীর কাছে গিয়ে সমুদয় বৃত্তান্ত অকপটে বললে দময়ন্তী বললেন—কেশিনী, আবার তাঁর কাছে যাও এবং তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য কর।

কেশিনী আবারও দময়ন্তীর কাছে ফিরে এসে বললেন—দময়ন্তী আমি এমন অদ্ভুত ব্যক্তি আর কোনদিন দেখিনি। পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি যেন তার আজ্ঞাবহ ভৃত্য তুল্য। তিনি অতি খর্বকায়। কিন্তু তার উচ্চতার চেয়ে কম উচ্চতার প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশের সময়ও তিনি নীচু হন না। তিনি শূন্য জলপাত্রের দিকে তাকাতেই তা জলে পরিপূর্ণ হল। তিনি ঐ জলপাত্রে খাদ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করে একগাছা তৃণ ধরে সূর্য স্তব করতেই তাঁর হাতে একমুঠি চাল এল এবং ঐ তৃণতে আগুন জ্বলল। অচিরেই আহার প্রস্তুত হল। তিনি দেবতাদের আহার প্রদান করে আহার্য গ্রহণ করলেন। তিনি অগ্নি স্পর্শ করলে দগ্ধ হন না, তাঁর আজ্ঞা মত জল তার সামনে উপস্থিত হয়, তিনি একটি পুষ্পকে হস্ত দ্বারা মর্দন করার পর তা মলিন না হয়ে বিকশিত হয়ে সৌরভ ছড়াল।

দময়ন্তী কেশিনীর বক্তব্য শুনে বাহুকই যে নলরাজা সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তার দ্বারা আনীত রন্ধন দ্রব্য যা তার খাবার পর পড়েছিল, তা পরম তৃপ্তি ভরে আহার করে বললেন—কেশিনী, তুমি আমার মাকে ও বাবাকে গিয়ে বল যে, আমি বাহুকের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কারণ তিনিই যে নলরাজ তার সঠিক পরীক্ষা নেব।

রাজা কন্যার কথামত ব্যবস্থা করে দিলে বাহুক দময়ন্তীর কাছে হাজির হলেন।

নল ও দময়ন্তী উভয়ে উভয়ের শোচনীয় পরিণতি দেখে রোদন করতে লাগলেন।

দময়ন্তী তাকে অসহায়া একাকিনী অরণ্যে পরিত্যাগ করার জন্য নলকে দোষারোপ করলেন, নলও কি পরিস্থিতিতে কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এরূপ নৃশংস আচরণ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা দিলেন।

এইভাবে বাদানুবাদ, মান অভিমান, রাগ-অনুরাগের বাঁধ ভেঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ যেমন বায়ু তাড়িত হয়ে ধরিত্রীর তীরে আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ে, দময়ন্তীও ঠিক তেমনিভাবে তার স্বামীর বুকে আছড়ে পড়ে তার দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ব্যথা, পুঞ্জীভূত অভিমানের অবসান ঘটালেন।

ভরত জননী শকুন্তলা

—আমি বড় তৃষ্ণার্ত। কুটিরের ভিতরে যদি কেউ থাকেন, আমায় তৃষ্ণার জল দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করুন। পুরুবংশের রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় এসে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কণ্বমুনির আশ্রমের একটি রুদ্ধদ্বার কুটিরের কাছে এসে কাতর স্বরে আবেদন জানালেন।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক অপরূপা রূপমাধুরীযুক্তা যুবতী নারী। তার দেহে তাপসীর বেশ। ফুলের অলংকার শোভা পেয়েছে যথাযোগ্য স্থানে।

তিনি রাজাকে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা আপ্যায়ন করে মধুর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন?

রাজা দুষ্মন্তের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। তিনি ভাবছেন—এ কে? একি কোন দেবকন্যা? মুনির আশ্রমে এরূপ অসামান্য রূপলাবণ্যযুক্তা কন্যা তো হতে পারে না।

শুচিস্মিতা শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ফল ও পানীয় দিলে তিনি তা তৃপ্তি সহকারে ভোজন করে শকুন্তলাকে নিজ পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? কার সহধর্মিনী? তুমি কি স্বর্গের অপ্সরা না দেবকন্যা?

স্মিত হেসে শকুন্তলা বললেন—আমাকে কি মানবী বা আশ্রম দুহিতা বলে মনে হয় না?

—না। আশ্রমে এমন তাপসীর দর্শন আমি পাইনি।

—মহারাজ! আমি মহর্ষি কণ্বের কন্যা শকুন্তলা।

—শকুন্তলা! সর্বলোক পূজিত ভগবান কণ্ব ঊর্ধ্বরেতাঃ। ধর্ম বিচলিত হতে পারেন, কিন্তু ঊর্ধ্বরেতাঃ তপস্বীরা কখনও বিচলিত হন না। তবে তুমি কি করে তাঁর কন্যা হলে?

একথা শুনে শকুন্তলা তার পালক পিতা অপরের নিকট তার জন্ম বৃত্তান্ত ব্যক্ত করায় তিনি যা জেনেছিলেন, তা বলতে লাগলেন।

* * *

রাজা বিশ্বামিত্র মনে করতেন পৃথিবীতে ভুজবলে ও অর্থবলে সব করায়ত্ত করা যায়। কিন্তু একদিন তার সে ভ্রম দূর হল।

একদিন শতাধিক সৈন্য নিয়ে ক্ষাত্রধর্ম পালনার্থে বিশ্বামিত্র মৃগয়ায় বেরিয়ে পথ শ্রমে ক্লান্ত হয়ে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে আশ্রয় নেন।

রাজা বিশ্বামিত্রকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন বশিষ্ঠ মুনি এবং খুব অল্প সময়ের ভিতরেই তাঁদের সামনে এমন আহার্য পরিবেশিত হল, যা রাজপ্রাসাদেও দুর্লভ।

এত তাড়াতাড়ি এমন দুর্লভ খাদ্যবস্তু কি করে সংগ্রহ হল এটা জানতে গিয়ে বিশ্বামিত্র জানলেন যে, বশিষ্ঠের একটি কামধেনু আছে তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই-ই পাওয়া যায়। লোভী বিশ্বামিত্র সব শুনে বললেন—মুনিবর! ভোজন করালে ভোজন দক্ষিণা দেবার রীতি নিশ্চয়ই আপনি বিস্মৃত হন নি।

—না। আপনি বলুন কি চান?

—আমি আপনার কামধেনুটি চাই।

—বেশ তো নিয়ে যান। অম্লান বদনে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কামধেনুটি দিয়ে দিলেন।

বিশ্বামিত্র কামধেনু নিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই হঠাৎ কামধেনুর দেহাভ্যন্তর থেকে অসংখ্য সৈন্য বেরিয়ে তার সৈন্যদের নির্বিচারে হত্যা করে আশ্রমে ফিরে গেল।

এই অলৌকিক কার্যকলাপে রাজা বিশ্বামিত্র হতবাক হলেন এবং মনে মনে ভাবলেন বশিষ্ঠ মুনি তাঁকে জব্দ করার জন্যই কামধেনুটি তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি এইভাবে তাঁর ব্রহ্মশক্তির মহিমা জাহির করতে চান।

ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বামিত্র সেদিনই ঠিক করলেন মহাতেজা মুনির তেজ ম্লান করতে তিনিও ব্রহ্মত্ব লাভ করবেন।

শুরু হল কঠোর তপস্যা।

বিশ্বামিত্র তার সাধনের পথে আত্মাহুতি দিতে অগ্রসর হলে ইন্দ্রের পরামর্শে ব্রহ্মা স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য প্রেরণ করলেন এবং বিশ্বামিত্র মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে জপ-তপ ভুলে তার সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হলেন। তাদের সহবাসে একটি কন্যা জন্ম নিল। কন্যাকে পরিত্যাগ করে মেনকা স্বর্গে চলে গেলে বিশ্বামিত্র বুঝতে পারলেন দেবতাদের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। তিনি তখন কন্যাটিকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে রেখে তপস্যায় নিমগ্ন হলেন।

ঠিক সেই সময় কণ্বমুনি আশ্রমের সন্নিকটে সেই নদীতে স্নান করতে এসে শকুনি পাখিদের মাঝে শকুন্তলাকে দেখতে পেয়ে দয়াপরবশ হয়ে নিয়ে যান। সেই থেকে আশ্রম জননী গৌতমীর স্নেহের পরশে তিনি বেড়ে ওঠেন। কণ্বকে তিনি তার পিতা ও গৌতমীকে মাতা এবং আশ্রমের বালক-বালিকাদের ভাই-বোন রূপে জেনে আশ্রম জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবন-যাপন করতে থাকেন।

● ● ●

শকুন্তলার মুখে তার জন্ম বৃত্তান্ত শুনে দুষ্মন্ত বললেন—এখন দেখছি, তোমায় স্বর্গের অপ্সরা ভেবে আমি ভুল করিনি। তবে তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়। তিনিই তোমার জন্মদাতা। অতএব আমার ভার্যার আসন অলংকৃত করতে তোমার আপত্তি হওয়া অনুচিত। তুমি আমায় গন্ধর্ব মতে বিয়ে কর। আমি আমার রাজ্যভার ও প্রধানা মহিষীর স্থান তোমায় দেব।

—আপনি এ কথা আমায় বলছেন কেন? আমার পিতা কণ্ব কাছেই গেছেন। এখুনি আসবেন। আপনি বিশ্রাম করুন। আপনার যা বলার আপনি আমার পিতাকেই বলবেন।

—বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু তোমার আপত্তি নেই তো?

একথা শুনে শকুন্তলা নত মস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মৌন সম্মতির লক্ষণ ভেবে দুষ্মন্ত বললেন—সুন্দরি! তোমার এই অনিন্দ্য সুন্দর রূপ আমায় মুগ্ধ করেছে। আমার চোখের আয়নায়, মনের দর্পণে একমাত্র তোমার ছবিই প্রতিফলিত হচ্ছে। আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না। আবার অধর্মেও লিপ্ত হতে চাই না। অতএব তুমি স্ব ইচ্ছায় আমার প্রতি আসক্তা হয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করলে অতিথির প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো হবে।

শকুন্তলা চিরদুঃখী। গর্ভধারিণী মা তাকে ত্যাগ করেছেন। ঔরসদাতা পিতাও। যদিও মাতা ও পিতার স্নেহের অভাব তার জীবনে ঘটেনি। আর আশ্রমের এই পরিবেশও তার কাছে স্বর্গের তুল্য। এই আশ্রমের জল-বায়ু-মাটি থেকে আরম্ভ করে পশু-পক্ষী এমন কি লতা-পাতার সঙ্গেও তার নিবিড় সম্পর্ক। তবুও রাজরাণী হতে কোন্ মেয়ের না সাধ যায়? শকুন্তলাও সুযোগ হারাতে চাইলেন না। বললেন—আপনি যা বলবেন, তা যদি শাস্ত্র সম্মত হয়, তবে গন্ধর্ব মতে আপনাকে বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তিনেই। তবে আমার একটি শর্ত আপনাকে মানতে হবে।

--একটা কেন তোমার হাজার শর্ত মানতে আমি রাজী।

-আমার গর্ভজাত সন্তান আপনার জীবিতকালে যুবরাজ ও অবর্তমানে মহারাজ হবে। এই শর্তে সম্মত হলেই আমি গন্ধর্বমতে বিবাহে মত দিতে পারি।

বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে দুষ্মন্ত শকুন্তলার শর্তে রাজী হলে শকুন্তলা গন্ধর্বমতে দুষ্মন্তকে বিবাহ করলেন এবং সে রাত তার সঙ্গে কাটালেন।

ক্রমে সুখের রাত শেষ হল। পাছে মুনি এ বিয়েতে মত না দেন এবং এখন এসব ঘটনা ঘটবার পর তিনি অভিশাপ দেন এই ভয়ে তিনি রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

স্বামীর বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় কাতর শকুন্তলা বললেন—প্রভু, এ দাসীকে ভুলে যাবেন না তো?

—এ কি কথা বলছো? তোমায় ভুলবো। তুমিই তো এখন

আমার আত্মার আত্মীয়। তোমাকে ছেড়ে আমি কি আর বেশীদিন থাকতে পারবো? অতো উতলা হলে আমি যাই কি করে? তুমি রাজরাণী, বিশেষ করে মহারাণী,তোমাকে তো এভাবে, এ বেশে নিয়ে যেতে পারি না। তাই আমাকে সব ব্যবস্থা করতে রাজধানীতে যেতে হচ্ছে। সেখান থেকে চতুরঙ্গ সেনা রথ নিয়ে রাজকীয় মর্যাদায় তোমায় নিয়ে যাবে।

দুষ্মন্ত চলে গেলেন। স্বামী বিরহিনী শকুন্তলা সাশ্রুনয়নে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

মহর্ষি কণ্ব কোন স্থান থেকে এলে ছুটে যায় শকুন্তলা। আজ সে ছুটে এল না দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

শকুন্তলা তার স্বভাব সুলভ ধারা অনুযায়ী ছুটে আসতে গিয়েও অদূরে লজ্জায় অধঃমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মহর্ষি কণ্ব ধ্যানযোগে সব জানতে পেরে সস্নেহে পুত্রী শকুন্তলাকে কাছে ডেকে বললেন—মা শকুন্তলে, আমি সব জানি। তুমি গন্ধর্ব মতে বিয়ে করেছ। এতে তোমার ধর্ম নষ্ট হয়নি। ক্ষত্রিয়দের গন্ধর্ব বিয়েই শ্রেষ্ঠ। তুমি এক ধর্মাত্মাকে পতিত্বে বরণ করেছ।

শকুন্তলা কণ্বমুনিকে প্রণাম করে আসন দিয়ে আপ্যায়ন করে বসিয়ে বললেন—বাবা! আমি দুষ্মন্তকে পতিত্বে বরণ করেছি জেনে আমার প্রতি যেমন সদয় হয়েছেন, আমার স্বামীর প্রতিও অনুরূপ সদয় হোন।

—মা, আমি তোমাকে ও তাকে ভিন্ন নজরে দেখি না। তোমরা উভয়েই এখন আমার সমান স্নেহ পাবে। বল, তুমি আমার কাছে কি বর চাও?

—বাবা! সত্যিই যদি দুষ্মন্তের পরে প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এই বর দিন যে, পুরুবংশীয়রা যেন কখনও রাজ্যচ্যুত বা অধর্মপরায়ণ না হন।

—বেশ তাই হবে।

* * *

অধীর আগ্রহ, অসীম প্রত্যাশা নিয়ে আরও বেশ কিছুদিন দুষ্মন্তের আগমন প্রতীক্ষায় অতিবাহিত হল শকুন্তলার।

দুষ্মন্ত এলেন না। কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগলেন শকুন্তলা তার গর্ভজঠরে।

প্রকৃতির রীতিকে অনুসরণ করে যথা সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত দীপ্তাগ্নি সম তেজস্বী অলৌকিক রূপবান এক পুত্রের জন্ম হল কণ্বমুনির আশ্রমে।

তিন বছরে বেদের বিধান অনুসারে তার জাতকর্মাদি সংস্কার করলেন।

পরম সমাদরে শকুন্তলার পুত্র আশ্রমের আঙিনায় বেড়ে উঠলো। ছ'বছর বয়সে সেই ছেলে হয়ে উঠলো আরও দুর্দান্ত দুর্দমনীয়, তেজস্বী ও বীর্যবান। ঐ বয়সেই সে বাঘ সিংহ, মহিষ, কুকুর ও হাতি প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে খেলা করতো। তাদের কাউকে কখনও কখনও বেঁধে পর্যন্ত রাখতো।

এই অলৌকিক ক্রিয়া দেখে আশ্রমবাসীগণ তাঁকে "সর্বদমন" বলে ডাকতেন। অল্প বয়সেই সর্বদমনের এরূপ কার্যকলাপ দেখে মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে ডেকে বললেন—যৌবরাজ্য পাওয়ার সময় হয়েছে। অতএব আর কাল বিলম্ব না করে তোমার পতিগৃহে যাওয়া উচিত।

—কিন্তু বাবা! তিনি তো তাঁর কথা রাখতে এলেন না। হয়তো তিনি আমায় ভুলে গেছেন। যদি আমায় স্বীকার না করেন?

—ছিঃ মা, ওকথা বলতে নেই। সতী নারীর পতি গৃহই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তোমার ওটাই তো প্রকৃত বাড়ী। তুমি তোমার নিজ বাড়ীতে যাবে তাতে ভয় কি? মান অভিমানের সময় এ নয়। তাছাড়া তোমার ছেলের ভবিষ্যতের কথা তো মা তোমাকেই ভাবতে হবে।

অগত্যা আশঙ্কায় দোদুল্যমান শকুন্তলা পালক পিতা কণ্ব, মাতা গৌতমী ও আশ্রমবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুষ্মন্তের রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন

পুত্রকে নিয়ে শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন—মহারাজ। এ পুত্র আপনার ঔরসজাত আমার গর্ভসম্ভূত।

—সে কি! আমার তো কিছু মনে পড়ছে না! বিস্ময় প্রকাশ করলেন রাজা দুষ্মন্ত।

শকুন্তলা কিন্তু বিচলিত হলেন না। কাতর স্বরে বললেন—আপনি এর ভিতরে ভুলে গেলেন? মৃগয়া করতে গিয়ে ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে কণ্ব মুনির আশ্রমে আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আমার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমায় গন্ধর্বমতে বিবাহ করেছিলেন। পরিণয় সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আমার গর্ভজাত সন্তানই হবে যুবরাজ। এখন আপনার এই পুত্রের যুবরাজ হবার সময় এসেছে। আপনি ধর্মজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ নৃপতি। আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। আপনার ঔরসজাত সন্তানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

—কি বার বার আমার পুত্র—আমার পুত্র বলে এই ছেলের পরিচয় দিচ্ছ? আমার তো মনে হয় তুমি কোন গল্প বলছো। কোন দিন কখনও তোমার সংগে আমার দেখা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না। আজই আমি তোমায় দেখলাম। তোমার এ দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর। যদিও কোথাও তোমার থাকার জায়গা না থাকে তবে এখানে থাকতে পার। মিথ্যা কথা বলে আমার মনকে কলুষিত করে তুলো না।

শকুন্তলা পতির মুখে এই নির্লজ্জ অমর্যাদাপূর্ণ ভাষণ শুনে রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে লজ্জায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। প্রথমে কিছু সময় তিনি জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করে রক্ত চক্ষুতে রাজার দিকে কটাক্ষনেত্রে দৃষ্টিপাত করে সম্বোধনের সুর পালটে বললেন—মহারাজ! শুনেছিলাম তুমি ধর্ম পরায়ণ রাজাদের মধ্যে, অন্যতম। এখন দেখছি ইতর শ্রেণীর লোকদের মত বলছো আমি তোমায় চিনি না—জানি না। আমি যা বললাম তা সত্য কি মিথ্যা তা তোমার অন্তঃকরণই জানে। দেখ, তুমি সত্যকে ব্যক্ত কর,

আত্মাকে অবজ্ঞা কর না। যে ব্যক্তি মনে এক প্রকার জেনে মুখে অন্য প্রকার বলে, সে আত্মাপহারী চোরের সমান। তুমি মনে করেছ গোপনে তুমি যে কাজ করেছ তা কেউ জানতে পারেনি, কিন্তু তুমি তো জান মহর্ষি কণ্ব অন্তর্যামী। তিনি যোগ বলে সব জানতে পারেন। তুমি তাঁর কাছে কিছু গোপন করতে পারবে না। লোকে পাপ কাজ করে মনে করে কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু দেবতা ও অন্তর্যামী মুনিরা সব জানতে পারেন। আমি পতিব্রতা আমি আমার আত্মাভিমান বিসর্জন দিয়ে তোমার কাছে নিজে এসেছি বলে আমায় অপমান কর না। আমি তোমার সমাদরণীয়া পত্নী। তুমি কি জন্য সেই আদরের ভার্যাকে সভার মাঝে সামান্যার মত উপেক্ষা করছ? তুমি কি আমার এই সকরুণ বাক্য কিছুই শুনছো না? আমি কি অরণ্যে রোদন করছি?

পৌরাণিকেরা বলেন—পতি স্বয়ং ভার্যার গর্ভে প্রবেশ করে পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন, এইজন্যই জায়ার জায়ত্ব হয়েছে। পুত্র জন্মগ্রহণ করে পূর্বমৃত পিতামহের উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্নাম নরক থেকে পরিত্রাণ করে। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এই বিধান দিয়েছেন। গৃহকর্মে নিপুণা পুত্রবতী পতিপরায়ণা স্ত্রীই যথার্থ সহধর্মিণী। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ, পরম বন্ধু এবং ত্রিবর্গ লাভের মূল কারণ। ভার্যাবান লোকেরাই ক্রিয়াশীল হয়। ভার্যাবান লোকেরাই গৃহী বলে পরিগণিত হয়। হয় সুখী ও সৌভাগ্যবান। প্রিয়ংবদা ভার্যা অসহায়ের সহায়, ধর্মকার্যে পিতা, আর্তের জননী, পথিকের বিশ্রাম স্বরূপ। ভার্যাবান ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাসভাজন। মৃত্যুকালে কিছুই অনুগমন করে না। কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হয়ে থাকে। পতিব্রতা রমণী যদি স্বামীর আগে পরলোক প্রাপ্ত হন, তা হলে তিনি সেখানেও পতির জন্য অপেক্ষা করেন। আর যদি পূর্বে পতি পরলোক প্রাপ্ত হয়, তবে তার সহমৃতা হয়।

মহারাজ! যেহেতু পতি ভার্যাকে ইহলোকে ও পরলোকে সহায় রূপে পান, সেই জন্যই লোকে পাণি গ্রহণ অভিলাষ করেন। পতি

স্বয়ং ভার্যার গর্ভে প্রবেশ করে পুত্রনামধারী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্র প্রসবিনী ভার্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলে মনে করা উচিত। যেমন আদর্শতলে মুখ প্রতিবিম্ব, পুত্রও সেইরূপ পিতাব প্রতিবিম্ব স্বরূপ। এজন্যই লোকে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করে স্বর্গ ভোগের সুখানুভব করে। মানুষ শাবীরিক বা মানসিক পীড়ার দ্বারা যতই কাতর হোক, প্রিয়তমা ভার্যাকে দেখে সুশীতল জলে স্নান করার মত আনন্দ লাভ করে। স্ত্রী কর্তৃক তিরস্কৃত হলেও তার অপ্রিয় কাজ করা অনুচিত। কারণ বতি, প্রীতি ও ধর্ম এই তিন সুখ সাধনই ভার্যাব আয়ত্ব। স্ত্রীলোক আত্মাব পবিত্র জন্মক্ষেত্র পুত্রের জননী। পুত্র পিতৃপদে প্রণাম করে ধূলিধুসরিত কলেবর হয় এবং পিতাকে আলিঙ্গন করে। এই অসার সংসারে এব চেয়ে সুখ আর কি আছে?

মহারাজ স্বযং আগত সেই প্রাণসম পুত্রকে কেন অপমান করছো? দেখ, ক্ষুদ্র প্রাণী পিপীলিকাও তাদেব ডিমগুলি অতিশয় যত্ন সহকাবে রক্ষা কবে। আর তুমি ধর্মজ্ঞ হয়েও কেন নিজের পুত্রকে পালন করতে চাইছো না? শিশু পুত্রের আলিঙ্গনে লোক যতটা সুখানুভব কবে, বসন, স্ত্রী-সঙ্গ বা সুশীতল জল স্পর্শ করেও ততটা সুখানুভব হয় না। দ্বিপদেব মধ্যে ব্রাহ্মণ, চতুষ্পদের মধ্যে গো, গুরুজনদের মধ্যে পিতা এবং স্পর্শবান পদার্থের মধ্যে পুত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। মহারাজ এই প্রিয়দর্শন পুত্রকে আলিঙ্গন করে সেই সুখ অনুভব করুন।

এত সব বাস্তব বক্তব্যের পরেও রাজা নিরুত্তব রইলেন। সিংহাসন থেকে নেমে এসে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন না।

তা দেখে শকুন্তলা বললেন—মহারাজ! পুত্রের জাতকর্মকালে ব্রাহ্মণেরা বলেন—হে পুত্র! তুমি আমার প্রত্যঙ্গ হতে সম্ভূত হয়েছ, হৃদয় থেকে জন্মেছে, তুমিই আমার পুত্রনামধারী আত্মা। অতএব তুমি শত বছর বেঁচে থাক। আমার জীবন তোমার অধীন। আমার অক্ষয় বাবসা তোমার অধীন। একথা তোমার জানা। এই পুত্রও তোমার শরীর থেকে সমুৎপন্ন। তুমি তোমার পুত্রকে গ্রহণ কর। আমি আমার পিতার আশ্রমে ফিরে যাই।

এত কথার পরে দুষ্মন্ত আর নীরব থাকতে না পেরে বললেন— শকুন্তলা এ পুত্র আমার বলে আমি বিশ্বাস করি না। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা বলে থাকে। আমার মনে হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তুমিও অনুরূপ মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছ। তোমার কথায় কে বিশ্বাস করবে ? কুলটা মেনকা তোমার জননী। তার মত নির্দয়া মহিলা পৃথিবীতে নেই। তার প্রমাণ তো তুমিই। যে মা হয়ে সন্তানকে নির্জন কাননে নিক্ষেপ করে চলে যায় তার মত নির্দয়া আর কে আছে ? আর তোমার জন্মদাতা বিশ্বামিত্রও অতি নীচাশয়। কারণ তিনি ক্ষত্রিয় কুলে জন্মে, ক্ষত্রিয় হয়েও পরম পবিত্র সর্বজন মাননীয় ব্রাহ্মণত্ব পেয়েছেন। তুমি তাদের কন্যা হয়ে কি জন্য মিথ্যা বলছো ? তোমার পিতা বিশ্বামিত্র ও মাতা মেনকাই বা কোথায় ? আর এই পুত্রের মাত্র ছ'বছর বয়স এটা বিশ্বাস করাও অসম্ভব। অবশ্য স্বৈরিণী মেনকার কন্যার মিথ্যা ভাষণে পটু হওয়া তার উপযুক্তই বটে। আমি আবারও বলছি তোমাকে আমি চিনি না। তুমি এখান থেকে চলে যাও।

একথা শুনে শকুন্তলা আবারও জ্বলে উঠলেন। ক্রোধান্বিতা হয়ে বললেন—মহারাজ ! তুমি খালি পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াও নিজের ছিদ্র দেখ না ? মেনকা দেবগণের মধ্যে মাননীয়া ও আদরণীয়া। অতএব তোমার জন্মের চেয়ে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তুমি পৃথিবীর রাজা। শুধু পৃথিবীতে ভ্রমণ কর। আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই যাতায়াত করতে পারি।

মহারাজ ! কুরূপ ব্যক্তি যে পর্যন্ত দর্পণে নিজের মুখ না দেখে, ততক্ষণ আপনাকে সর্বাপেক্ষা রূপবান মনে করে কিন্তু যখন নিজের মুখ দেখে তখন আপনার ও অন্যের পার্থক্য বুঝতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী সে কখনো অন্যকে অবজ্ঞা করে না। বরাহ যেমন নানাবিধ সুখাদ্য ত্যাগ করে বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, মূর্খ লোকেরাও তেমনি শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করলে শুভ কথা পরিত্যাগ পূর্বক অশুভই গ্রহণ করতে থাকে। হাঁস যেমন জল মিশ্রিত দুধ থেকে অসার জলীয় অংশ

ত্যাগ করে দুধটুকুই গ্রহণ করে। পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তেমনি শুভাশুভ কথা শুনে শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের অপবাদ শুনে অতিশয় বিষণ্ণ হন। কিন্তু দুর্জনেরা পরের অপবাদ শুনে অতিশয় খুশী হন। সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদের সম্বর্ধনা করে যেরূপ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনের অপমান করে ততোধিক খুশী হয়। অদোষদর্শী সাধু ও দোষদর্শী অসাধু উভয়েই সুখে দিন গুজরাণ করে। কারণ অসাধু সাধুর নিন্দা করেন। কিন্তু সাধু ব্যক্তি অসাধু কর্তৃক অপমানিত হয়েও তার নিন্দা করেন না। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জন, সে সজ্জনকে দুর্জন বলে। যে ব্যক্তি তার মত দেখতে পুত্রকে সমাদর করেন না, সে অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোত্তম বলে নির্দেশ করেন। অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ভগবান মনু বলেছেন, (১) ঔরসজ, (২) লব্ধ, (৩) ক্রীত, (৪) পালিত এবং (৫) ক্ষেত্রজ এই পঞ্চবিধ পুত্র মানুষের ইহকালে ধর্ম, কীর্তি, মনকে প্রফুল্ল করে এবং পরলোকে নরকের দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ করে। মহারাজ! আবার বলছি তুমি এ পুত্রকে পরিত্যাগ কর না। আত্মমতে সত্য ধর্ম প্রতিপালন কর। কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ, শত শত যজ্ঞানুষ্ঠানের চেয়ে এক পুষ্করিণী খনন করা শ্রেষ্ঠ, আবার শত শত পুত্র উৎপাদন অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ। আবার একদিকে সহস্র অশ্বমেধ, অন্য দিকে এক সত্য রেখে তুলনা করলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক।

মহারাজ, সমস্ত বেদ অধ্যয়ন এবং সব তীর্থে অবগাহন করলেও এক সত্যের সমান হয় না। সত্যের সমান ধর্ম নেই, সত্যের তুল্য উৎকৃষ্টও আর কিছু নেই।

মহারাজ, সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা পালন করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম। অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ কর না। আজ যদি তুমি মিথ্যাচারী হয়ে আমায় পরিত্যাগ কর, আমার প্রতি শ্রদ্ধা হারাও, তবে আমি এখনই এ স্থান ত্যাগ করব, তোমার সংগে কখনও আলাপ করব না।

কিন্তু তুমি এটাও স্থির জেনো, তোমার অবর্তমানে আমার এই পুত্রই এই সসাগরা বসুন্ধরা প্রতিপালন করবে। আমি যদি জীবনে কখনও অন্যায় না করে থাকি, মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় না দিয়ে থাকি, তবে আমার কথার অন্যথা হবে না।

শেষের দিকে শকুন্তলা রাগে দুঃখে-ক্ষোভে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। পুত্রকে বুকের মাঝে চেপে ধরে কান্নার বেগ ও শোকাবেগ ভুলবার চেষ্টা করলেন।

পুরোহিত, শাস্ত্রী, ঋত্বিক ও আচার্যগণ এ দৃশ্য সইতে পারলেন না। তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারলেন শকুন্তলা মেনকার গর্ভজাত ও বিশ্বামিত্রের ঔরসজাত হলেও অসতী, মিথ্যাচারী বা স্বৈরিণী নয়।

তারা তখন দুষ্মন্তকে বললেন—দুষ্মন্ত! তুমি তোমার পুত্রকে প্রতিপালন কর। শকুন্তলাকে অপমান কর না। দেখ, ঔরসজাত পুত্রই পিতাকে নবক থেকে উদ্ধার করে। আমরা সকলে স্থির নিশ্চিত যে, শকুন্তলার গর্ভজাত এই পুত্র তোমারই পুত্র।

শ্রদ্ধাভাজন সমাজপতিদের মুখে একথা শুনে দুষ্মন্ত বললেন—আপনাদের সংগে আমিও একমত। মৃগয়ায় গিয়ে ওর রূপে মুগ্ধ হয়ে আমি ওকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করি। ঐ পুত্র আমার ঔরসজাত। আমি সব জেনেও আপনাদের ভয়ে আমার প্রিয়তমা ভার্যার সংগে দুর্ব্যবহার করেছি, কটূক্তি করেছি তার পিতামাতাকে, এজন্য আমি দুঃখিত। আর ও রাগান্বিতা হয়ে যা বলেছে তার জন্যও আমি বিন্দু মাত্র ক্রুদ্ধ নই। আমি ওকে এবং আমার পুত্রকে গ্রহণ করলাম। একথা বলে শকুন্তলার ক্রোড় থেকে পুত্রকে নিয়ে বক্ষে জড়িয়ে ধরে বললেন —প্রিয়ে, তোমায় যে কষ্ট দিয়েছি তার জন্য তুমি কিছু মনে কর না। যদি আমি এরূপ আচরণে লিপ্ত না হয়ে তোমায় গ্রহণ করতাম, তবে লোকে আমাকে দোষী করতো, তোমার গায়ে কলংক লেপন করত, ছেলেটিও স্বীকৃতি পেতো না। আজ এইসব সমাজপতিদের সম্মতি ক্রমে তোমায় গ্রহণ করাতে আর কোন দোষ রইল না।

এরপর রাজা দুষ্মন্ত শ্রী শকুন্তলাকে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে শ্রী-আচারের মাধ্যমে সসম্মানে রাজ অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন।

এর পর যথা সময়ে রাজ্যভার পুত্র ভরতের পরে দিয়ে তিনি পরলোক যাত্রা করেন। এই ভরতের নাম অনুসারে এই দেশের নাম হয় ভারত।

প্রণয়িনী দেবযানী

সদ্য স্নাতা এক বনবালা নির্জন বনে ফুলের সাজি হাতে ফুল তুলছিলেন। তার খোলা এলো চুল থেকে মুক্তোর মত বারি ঝরছে, তরুণ উষার অরুণ লোহিত কিরণ তার মুখে পড়ে তাকে মূর্তিমতী উষায় পরিণত করেছে।

অদূরে দাঁড়িয়ে এক যুবক বহু সময় ধরে এ দৃশ্য দেখছিলেন। তার গাত্রবর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের মত। সুদর্শন যুবকের কপালে চন্দনের তিলক, গলায় ফুলের মালা, পরণে পট্ট বস্ত্র, মুখে সরল হাসি।

যুবক পুষ্পচয়নরতা বনবালার কাছে এগিয়ে এসে বলল—যদি অনুমতি করেন তো, আপনাকে সাহায্য করতে পারি। এ শ্রম আপনার শোভা পায় না।

মুগ্ধনেত্রে যুবকের দিকে কিছু সময় চেয়ে থেকে বনবালা বলল—আমি প্রতিদিন দেবার্চনার জন্য পুষ্প চয়ন করি। এতে আমার কোন শ্রম হয় না। তা তোমার পরিচয় জানতে পারি কি?

—আমি দেবগুরু বৃহস্পতি তনয় কচ।

—আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী। তা দেব ও দানবের অহি নকুলের সম্পর্কের কথা জেনেও কোন্ সাহসে কি উদ্দেশ্যে তুমি এই শত্রুপুরীতে এসেছ?

—আমি আপনার পিতা জ্ঞানী শুক্রাচার্যের কাছে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করতে এসেছি।

—তুমি বৃহস্পতির পুত্র হয়ে কি করে আশা করলে যে, শত্রুপুত্রকে পিতা তার শিষ্য বলে মেনে নিয়ে শিক্ষা দেবেন?

—দেখুন, আমার পিতার সঙ্গে আপনার পিতার শত্রুতা থাকতে পারে, দেব দানবে যুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার সংগে

তো তাঁর কোন বিরোধ নেই। তাছাড়া যদি আপনি আমার হয়ে তাঁকে বলেন, তবে তিনি আমায় নিরাশ করবেন না। আমি জানি একমাত্র আপনিই পারেন আমাকে আপনার পিতার শিষ্যরূপে স্থান পাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

—কিন্তু যে দেব-সমাজ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বহিষ্কার করেছে, সেই সমাজের একজনকে কেন তিনি দীক্ষা দেবেন ?

—দেবি ! আমি এসব জেনেও আপনার কাছে এসেছি। কারণ আমি জানি সমগ্র বিশ্ব একদিকে, আর আপনার পিতার কাছে আপনি একদিকে। আপনার কথাকে তিনি অগ্রাহ্য করেন না। আমি আপনার শরণাপন্ন অতিথি। শরণাপন্ন অতিথিকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেওয়া ধর্মসঙ্গত নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সহায় সম্বল হীন এই যুবককে আপনি নিরাশ করবেন না।

—কচ, তুমি আজ ফিরে যাও। কাল এই সময়ে এখানে এস আমি পিতাকে বলে রাজী করাবার চেষ্টা করব।

—দেবি ! আমি কিন্তু স্বর্গে ফিরে যেতে আসিনি। হয় আমি আপনার সেবা করে আপনার পিতার স্নেহ পেয়ে যে বিদ্যা অর্জন করতে এসেছি, তা আয়ত্ব করব, নচেৎ প্রাণ দেব। ফিরে যাব না।

এরপর দেবযানী তার পিতাকে রাজী করিয়ে কচকে তাঁর শিষ্য হবার সুযোগ করে দিলেন এবং কচের দেখা শোনার ভার পড়ল দেবযানীর পরে।

* * *

এরপর প্রতিদিন ভোরে কচ পুষ্প চয়নে যেতে লাগলেন। কোন দিন দেবযানী তার সঙ্গী হতেন, কোন দিন বা একাকী। সন্ধ্যের সময় কচ নৃত্য-গীত ও বাদ্য বাজিয়ে দেবযানীর তুষ্টি সাধন করতেন। কি করলে দেবযানী খুশী হবেন, তার জন্য কচের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তেমনি দেবযানীও কচকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করতেন।

উভয়ে উভয়ের পরিচর্যায় লিপ্ত থেকে কয়েক বছর অতিক্রম করলেন। এক মুহূর্তের জন্যও কেউ কাউকে চোখের আড়াল করেন

না। উভয়ে উভয়ের খুব কাছে এলেন। কখনও বেনুমতী স্রোতস্বিনীর তীরে দেখা গেল কচ তন্ময় হয়ে বাঁশী বাজাচ্ছেন। দেবযানী তার কাছে বসে তন্ময় হয়ে সে বাঁশী শুনছেন। আবার কখনও কচের সুমধুর সুরের মূর্ছনায় মূর্ছা যাচ্ছেন।

ওদের এই অন্তরঙ্গ দৃশ্যের কথা দানবেরা শুক্রাচার্যের কাছে জ্ঞাপন করলে শুক্রাচার্য কচকে গোচারণের দায়িত্ব দিয়ে দূর বনে পাঠালেন।

এদিকে দানবগণ কচের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র অনেক দিন ধরেই করছিল। তাদের ধারণা কচ এসেছে কৌশলে দেবযানীকে বিয়ে করে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র যা একমাত্র শুক্রাচার্য জানেন—যার দ্বারা মৃত দানবেরা বেঁচে ওঠে, তা আয়ত্ব করতে। আর সে বিদ্যা শেখা হয়ে গেলেই ও স্বর্গে পালাবে। এসব চিন্তা করে একদিন দুষ্ট দানবগণ পাথরের আঘাতে কচকে মেরে শিয়াল কুকুরকে খেতে দিলে।

এদিকে গোধূলিতে গোপ শূন্য গোপালদের ফিরতে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন দেবযানী। সহচরী ঘূর্ণিকা তার সখীকে সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হয়ে শুক্রাচার্যকে ডেকে আনলেন এবং তিনি ভূমি শয্যা থেকে দেবযানীকে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—কাঁদছো কেন? যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর, পশু-পক্ষী যার দ্বারাই কচের নিধন হোক না কেন, তাকে আমি আমার মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে জীবিত করে আনব। কচ আমার শিষ্য, আমিই তাকে গোচারণে পাঠিয়েছিলাম। আমার প্রিয়ভাজন হতে গিয়ে সে প্রাণ দিয়েছে, অতএব তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা আমার অবশ্য কর্তব্য।

এবার ধ্যানে বসলেন শুক্রাচার্য। উচ্চারণ করলেন মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র। তারপর তারস্বরে চীৎকার করে উঠলেন—কচ, তুমি যেখানেই থাক ফিরে এস।

মন্ত্রের প্রভাবে কচ শৃগাল ও কুকুরের দেহ বিদীর্ণ করে জীবিত হয়ে বেরিয়ে এলেন গুরুর সামনে।

গুরুকে প্রণাম করে কচ দেবযানীর সংগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

এরপর কচের কাছে তার বিপদের কথা শুনে পিতাকে গিয়ে বললেন— বাবা, কচকে তুমি অন্য কাজের ভার দাও।

শুক্রাচার্য তখন কন্যার পরেই কচের ভার দিলেন।

এরপর আরও দুদিন কচকে দানবরা মেরে ফেলে। প্রথম দিন গুরুদেব আবার তাকে বাঁচান। কিন্তু দ্বিতীয় দিন তারা তাকে মেরে তপ্ত তেলে ভেজে সুরার সংগে তার দেহচূর্ণ মিশিয়ে তার গুরুদেবকে সেই সুরা পান করতে দিলেন।

দেবযানীর কথায় শুক্রাচার্য আবারও মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জপে কচকে ডাকতে লাগলেন।

কচ তখন শুক্রাচার্যের জঠরের ভিতর থেকে সাড়া দিলেন।

শুক্রাচার্য তার উদর গহ্বরে কচের সাড়া পেয়ে বিস্ময়ান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস কবলেন—কচ, তুমি আমার উদরে প্রবেশ করলে কি করে ?

একথা শুনে কচ কি করে গুরুর উদরে প্রবেশ করেছেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন—গুরুদেব ! আপনি থাকতে কখনও আসুরী মায়া ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করতে পারবে না।

একথা শুনে শিষ্যগর্বে গর্বিত গুরু দেবযানীকে বললেন—দেবযানী, আমার উদর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসার শক্তি কচের নেই। এখন কচকে বাঁচাতে হলে আমাকে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়। আর আমাদের উভয়কে বেঁচে থাকতে হলে কচকে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা শেখাতে হয়, আমার মৃত্যুর পর আমার উদর বিদীর্ণ করে বেরিয়ে, সে তা আমার পরে প্রয়োগ করবে।

—বাবা, কচের পরে আমার পূর্ণ আস্থা আছে।

তিনি তখন কচকে বললেন—কচ, একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ আমার গর্ভ থেকে পুনর্জীবিত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। তুমি পারবে শুধু মন্ত্র বলে। আর একটি কথা, তুমি পুত্র রূপে আমার দেহ থেকে বের হয়ে আমায় আবার ঐ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রয়োগে জীবিত করবে।

—গুরুদেব ! আপনার শিষ্য কচ কখনও ধর্মপালনে পরাঙ্মুখ হবে না।

গুরুর গর্ভ গহ্বরে থেকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ব করে কচ বেরিয়ে এলেন এবং সিদ্ধ বিদ্যা দ্বারা গুরুর জীবন ফিরিয়ে দিলেন।

কচের কৃতিত্বে গর্বিত গুরু শুক্রাচার্য বললেন—কচ! আজ তুমি শুধু শিষ্য নও, আমার পুত্রের স্থান দখল করলে। তোমার শিক্ষা আজ শেষ হল। তুমি আজ মুক্ত। যেখানে খুশী যেতে পার।

এবার মহানুভব শুক্রাচার্য সুরাসক্ত হয়ে কচকে ভক্ষণ করার প্রায়শ্চিত্ত কল্পে বললেন—আজ থেকে যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মে, ব্রাহ্মণ হয়ে ভুল বশতও মদ্য পান করবে, সে অধার্মিক চণ্ডালরূপে পরিচিত হবে এবং ইহকালে ও পরকালে নিন্দিত ও ঘৃণিত হয়ে অশেষ ক্লেশ ভোগ করবে। শুক্রাচার্যের এই অভিশাপের ফলে সুরাপান ব্রাহ্মণ সমাজে নিষিদ্ধ হয়।

গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কচ গিয়ে হাজির হলেন দেবযানীর কাছে। যার সাহায্য না পেলে, যার সহানুভূতি ও স্নেহ না পেলে তিনি গুরুর কাছ থেকে সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্বে আনতে পারতেন না এবং তার এত কষ্ট করে মর্ত্যে আসা এবং কৃচ্ছ্র সাধন ব্যর্থ হত।

—দেবযানী, আজ আমি স্বর্গে ফিরে যাচ্ছি। তোমার কাছে তাই অনুমতি নিতে এলাম।

—বেশ, এতো আনন্দের কথা, যে বিদ্যালাভের জন্য তুমি এক হাজার বছর সাধনা করেছ তা আয়ত্বে এসেছে, এখন তো যাবেই! তা এখানে কেন? আর বিদায়ের ভণিতাও বা কেন?

—দেবযানি! আমায় তুমি হাসি মুখে বিদায় না দিলে আমি যেতে পারি না। সেদিন যেমন তুমি আমায় হাসি মুখে বরণ করেছিলে, আজ তেমন হাসি মুখে বিদায় দাও।

—কচ, তুমি দেবলোকের অধিবাসী। সাধনায় সিদ্ধি লাভের আনন্দে তুমি আজ সুখীদের অন্যতম। এই বিজন বিভূঁয়ে এসে যার জন্য তুমি কৃচ্ছ্র সাধন করেছ—তা তোমার করায়ত্ব। অতএব তোমার মত সাফল্যের হাসি কি করে আমার মুখে ফুটে উঠবে? এ তো তোমাদের স্বর্গলোক নয় যে, সব সময় মুখে হাসি থাকবে? দেখ, এখানে ব্যথা

পেয়ে লোক কাঁদে। কামনায় পুড়ে মরে, ঈর্ষায় জ্বলে। এখানকার লোকদের মনে কামনা-বাসনা আছে—আছে চাওয়া-পাওয়া। আর চাওয়াটি ঠিক মত না পেলে লোকে হাসে না, কাঁদে। দেখ, তোমাকে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়ে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করার জন্য দেবলোকে সুরাঙ্গনাগণ অপেক্ষা করে আছে, মিথ্যা এখানে সময় নষ্ট না করে সেখানে ফিরে যাও।

—দেবযানি! তোমার কণ্ঠে বিদ্রূপের ছোঁয়া কেন?

—কচ, তুমি কি সত্যই বুঝতে পারছো না, কেন সদা হাস্যময়ী দেবযানীর মুখের হাসি ম্লান হয়েছে? এখানকার এত দিনের কোন স্মৃতি কি তোমার মনে বেদনার সঞ্চার করে না?

– দেবযানি, এই বনভূমি, এই বট বৃক্ষতল, এই বেনুমতী নদী যাদের মাঝে আমি আমার জীবনের অর্ধেক অতিবাহিত করেছি, যে হোমধেনুর দুধে পুষ্ট হয়েছে আমার দেহ, তাদের আমি কোনদিন ভুলব না।

—আর কারও স্মৃতি কি তোমার মনে পড়ে না?

—পড়ে। তার কথা চিরস্মরণীয় হয়ে লেখা থাকবে আমার অন্তরে। তাকে কি করে ভুলব? সে যে আমার জীবনদাত্রী। তিন তিনটি বার তার জন্য আমি দানবদের হাতে মরেও বেঁচে রইলাম। তার কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম। তার স্মৃতি আমার অন্তরে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

—শুধু স্মৃতি? সে স্মৃতিকে কি চিরন্তন করে রাখা যায় না?

—না।

—শুধু প্রশংসার জন্য তুমি একটা মিথ্যাকে অন্তরে লালন করবে?

—না দেবযানি, এটা মিথ্যা নয়। শুধু ঐ মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র আয়ত্তে আনবার জন্যই আমি এখানে এসেছিলাম।

—মিথ্যে কথা। গর্জে উঠলেন দেবযানী। যদি শুধু বিদ্যার্জনই তোমার উদ্দেশ্য হবে, তবে কেন আমি ফুলের সাজি নিয়ে ফুল তুলতে বের হলে তুমি পাঠে অবহেলা করে আমার সংগে ফুল তুলতে যেতে?

সুগন্ধ যুক্ত ফুলের মালা আমায় পরাতে, আমার পরিশ্রমের ভার লাঘব করতে সব কাজ করে দিতে, প্রতি সন্ধ্যায় দেবলোক থেকে শিখে আসা মধুর সঙ্গীত আমায় শোনাতে ?

—দেবযানি, আমি কপটাচারী নই। তুমি আমার গুরুকন্যা। তোমার সেবা করা আমার করণীয় কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম। এতে দোষ কোথায় ?

—কচ, আমি তোমাতে আসক্তা। তুমি কুল-শীল ও মানে স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। তুমি আমাকে তোমার জীবনসঙ্গিনী করে স্বর্গে নিয়ে চল।

—দেবযানি, আমায় এ অন্যায় অনুরোধ তুমি কর না। তুমি যে পিতার ঔরসে জন্মেছ, আমিও কিছু সময় সেই পিতার গর্ভে ছিলাম। অতএব তোমার পিতা আমার পিতা ও মাতার স্থান অধিকার করেছেন। তিনি আমাকে পুত্রের মর্যাদা দিয়েছেন। সেই সূত্রে তুমি আমার ধর্মবোন। অতএব কি করে তোমার এই অশাস্ত্রীয় প্রস্তাবকে প্রশ্রয় দেই? এসব স্মৃতিকে ভুলে হাসি মুখে আমায় বিদায় দাও।

একথা শুনে রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে দেবযানী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে স্নেহ-মায়া-সহানুভূতি বিসর্জন দিয়ে ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতো গর্জে উঠে বললেন—কচ, আমি যদি কায়মনে তোমাকে ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে মনে স্থান দিয়ে না থাকি, তবে তুমি যে বিদ্যা আয়ত্ত করেছ বলে গর্বিত, সে বিদ্যা তোমার ফলপ্রসূ হবে না।

—দেবযানি, আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি তুমি রাজরাণী হবে।

* * *

এই ঘটনার পর একদিন দেবযানী যখন এক নির্জন বনস্থ সরোবরে সখীদের সংগে জল ক্রীড়া করছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধাতে এদের বস্ত্রগুলি একত্রিত করে দেন।

দেবযানী দেখে দানব দুহিতা শর্মিষ্ঠা তার কাপড় পরেছে। এতে দুজনের মধ্যে বচসা হয়। দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে কুৎসিৎ ভাষায়

গালিগালাজ করলে ক্রুদ্ধা শর্মিষ্ঠা তাকে স্থানীয় এক কূপে নিক্ষেপ করে চলে যান।

সৌভাগ্যবশত নহুষ নন্দন যযাতি কিছু পরে সেখানে মৃগয়ায় এসে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেই কূপের কাছে আসেন এবং দেবযানীকে হাত ধরে তোলেন।

দেবযানী কি করে কূপে নিক্ষিপ্ত হলেন তার বর্ণনা দেন। উভয়ের সংগে উভয়েব পবিচয় হয় এবং পরিশেষে এর কিছু দিন পরে আবার যযাতি ঐ কাননে মৃগয়ার্থে এলে দেবযানীর সম্মুখীন হন। দেবযানী যযাতিকে পতিত্বে বরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

একথা শুনে যযাতি বললেন—দেবযানি, ব্রাহ্মণের সংগে ক্ষত্রিয়ের বিবাহকে সমাজ মেনে নেবে না এবং তোমার পিতা তো নয়ই। আমিই বা কেন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব ?

-মহাবাজ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে বিবাহ অশাস্ত্রীয় এমন কথা কোথাও লেখা নেই। আর আমাব পিতা আমাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও যাবেন না। অতএব আপনাব দৃষ্টিতে আমি যদি কুরূপা না হই, তবে আপনি আমার পাণি গ্রহণ করতে পারেন।

—দেবযানি! যদিও চার বর্ণেব লোকই একই অঙ্গ থেকে উৎপন্ন, কিন্তু তাই বলে তাদেব আচার-আচরণ এক নয। চাব বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্ম প্রণালী ও আচার আচরণ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেইজন্যই ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট বর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়। আমি নিম্ন বর্ণের লোক হয়ে কি করে শ্রেষ্ঠ বর্ণের কন্যার পাণি গ্রহণ করব?

—মহারাজ! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানবান। অতএব আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, কন্যার পাণি গ্রহণ করলেই তাকে বিবাহ করতে হয়। পুরাকাল থেকে প্রচলিত এই প্রথাকে যদি অস্বীকার করতে না চান, তবে কিন্তু আপনি পূর্বেই আমার পাণি গ্রহণ করেছিলেন।

একথা শুনে যযাতি স্মৃতির সমুদ্রে সাঁতার কাটতে লাগলেন।

যযাতিকে চিন্তিত দেখে দেবযানী বললেন—মহারাজ! কয়েক বছর আগে এই বনের ঐ কূপ থেকে আপনি কিন্তু আমার পাণি গ্রহণ

স্বরে আমায় উদ্ধার করেছিলেন। সেইজন্য আপনাকে পতিত্বে বরণ করতে আমি এত আগ্রহী। এখন আপনি আমার পাণি গ্রহণ করুন চাই না করুন, আপনাকেই আমি পতি বলে মানব। চিরকাল কুমারী ব্রত পালন করব, তবুও অন্য কাউকে আমার পাণি স্পর্শ করতে দেব না।

—কিন্তু তোমার পিতার অনুমতি কি মিলবে?

—নিশ্চয়ই, তিনি এতে সম্মতি দেবেন।

অতঃপর কন্যার মুখে যযাতির পরিচয় পেয়ে ও তাঁর অভিপ্রায় জানতে পেরে শুক্রাচার্য বিধি ও বিধান অনুসারে যযাতির করে দেবযানীকে অর্পণ করলেন।

এখন যযাতিকে পতিরূপে পেয়ে দেবযানী সুখী হয়েছিল কিনা? শর্মিষ্ঠার কাহিনীতে সেকথা জানা যাক। কারণ দেবযানীর জীবনে শর্মিষ্ঠার একটি বড় ভূমিকা ছিল।

———

দানব দুহিতা শর্মিষ্ঠা

দানবরাজ বৃষপর্বা দুহিতা শর্মিষ্ঠা শান্ত, সুশীলা ও সুভাষীরূপে সমাজে সমাদৃতা ছিলেন।

দৈব দুর্বিপাকে ভুলবশতঃই হোক বা সখী ভেবেই হোক একদিন এক সরোবরে স্নান করতে গিয়ে তার সহচরী গুরুকন্যা দেবযানীর পরিধেয় বস্ত্রখানি তিনি পরিধান করতে উদ্যত হলে দেবযানী ছুটে এলেন।

শর্মিষ্ঠার দেহ থেকে বস্ত্র উন্মোচন করতে সচেষ্ট হয়ে বললেন— শর্মিষ্ঠা নিম্ন বর্ণের মেয়ে হয়ে উচ্চ বর্ণের বস্ত্র পরিধান করার স্পর্ধা তোকে কে দিল ?

—দেবযানি, আমার পিতা নীচু জাতি হলেও রাজা। আর তাঁর রাজ্যে তাঁর অনুগ্রহে প্রতিপালিত তুমি প্রজা ছাড়া আর কিছুই নও।

—কি বললি, তুই আমাকে তোর সমকক্ষ ভাবিস ? অসুরের সংগে দেবতার তুলনা করিস ?

—তুমি ভুল করছো দেবযানী। আমি তোমায় সমকক্ষ বলে মনে করি না। আর তা করবই বা কি করে ? আমার বাবা যখন শুয়ে বা বসে থাকেন, তোমার বাবা তখন তার নীচে বসে অতি বিনীতভাবে তাঁর স্তুতি করে থাকেন। যে ব্যক্তি স্তব-স্তুতি, পূজা পাঠ ও ভিক্ষা-বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, তুমি তার কন্যা আর আমি রাজকন্যা। তোমার পিতা আমার পিতার বেতনভোগী কর্মচারী। অতএব বুঝে দেখ কে শ্রেষ্ঠ ? কাকে কার অধীনে থেকে সেবা করা উচিত্ ? তাছাড়া দেব ও দানব কিন্তু আসলে দুই ভাই।

—এ আবার কবে থেকে হল ? আর তারা যদি ভাইই হবে, তবে তাদের মাঝে এত দ্বন্দ্ব কেন ?

—তবে শোন।

মনুর ঔরসে শতরূপার জঠরে আহুতি, দেবহুতি ও প্রসূতি নামে তিন পতিব্রতা কন্যার জন্ম হয়।

প্রাপ্ত বয়সে তাদের রুচিমুনি, কর্দমুনি ও দক্ষরাজের করে অর্পণ করা হয়।

দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে ষাটটি কন্যার জন্ম হয়। দক্ষরাজ তার আটটি কন্যা ধর্মরাজকে, এগারোটি রুদ্রদেবকে, তেরোটি কশ্যপ মুনিকে, সাতাশটি চন্দ্রদেবকে এবং একটি শিবকে দেন। শিবের পত্নী সতী।

দক্ষরাজ কশ্যপ মুনিকে যে তেরোটি কন্যা দিয়েছিলেন তার দ্বারাই এই সৃষ্টি। দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে দেব, দিতির গর্ভে দৈত্য, কদ্রুর গর্ভে সর্প, বিনতার গর্ভে পক্ষী, সুরভির গর্ভে গো-মহিষাদি পশু, সরমার গর্ভে সারমেয়, দনুর গর্ভে দানবের জন্ম হয়। দেবগুরু বৃহস্পতি ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যও দুই ভাই। অতএব ভেবে দেখ আমি তোমাপেক্ষা কোন অংশে হীন নই।

একথাতে কিন্তু দেবযানীর মনে কোন ভাবান্তর এল না। তিনি শর্মিষ্ঠার দেহ থেকে তার বস্ত্রখানি বিচ্ছিন্ন করতে সচেষ্ট হন এবং শর্মিষ্ঠা বিবস্ত্রা হবার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পেতে দেবযানীকে ধাক্কা দেন এবং তিনি কূপে পতিত হন।

এরপর যযাতি তাঁকে কূপ থেকে মুক্ত করলেও তিনি গৃহে ফিরে যান না। স্নেহান্ধ পিতা এসে কন্যাকে ধূলায় লুণ্ঠিত দেখে তাকে গৃহে ফেরার অনুরোধ জানালে তিনি তার পিতাকে বলেন যদি শর্মিষ্ঠা তার এক হাজার দাসীসহ তার দাসীত্ব স্বীকার করে তবে তিনি গৃহে ফিরবেন—নচেৎ অনশনে প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

শেষ পর্যন্ত গুরুকে তার রাজ্যে রাখতে এবং গুরুকন্যার প্রাণ রক্ষার্থে পিতার আজ্ঞায় শর্মিষ্ঠা হাজার দাসীসহ দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হন। দেবযানীর বিবাহের পরও শর্মিষ্ঠা দাসীসহ তার সহগামিনী হন।

*　　　*　　　*

রাজনন্দিনী শর্মিষ্ঠা পিতার সত্য পালনার্থে দেবযানীর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন এক পর্ণ কুটিবে অতি দীন হীনভাবে জীবনযাপন করতে লাগল।

একদিন সেই নির্জন বনে একাকী ভ্রমণ করতে করতে যযাতি শর্মিষ্ঠাকে দেখে ফেললেন। কাছে এগিয়ে গিয়ে তাব পরিচয় জিজ্ঞেস করলে শর্মিষ্ঠা বললেন—মহাবাজ! আমি আপনার পত্নী দেবযানীর দাসী। আপনার দেয় অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানে বাস করি। আমি বৃষপর্বা দুহিতা শর্মিষ্ঠা।

– তা তুমি কেমন আছ?

—আপনার অনুগ্রহে এত দিন ভালই ছিলাম। আর বুঝি সে সুখ আমার সইল না।

—কেন? তোমাব এখানে কি অসুবিধা হচ্ছে?

—মহারাজ! আমাব সতীত্ব ও নারীব সম্মান আজ বিঘ্নিত।

—বল, কার দ্বারা এ হীন কার্য অণুষ্ঠিত হয়েছে?

—মহারাজ, কেউ আমার শ্লীলতা হানি করেনি বা করার স্পর্ধাও প্রকাশ করেনি।

—তাহলে?

—মহারাজ! আজ আমি ঋতু স্নান কবে শুদ্ধা হয়েছি। এখন আমার ঋতু রক্ষা না হলে আমি যে পতিতা হব। আপনি আমার ঋতু রক্ষা করে, ভ্রূণ হত্যাজনিত পাপ থেকে আমায় মুক্ত করুন।

—শর্মিষ্ঠা, তোমার সখী দেবযানী বর্তমান থাকতে আমি কি করে এই অনুচিত কর্মকে প্রশ্রয় দেই?

—মহারাজ! বহু বিবাহ তো ক্ষাত্র ধর্ম। আর ঋতুমতী নারী তার ঋতু রক্ষার জন্য কোন পুরুষের পাণি গ্রহণ করতে চাইলে পুরুষ যদি তাতে অসম্মত হয়, তবে তাকেও ভ্রূণ হত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হতে হয়।

—তোমার কথার যৌক্তিকতাকে আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু

তোমার সংগে কোনরূপ আপত্তিকর আচরণে লিপ্ত হব না, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমার শ্বশুর মশাইকে।

—মহারাজ! আমাদের এ সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।

—শর্মিষ্ঠা, আমি মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত নই।

—মহারাজ! স্ত্রীর মনোরঞ্জনে, পরিহাস প্রসঙ্গে, বিবাহকালে, প্রণয়ে এবং প্রাণ সঙ্কটে মিথ্যা বলা অন্যায় নয়।

—শর্মিষ্ঠা, রাজাই প্রজাদের দৃষ্টান্ত স্থল। মিথ্যা কথা বললে সে রাজা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমি নিদারুণ অর্থ কষ্টেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে চাই না।

—মহারাজ! এক সখীর পতি অপর সখীর পতি হলে তা অশাস্ত্রীয় নয়। আর পুরাণে এরূপ বহু ঘটনা আছে।

—শর্মিষ্ঠা, রাজার আশ্রিত ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা পূরণ করা রাজার উচিত কর্ম। কিন্তু আমি নিরুপায়।

—মহারাজ! আপনি রাজা। ধর্ম রক্ষা করা, আশ্রিতকে আশ্রয় দান করা আপনার অবশ্য কর্তব্য। অতএব আমার ধর্ম রক্ষা করে আপনি রাজার কর্তব্য পালন করুন।

—কিন্তু দেবযানীর কি হবে? সে যদি জানতে পারে, তবে যে অনর্থ হবে।

—জানতে পারবেন না। তাছাড়া আপনি আমাকে কথা দিন আমার ও দেবযানীর প্রতি আপনার ভালোবাসা সমভাবে বন্টিত হবে এবং উভয়ের মনোরথই আপনি পূরণ করবেন।

অবশেষে শর্মিষ্ঠার সাধনার, নিষ্ঠার ও প্রেমের জয় হল।

দুটি কামনা-বাসনা ও ভালোবাসার সূত্র একত্রিত হল।

এর পর বহু দিন বহু বার।

* * *

এর পর কেটে গেল আরও বহু দিন। একদিন আবার শর্মিষ্ঠার কুটিরের সামনে দেবযানীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—শর্মিষ্ঠা!

তুই শেষ পর্যন্ত প্রবৃত্তির তাড়নায় পর পুরুষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হলি ? বল্ তোর আগত সন্তানের পিতা কে ?

—এক বেদপরাগ, ধর্মপরায়ণ ঋষিকে আমি সেবা করি এবং আমার সেবায় তুষ্ট হয়ে তিনি আমায় বর দিতে চাইলে আমি ভ্রূণ হত্যাজনিত পাপ থেকে রক্ষা পেতে, ঋতুরক্ষার্থে তার সঙ্গ কামনা করি। আর তাঁরই আশীর্বাদ স্বরূপ এই সন্তানের আগমন।

—বেশ, মানলাম তোর আগত সন্তান ঋষির দান। তা সেই ঋষির নাম ও গোত্র কি ?

— দেবযানি, সেই ঋষি সূর্যের মত তেজস্বী, তাঁকে দেখে আমি এত ভীত হয়েছিলাম যে, নাম গোত্র জিজ্ঞেস করার স্পর্ধা প্রকাশ করিনি।

—বেশ, এবার এলে তাঁর নাম গোত্র জেনে নিস। তা না হলে তোর সন্তানের জীবিকানির্বাহ দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

* * *

কালের কবলে মিলিয়ে গেল আরও কয়েকটি বছর।

ইতিমধ্যে যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বাহু নামে দুই পুত্র এবং মাধবী নামে এক কন্যা জন্মে এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিনটি পুত্র হয়।

একদিন যযাতি তাঁর গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে দেবযানীর আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময় শর্মিষ্ঠার ছেলেরা সেখানে খেলতে এল। যযাতি পুরুকে কাছে ডেকে স্নেহ চুম্বনে আপ্লুত করে কোলে বসালেন। অদূরে দেবযানীকে দেখেই তিনি পুরুকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললেন—যাও, খেলা কর গিয়ে।

দেবযানী এগিয়ে এসে শিশু পুত্রটিকে আদর করে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি ?

—পুরু।

—পিতার নাম কি ?

—সম্রাট যযাতি।

—মা ?

—শর্মিষ্ঠা।

এই কথা শুনে রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে তিনি ছুটে গেলেন শর্মিষ্ঠার কাছে। তার উত্তেজিত কণ্ঠে শর্মিষ্ঠা ডাক শুনে আগত ঘটনাকে স্বাগত জানাতে বাইরে বেরিয়ে এসে শান্ত স্বরে বললেন—রাজকুমারী, ভিতরে এস।

—না, আগে বল তুই সেদিন আমায় মিথ্যা বলেছিলি কেন ?

—আমি মিথ্যা বলিনি। আমার নজরে আমার পুত্রের জনক ঋষিতুল্য।

—এ তুই কি করলি ? আমার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, আমার দাসীত্ব স্বীকার করে, আমার স্বামীকে সঙ্গ দিতে তোর বিবেকে বাধল না ?

—দেবযানি, আমি কোন অন্যায় করেছি বলে তো মনে হয় না।

—শর্মিষ্ঠা, শাস্ত্রে আছে, সেবকের উপার্জিত অর্থে, গচ্ছিত অর্থে বা সঞ্চিত অর্থে প্রভুর অধিকার আছে, কিন্তু সেবাদাসীর তার মনিবের কোন জিনিসে অধিকার নেই।

—দেবযানি, তুমি আমাকে তোমার সেবাদাসী মনে করলেও আমি তোমাকে আমার বাল্য সহচরী বলে মনে করি। তাই ধর্মতঃ এক সখীর পতি অন্য সখীর পতি হতে পারেন বা এক সখী অন্য সখীর পতিকে পতিত্বে বরণ করতে পারে, এতে কোন দোষ হয় না।

—তা তিনি যে তোরও স্বামী তার প্রমাণ কোথায় ?

—তিনি আমাকে তাঁর নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দিয়ে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করেছেন এবং আমার পুত্রদের রত্ন হার দিয়েছেন।

একথা শুনে বৃশ্চিক দংশনের মত জ্বলতে লাগল দেবযানীর অন্তর। এমন সময় সামনে যযাতিকে দেখে তিনি গর্জে উঠলেন—ভীরু-কাপুরুষ, লম্পট তুমি এত নীচে নামতে পার, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এখন বুঝতে পারছি নীচু জাতির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমি কি ভুলই না করেছি। আমি আর এক

মুহূর্তের জন্যও তোমার সঙ্গে বসবাস করতে পারব না।

এই কথা বলে দেবযানী দ্রুত পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

পিতাকে সব জ্ঞাত করালে, স্নেহান্ধ পিতা ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন —যযাতি আমার নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে যে হীন আচরণ করেছে তার ফল স্বরূপ তাকে এই মুহূর্তে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধতে পরিণত হতে হবে।

শাপগ্রস্ত যযাতি কি পরিস্থিতিতে কেন অনুরূপ আচরণে লিপ্ত হয়েছিলেন তা অকপটে ব্যক্ত করলে শুক্রাচার্যের মনে দয়ার উদ্রেক হল। তিনি বললেন—তোমার পুত্রদের মধ্যে যদি কেউ তোমার জরা গ্রহণে রাজী হয়, তবে তুমি তোমার যৌবন ফিরে পাবে এবং সেই পুত্রই এই রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর হবে।

দেবযানীর দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার দুই পুত্র পিতার জরা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে শর্মিষ্ঠার কথায় শেষ পর্যন্ত পুরু যযাতির জরা গ্রহণ করেছিলেন।

পরে তিনিই হয়েছিলেন এই রাজ্যের অধীশ্বর। আর তার থেকেই পুরু বংশের উৎপত্তি।

পুরু থেকে হল পৌরব বংশ। যদু থেকে যাদব বংশ। তুর্বাহু থেকে যবন বংশ। দ্রুহ্য থেকে বৈভোজ বংশ এবং অনু থেকে ম্লেচ্ছ জাতির সৃষ্টি হয়।

শর্মিষ্ঠার নিষ্ঠা, ত্যাগ, ভক্তি ও ভালোবাসার ফলে তার পুত্র পুরুর বংশ বিখ্যাত হয়েছিল। তার বোন মাধবী সৃষ্টি করেছিল আর এক মহতী কীর্তি। সেদিকে এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক।

———

তাপসী মাধবী

সম্রাট যযাতি তার রাজ্যভার তাঁর পুত্র পুরুকে দিয়ে বানপ্রস্থে গিয়ে এক বনের নির্জন কুটিরে তাঁর কন্যা মাধবীকে নিয়ে যখন দিনাতিপাত করছিলেন—তখন একদিন তাঁর সেই পর্ণকুটিরে গরুড় তাঁর প্রিয় বন্ধু গালব ঋষিকে নিয়ে হাজির হলেন।

যযাতি তাঁদের আপ্যায়ন করে বসালে গরুড় বললেন—মহারাজ! আমার বন্ধু গালব বিশ্বামিত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শিক্ষা শেষ করে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে, বিশ্বামিত্র তাঁর কাছে আটশ শ্বেতবর্ণের এমন অশ্ব চেয়ে বসলেন, যাদের কানের রং কালো। এখন তার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

সর্বত্যাগী রাজর্ষি যযাতি তখন গালবের করে তাঁর কন্যা মাধবীকে দিয়ে বললেন—ঋষিবর! আমি আজ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই কন্যা ছাড়া আমার বলতে আর কিছু নেই। এর দ্বারা আপনি আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ বা অশ্ব সংগ্রহ করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাধবী তার প্রিয়তম পুরুষের ঋণমুক্তি যজ্ঞের শরিক হলেন। একে একে আত্মদান করলেন অযোধ্যাধিপতি হর্য্যাশ্ব, কাশীরাজ দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরকে। ফলে হর্য্যাশ্বের ঔরসে তার গর্ভে জন্মাল বহুমনা, দিবোদাসের ঔরসে প্রতর্দ্দন, এবং উশীনরের ঔরসে শিবি।

কিন্তু এত সব করেও মাত্র ছ'শ' ঘোড়া সংগ্রহ হল। বাকী ঘোড়া সংগ্রহে অপারগ হয়ে গালব আবার তাঁর বন্ধু গরুড়ের শরণাপন্ন হয়ে গরুড়কে তার সমস্যার কথা জ্ঞাপন করলে গরুড় বললেন—গালব!

রাজা ঋচীক কান্যকুব্জদেশাধিপতি গাধীরাজের কাছে তার কন্যা সত্যবতীর পাণি প্রার্থনা করলে গাধীরাজ বলেছিলেন—আপনি যদি শ্বেত বর্ণের কালো কান যুক্ত এক হাজার ঘোড়া এনে দিতে পারেন, তাহলে আমি আপনার হাতে আমার সত্যবতীকে সমর্পণ করব। ঋচীক গাধীরাজকে অনুরূপ এক হাজার ঘোড়া দিয়ে সত্যবতীকে গ্রহণ করেন। গাধীরাজ সেই অশ্ব দ্বিজাতিগণকেই দান করেন। তার মধ্যে চার শ' তিস্তা নদী পার হবার সময় জলে ডুবে মারা যায়। অতএব তুমি যে ঘোড়া সংগ্রহ করেছ, তা ঐ ঋচীকর দেওয়া গাধীরাজের দান করা। তাই আর দুশো ঘোড়া পাবার তোমার কোন উপায় নেই।

— তাহলে আমি কি করে ঋণমুক্ত হব ?

— দেখ, তুমি এই সংগৃহীত ছ'শ' ঘোড়া নিয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে যাও এবং মাধবীকে তার বাকী দু' শোর জন্য দান কর। তাহলেই ঋণ মুক্ত হতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

গরুড়ের পরামর্শ মত গালব ছ' শ' ঘোড়া ও মাধবী সহ বিশ্বমিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বললেন— গুরুদেব ! আমি বহু চেষ্টা করে বিভিন্ন প্রান্তর থেকে আপনার প্রার্থিত ছ' শ' ঘোড়া সংগ্রহ করেছি, বাকী দুশো ঘোড়ার বদলে এই কন্যাকে গ্রহণ করে আমায় ঋণমুক্ত করুন।

বিশ্বমিত্র ছ'শ' ঘোড়া ও মাধবীকে গ্রহণ করে গালবকে ঋণ মুক্ত করলেন এবং মাধবীর গর্ভে তাঁর ঔরসে অষ্টক নামে এক পুত্র জন্মাল। তিনি তখন একদিন গালবকে ডেকে বললেন—গালব, আমি ঋষি। বৈষয়িক বাসনা আমার নেই। পরকালের জন্য যে পুত্রের কামনা করেছিলাম তা মাধবীর কল্যাণে আমার হয়েছে। এখন মাধবী ও ছ' শ' ঘোড়া আমি তোমায় দান করলাম। এই কথা বলে তিনি তপস্যার জন্য গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

মাধবী গালবকে মনে মনে পতিরূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং সেই জন্যই গালবের দুঃখ, সমস্যা ও ঋণকে নিজের ঋণ ভেবে তিনি

চারজন পুরুষের কাছে গিয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করে চারটি অপত্য উৎপাদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই আত্মত্যাগের কোন মূল্যই গালব দিলেন না। তাঁর হৃদয়ে মাধবীর কোন স্থান ছিল না। তাই কার্যোদ্ধারের পর তিনি মাধবীকে বললেন—মাধবী, তুমি তোমার পিতা, তিনজন রাজা এবং দুজন ঋষিকে উদ্ধার করেছ, এবার তুমি তোমার পিতার আশ্রমে ফিরে যাও।

— ফিরে যাব ? বিস্ময় ঝরে পড়ে মাধবীর কণ্ঠে।

— হ্যাঁ, মাধবী, তোমার সেখানে ফিরে যাওয়াই উচিত।

— আমার কোথায় ফিরে যাওয়া উচিত সে কথা আপনার না ভাবলেও চলবে কিন্তু আমি কি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি না ?

— না। আমি সর্বত্যাগী যোগী। আশ্রমই আমার মন্দির। তপস্যাই আমার মন্ত্র।

— আচ্ছা, আমার কোন করণীয় কর্ম কি আপনার অন্তরে রেখাপাত করে না ?

— কেন করবে না। আমি স্বীকার করি তোমার জন্যই চারটি বংশ এবং আমি রক্ষা পেয়েছি। আমি এ জন্য তোমার ও তোমার পিতার কাছে চির কৃতজ্ঞ। তুমি আমাকে ঋণ মুক্ত করেছ। গুরু দক্ষিণা দিতে পেরে আমার শিক্ষা আজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

— আপনি কি শুধু গুরু ঋণ পরিশোধের জন্যই আমাকে গ্রহণ করেছিলেন ?

— এ ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মাধবী, যদি অজান্তে তোমার অন্তরে কোন ব্যথা দিয়ে থাকি, তুমি নিজ গুণে আমায় ক্ষমা করে দিও।

— দ্বিজবর। আপনি আমার ইহকাল পরকাল, সুখ-দুঃখ শান্তির এক মাত্র স্থল। আপনার আদেশই আমার শিরোধার্য।

— বেশ, তবে চল তোমাকে তোমার বাবার কাছে রেখে আসি।

— নাইবা আর অতো কষ্ট করলেন। আমি একাই যেতে পারব।

*　　　*　　　*

মাধবী তার পিতার কাছে ফিরে এলেন। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন তঁার কোলে।

কান্নার বেগ প্রশমিত হলে পিতা পরম স্নেহে কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— কাঁদিস্ না মা। পরের জন্য আত্মাহুতি দেওয়া তো গৌরবের। দেবের কল্যাণে বৃত্রাসুর বধের জন্য দধীচির তনু ত্যাগ, আজও অমর হয়ে আছে। তোর আত্মত্যাগও তার চেয়ে কিছু কম নয়। তুই নিঃস্বাথে যা করেছিস তার মূল্য তুই পাবি। গালবের নাম ভুলে গেলেও তোর আত্মত্যাগের কথা কেউ ভুলবে না। তোর গর্ভজাত সন্তানও বিশ্বখ্যাত হবে। গালবের স্মৃতি তুই মন থেকে মুছে ফেল।

— বাবা, পিতা যার করে কন্যাকে সমর্পণ করেন, তিনি সেই কন্যার স্বামী হন। অতএব গালবকে আমি আমার স্বামী বলেই মনে করি। তঁাকে ভুললে তো আত্মাকেই অস্বীকার করতে হয়।

— কিন্তু মা, যে তোকে সে সম্মান দেয়নি তার পেছনে ছুটে না বেড়িয়ে রাজকন্যার মত স্বয়ংবর সভা থেকে তোর যোগ্য বর বেছে নে।

মাধবীর মনে তখনও ক্ষীণ আশা হয়তো স্বয়ংবর সভায় গালবও আসতে পারে। এসব ভেবে মাধবী মত দিলেন।

যথাসময়ে মাধবীর স্বয়ংবর সভা অনুষ্ঠিত হল। সমস্ত শ্রেণীর লোককে সে সভায় আমন্ত্রণ জানানো হল। যথাসময়ে যদু ও পুরু মাধবীকে নিয়ে সেই স্বয়ংবর সভায় হাজির হলেন। পুষ্প মাল্য হাতে মাধবী সভার চারিদিক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু যাকে তিনি বরমাল্য দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন তঁাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে তিনি অরণ্যের গলায় বরমাল্য অর্পণ করে সভাসদদের উদ্দেশ্যে বললেন—সভাসদগণ, আপনারা আমার ভ্রাতাদের

আমন্ত্রণে এই অরণ্যে আমার বরমাল্য পাবার আশা নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ইহজগতের কোন পুরুষকে আমার যোগ্য বলে মনে করি না। তাই আমি এই সমগ্র অরণ্যকে বরমাল্য অর্পণ করে এখানে থাকাই ঠিক করলাম। আমাকে সকলে আশীর্বাদ করুন, আমার উদ্দেশ্য যেন সফল হয়।

তখন কেউ কেউ মাধবীকে আশীর্বাদ করলেন, কেউ তাকে পাগল আখ্যা দিলেন, কেউ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে গালাগাল দিলেন।

সভাসদগণ প্রস্থান করলে মাধবী গভীর বনে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে তার পিতা যযাতি বললেন—মাধবী, কেন অরণ্যে প্রবেশ করছো? তুমি তো আমার সংগে পূর্বের মতই কাটাতে পার।

—বাবা, সতী নারীর পতি গৃহে বাস করে তার সেবা করাই তো ধর্ম। আমি এই সমগ্র অরণ্যকে পতিরূপে বরণ করেছি। অতএব আমার কোন ভয় নেই। আমি আমার প্রকৃত পতির সন্ধান একদিন পাবই।

এরপর যযাতি স্বর্গ লাভ করে স্বর্গচ্যুত হন এবং মাধবীর গর্ভজাত পুত্র বসুমনা, শিবি ও প্রতর্দন এবং গালবের পুণ্য ফলের অংশ গ্রহণ করে আবার স্বর্গে যান। এবং গালব মাধবীকে গ্রহণ করেন। মাধবীর কৃচ্ছ্রসাধন, তপস্যা ও ত্যাগের জয় হয়।

———

তপন তনয়া তপতী

কুরুকুলের মহাবল পরক্রান্ত ঋক রাজের পুত্র সম্বরণ একদিন মৃগয়ায় গিয়ে সঙ্গী সাথী হারিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিনি তাঁর প্রিয়তম অশ্বটিকেও হারিয়ে ফেলেন। পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হয়ে যখন তিনি বিশ্রাম করছিলেন, তখন এক অসামান্যা রূপলাবণ্যযুক্তা কন্যাকে দেখে বিস্ময়ান্বিত হলেন।

তার কাছে এগিয়ে এসে শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে? দেবকন্যা? দৈত্যবালা? আপনি কি কারও বাগদত্তা? পরগৃহীতা?

সম্বরণের এরূপ অসংখ্য প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ সেই সুন্দরী অন্তর্হিত হলেন।

রাজা সম্বরণ কিন্তু ফিরে এলেন না। ঐ কমনীয় কামিনীর সন্ধানে তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরে বেড়ালেন সেই কাননে। ক্ষুধায় কাতর হয়েও খাদ্য গ্রহণ করলেন না। প্রতিজ্ঞা করলেন যদি ঐ সুন্দরী স্বেচ্ছায় আত্মপ্রকাশ না করেন, তবে তিনি আত্মাহুতি দেবেন। তিন দিনের দিন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর রাজা সম্বরণ মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। যার জন্য রাজার এই কৃচ্ছ্রসাধন তিনি কাছেই ছিলেন। আত্মপ্রকাশ করে সুমিষ্ট স্বরে বললেন--আমি জানি না আপনি কে? তবে পোষাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হয়, আপনি কোন রাজ্যের রাজা।

—আপনার অনুমান অভ্রান্ত। আমি কুরুবংশের রাজা সম্বরণ।

—তা রাজকার্য ছেড়ে এই বনের তৃণশয্যায় কেন?

—আমি মৃগয়ায় এসে আমার প্রিয় অশ্ব ও সঙ্গীদের হারিয়ে

তাদের খোঁজে এই বনে প্রবেশ করি। বনের মাঝে আপনাকে দেখে মুগ্ধ হই। কে আপনি বনদেবী ?

ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনবালার কণ্ঠে। সুমিষ্ট স্বরে তিনি বললেন—আমি কিন্তু বনদেবী নই।

—তবে কে আপনি ?

—আমি তপন তনয়া তপতী।

—তা আপনি দেবলোক ছেড়ে—এই মর্ত্যধামেই বা কেন এলেন এবং এসে আমাকে দেখা দিয়ে অন্তর্ধানই বা হলেন কেন ?

—মহারাজ ! আমি দেবকন্যা হলেও নির্দয়া নই। আপনার মনোভাব আমি বুঝতে পারি কিন্তু ......

—কোন কিন্তু নয়, তুমি যখন আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ তখন তা পুরণে যত্নবান হলে আমার জীবন রক্ষা পায়।

--মহারাজ ! আপনি প্রজাপালক, ন্যায়পরায়ণ। সমাজের শুভাশুভ হিতাহিত আমাব চেয়ে আপনারই জানার কথা বেশী। অতএব একজন অনুঢ়া কন্যার এবিষয়ে কি করা উচিত সে বিষয়ে আপনি আমার চেয়ে বেশী বোঝেন। এবিষয়ে আপনিই আমায় বুদ্ধি দিন।

—তপতী, আমি রাজ্য ধন চাই না, চাই শুধু তোমায়। এখন আমাব প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর। তুমি আমাকে যে সামাজিক রীতির কথা বললে, সেই সামাজিক রীতিতে গন্ধর্ব বিবাহকেই শ্রেষ্ঠ বিবাহ বলে ধরা হয়। তুমি আমাকে সেই গন্ধর্বমতে বিবাহ কব।

---ছিঃ, এমন কথা আমি ভাবতেও পারি না।

—কিন্তু তোমার ক্ষণিক বিরহও যে আমি সইতে পারি না।

—মহারাজ ! আমি পিতৃমতী ও অবিবাহিতা। স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে পিতার বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানতে পারব না। তোমাদের মর্ত্তবাসীদের সামাজিক রীতির সংগে আমার কোন পরিচয় নেই। কিন্তু আমাদের দেবলোকে স্ত্রী জাতির স্বতন্ত্রতা নেই। তাই পিতার

অনুমতি ছাড়া আমি তোমার কোন কাজে সম্মতিজ্ঞাপন করতে পারিনা।

—কিন্তু তিনি যদি সম্মতি না দেন ?

—দেখ, দেবলোকের দেবতারা মানবের পূজা পেতে অভ্যস্থ। তাঁদের সন্তুষ্ট করতে হলে প্রতিদিন তাঁদের পুজো ও অর্চনা করা প্রয়োজন। আমি তোমার জন্য আজীবন কুমারী অবস্থায় কালাতিপাত করতে পারি, কিন্তু পিতার মর্যাদাহানি করে স্বেচ্ছাচারিণী হতে পারি না। তুমি আমাব পিতা সূর্যদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করে তার কাছে বর হিসাবে আমায় প্রার্থনা কর। তিনি যদি আমাকে তোমার করে অর্পণ করতে চান, তবে আমি আজীবন তোমার বশবর্তিনী হয়ে থাকব।

–বেশ, আমি তোমার কথানুযায়ী কাজ করব। কিন্তু দিনান্তে একবার তোমার দেখা পাব তো ?

—না। সেটাও অনুচিত। তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বলেছ, আমিও তাতে সম্মতিজ্ঞাপন করেছি। তাই ন্যায়তঃ আমি তোমার বাগদত্তা। তাই বিবাহের পূর্বে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া অনুচিত।

এই কথা বলে তপন তনয়া তপতী অন্তর্হিতা হলেন। সম্বরণের তপস্যা সুরু হল।

এদিকে তপতীর মনেও শান্তি নেই। প্রথম প্রথম সম্বরণের কৃচ্ছ্রসাধন তার মনে গর্বের ভাব জাগিয়ে তুললেও কয়েকদিন বাদে তা ব্যথায় রূপান্তরিত হল। কেটে গেল বারো দিন। সম্বরণকে দেখে অশ্রু বশে রাখতে পারলেন না তপতী। তাই বলে তাঁর পিতার অবাধ্য হয়ে তাঁর বক্ষলগ্ন হয়ে এও বলতে পারলেন না যে, প্রিয়তম, চল, আমরা গন্ধর্ব মতে বিয়ে করি।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি হাজির হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীর কাছে।

আলু-থালু কেশ, রক্তবর্ণা চোখ ও শুষ্ক ম্লান মুখ দেখে অরুন্ধতী

তাঁকে কাছে ডাকলেন। মেয়ে যেমন কোন সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে না পেয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদে, তেমনি করে অরুন্ধতীর কোলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তপতী।

বিদুষী অরুন্ধতী তপতীকে প্রাণ খুলে কাঁদতে দিলেন। কান্নার বেগ প্রশমিত হলে জিজ্ঞেস করলেন—বল মা, কি হয়েছে? আমার কাছে কোন কিছু না লুকিয়ে সব খুলে বল।

—আপনাকে সব বলব বলেই এসেছি। কুরুরাজ সম্বরণ আমার প্রতি আসক্ত।

—কি করে সে তোমায় দেখল ও জানল?

অরুন্ধতীর এ প্রশ্নে নেত্র নত হল তপতীর। কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল দুজনের মাঝে। তারপর সমুদয় বৃত্তান্ত অকপটে বর্ণনা করলেন তপতী।

সব শুনে অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করলেন—তা এখন তুমি এবিষয়ে কি করতে চাও?

—সম্বরণকে বাঁচাতে চাই—চাই নিজে বাঁচতে। যদি তিনি বাবাকে সন্তুষ্ট করতে না পারেন এবং আমার জন্য তাঁর প্রাণ যায় তবে আমিও অগ্নিতে আত্মাহুতি দেব।

—আচ্ছা যদি সম্বরণের মোহ ভঙ্গ করে, তাঁকে তাঁর রাজ্যে প্রেরণ করা হয়, এবং তোমার চেয়েও সুন্দরী কন্যার সংগে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়?

একথা শুনে তপতীর কণ্ঠে কোন শব্দ যোগাল না। দুগণ্ড বেয়ে অশ্রু বইতে লাগল।

মাতৃহৃদয় কন্যার মনের ভাষা পড়তে পারল। বুঝলেন সম্বরণের চেয়ে শতগুণ ভালোবাসার আগ্নেয় লাভা বয়ে চলেছে তপতীর হৃদয়ে। সম্বরণের মোহ কাটলেও এ মোহ কাটবে না। তাই তিনি তাকে বললেন—বাড়ী ফিরে যাও মা। তোমার কোন চিন্তা নেই।

অরুন্ধতীকে প্রণাম করে পরম নিশ্চিন্তে গৃহে ফিরে গেলেন তপতী।

অতঃপর অরুন্ধতী তাঁর স্বামী বশিষ্ঠকে সম্বরণ ও তপতীর বিষয়ে সব জ্ঞাত করিয়ে, তাঁকে দিবাকরের কাছে প্রেরণ করলেন।

দেব দিবাকর বশিষ্ঠের পরিচয় জেনে তাঁকে বসতে দিয়ে তাঁর যথোচিত সম্মান জানিয়ে তাঁর এখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠের মুখে সব শুনে তাঁকে অভিনন্দিত করে দিবাকর বললেন—বিপ্রর্ষি, আমি জানি আপনি যেমন মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমার কন্যা যেমন স্ত্রীলোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তেমনি মহারাজ সম্বরণও রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এরূপ যোগ্য পাত্রের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি আমার প্রাণাধিকা কন্যাকে আজ এই মুহূর্তে আপনার হাতে সমর্পণ করলাম। আপনি পৌরহিত্য করে বিবাহের রীতি অনুযায়ী এদের বিবাহ দিন।

অতঃপর সেই দেব ও গন্ধর্বসেবিত গিরিশৃঙ্গে আবৃত কাননে বশিষ্ঠের পৌরহিত্যে বিধিপূর্বক তপতীর পাণি গ্রহণ করলেন সম্বরণ।

রাজমন্ত্রী এখবর শুনে সম্বরণকে রাজধানীতে ফিরিয়ে নেবার জন্য রথ নিয়ে এলে সম্বরণ বললেন—মহামন্ত্রী, দীর্ঘদিন এই গিরি কাননে বাস করে মনটা আমার এখানে আবদ্ধ হয়েছে। কিছুদিন রাজ্যের কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে আমি স্ত্রীর সংগে এখানে বাস করতে চাই। এতেই আমার মনে শান্তি আসবে।

এরপর বারোটি বছর তপতী ও সম্বরণ ঐ গিরি অরন্যে কাটালেন। দিন-মাস-বছরের হিসাব তারা রাখেননি। তাঁরা হিসবে রেখেছেন জীবনের। জীবিকার নয়।

এদিকে সম্বরণ শাসিত রাজ্যে পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি হওয়ায় খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিল। মহামারী, অনাহার অনটনের কবলে পড়ে বহুলোক মরল. কেউ-কেউ এ রাজ্যে সে রাজ্যে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াল, আবার যাদের যাবার কোন জায়গা নেই তারা কংকালের মত দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ক্রমে এখবর অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের কানে পৌঁছালে বশিষ্ঠ বললেন

—অরুন্ধতী, তুমি তপতীর কাছে যাও এবং যাতে সম্বরণ রাজ্যে ফিরে যায় তার জন্য তাকে সচেষ্ট হতে বল।

বশিষ্ঠের কথায় অরুন্ধতী দেব ও গন্ধর্বের বিহার ভূমি, যেখানে বর্তমানে তপতী সম্বরণকে নিয়ে বাস করছেন, সেখানে গিয়ে হাজির হলেন।

অরুন্ধতীকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তপতী। তারপর তাঁর এখানে আসবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

গম্ভীর স্বরে অরুন্ধতী বললেন—তপতী, পত্নীর ধর্ম শুধু পতির সঙ্গ কামনা নয়, তাকে তার কর্তব্যে অনুপ্রাণিত করাও সতী নারীর অন্যতম কর্তব্য?

—আমি তা জানি মা। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করাকে আমি গর্হিত কর্ম বলে মনে করি।

—তপতী, তুমি এখন শুধু সম্বরণের পত্নী নও, তুমি তার সহধর্মিণী এবং এই রাজ্যের রাণী। রাজার প্রয়োজন রাজ্য প্রতিপালন। লক্ষ লক্ষ লোকের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে তাঁদের প্রতিপালনের দায়িত্ব ভার যার পরে অর্পিত, সে আজ শুধু তোমার জন্য সমগ্র সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যার পরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে সে আজ মাত্র একজনের সুখ-দুঃখ দেখবে এ অন্যায়। তুমিও অন্যায়ভাবে তাকে আটকে রেখেছো। তোমার এই অনন্ত সুখ লক্ষ-লক্ষ জনসাধারণের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া।

—এ আপনি কি বলছেন মা? আমি তো কখনও ভাবতেও পারি না, আমি কারও দুঃখের কারণ হব। আমার জন্য কারও ক্ষতি হবে! বিস্ময় ঝরে পড়ে তপতীর কণ্ঠে।

—কিন্তু তাই হয়েছে। সম্বরণের অভাবে অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি, অনাচার কদাচারে রাজ্যে হাহাকার উঠেছে। এ সময় কে তাদের আশার বাণী শোনাবে—কে দেবে সান্ত্বনা? এ সময় রাজা সম্বরণ মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তোমার প্রেমে। অতএব রাজ্যের কল্যাণে ওর মোহ ভাঙতে কিছুদিনের জন্য তোমাকে ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে।

—কিন্তু আমরা উভয়ে এক সঙ্গে থেকেও তো প্রজার মঙ্গল করতে পারি ?

—তাতে প্রজার মঙ্গল হবে না, হবে তোমার মঙ্গল। রাজা যে তোমাকে ছাড়া কিছু জানে না।

—কিন্তু আমি রাজাকে এমন আঘাত দিতে পারব না।

—তোমাকে যে পারতেই হবে মা। কিছুদিন তুমি পিত্রালয়ে অবস্থান কর। সম্বরণের সুমতি ফিরলেই আবার ফিরে এস।

তপতী অবনত মস্তকে অরুন্ধতীর কথার মর্যাদা রাখলেন।

সম্বরণ গৃহে ফিরে তপতীকে দেখতে না পেয়ে কাতর হলেন। কিন্তু অরুন্ধতীর মুখে সব শুনে এবং রাজ্যের প্রজারা চরম দুর্দশার মাঝে দিনাতিপাত করছে জেনে রাজ্যে ফিরে গেলেন।

সম্বরণ রাজ্য ভার গ্রহণ করার সংগে সংগে রাজ্যে আবার বৃষ্টি শুরু হল এবং তপতী আবার ফিরে এল।

———

স্নেহাতুরা জনা

—দেখ, দেখ কি সুন্দর ঘোড়া! ওর সারা অঙ্গ মণিমুক্তায় মোড়া। তুমি আমায় ধরে দিতে পার না? —নীলধ্বজ রাজার পুত্রবধূ মদনমঞ্জরী তার স্বামী প্রবীরকে প্রলুব্ধ করলেন।

—এ আর এমন কথা কি সুন্দরী! তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন ও ঘোড়া তোমার। —এই কথা বলে প্রবীর ঘোড়াটি তার প্রিয়তমা পত্নীকে উপহার দেবার ইচ্ছে নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

দেখলেন সজ্জিত অশ্বের কপালে লেখা আছে—এ অশ্ব রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব। যদি কোন নৃপতি এ অশ্ব ধরবার স্পর্ধা প্রকাশ করে, অর্জুন তাদের সমুচিত শিক্ষাদানে অশ্ব হস্তিনাতে ফিরিয়ে আনবেন।

এ লিখন দেখে প্রবীরের অন্তরে গর্বের বান বয়ে গেল। তিনি অর্জুনের সংগে যুদ্ধের শিহরণ অনুভব করলেন। গর্বভরে অশ্ব ধরে মদনমঞ্জরীর কাছে এনে বললেন—যাও, একে নিয়ে এখুনি অন্তঃপুরে যাও।

এমন এক দুর্লভ বস্তু পেয়ে পুরনারীগণ সহ মদনমঞ্জরী অন্তঃপুরে ফিরে গেলেন।

এদিকে যজ্ঞাশ্ব দেখতে না পেয়ে অর্জুন সৈন্যসহ প্রবীরের সম্মুখীন হলেন। জিজ্ঞেস করলেন প্রবীরের পরিচয়। আর কেন সে এই অশ্ব ধরেছে তাও জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুনের কথা শুনে প্রবীর বললেন—অর্জুন, আমি নীলধ্বজ রাজার পুত্র প্রবীর। বিনাযুদ্ধে তোমার অশ্ব তোমাকে দেব না।

একথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে অর্জুন বললেন—বালক, তোমার

সংগে যুদ্ধ করছি শুনলে যে লোকে হাসবে। তোমার সংগে আমার সেনাপতি যুদ্ধ করবে।

একথা শুনে প্রবীর অগ্নিবান নিক্ষেপ করলেন এবং এক বানে পাণ্ডবের সমস্ত সৈন্য অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করল।

অর্জুন তখন অগ্নির স্তব করে তাঁকে তুষ্ট করলেন এবং বরুণ বানে অগ্নিকে নিবারিত করে অর্ধচন্দ্র বানে প্রবীরের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন।

শেষ পর্যন্ত নীলধবজ রাজাও অর্জুনের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর যজ্ঞাশ্ব তাঁকে ফিরিয়ে দিতে গেলে পথ আগলে দাঁড়ালেন পুত্রহারা জননী জনা! —মহারাজ! পুত্রহন্তার সংগে মিত্রতা করা আর আত্মহত্যা করার মধ্যে আমি কোন প্রভেদ দেখি না। তুমি ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ তোমার ধর্ম। তুমি সেই ক্ষাত্রধর্ম পালন না করে যে তোমার চিরশত্রু, পুত্রঘাতক, তার সংগে মিত্রতা করতে যাচ্ছ?

—জনা, অর্জুনকে সংগ্রামে পরাজিত করার শক্তি ভারতের কোন রাজার নেই। অতএব মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করা আর অর্জুনের সংগে যুদ্ধ করা একই।

—ধিক তোমাকে। যে ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে যুদ্ধ করতে ভয় পায়, যে পিতা হয়ে পুত্রঘাতকের সংগে প্রাণ ভয়ে মিত্রতা করে, তার ঘরণী হয়ে, তার আলয়ে থেকে জননী নামে কলংক লেপন করতে পারব না। —একথা বলে পুত্রশোকাতুরা জননী জনা অর্জুনের বিনাশ করে যোগ্য বীরের সন্ধানে ভ্রাতা উলুকের কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

শোকাতুরা দিদিকে ভূলণ্ঠিতা দেখে ভ্রাতা উলুক ব্যাকুলচিত্তে দিদিকে ভূমি থেকে তুলে অশ্রু মুছিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে দিদি? তোকে কে কি বলেছে?

—ভাই, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমার ভাগিনেয় প্রবীর অর্জুনের সংগে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আর তার পিতা নিহত পুত্রের জন্য শোক না করে সেই অর্জুনের বশ্যতা স্বীকার করে ক্ষত্রিয় নামে

কলংক লেপন করেছে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, অর্জুনের মৃত্যু না হলে প্রাণত্যাগ করব। নারীর যুদ্ধ করা সমাজে স্বীকৃত নয় এবং কলংকজনক, তা না হলে আমি নিজে তার সংগে যুদ্ধ করে হয় তাকে মারতাম-নয় আর নিজে মরতাম। আমি ভাই তোমার কাছে সাহায্যের জন্য এসেছি। যদি দিদির মৃত্যু না চাও, তাকে সুস্থ দেখতে চাও, তবে অর্জুন নিধনে আমায় সাহায্য কর।

একথা শুনে উলুক স্তব্ধ হয়ে গেল। বেশ রাগতস্বরে বলল—দিদি, একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকারী। তুমি কি জান না অর্জুন নর-নারায়ণ। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যার সহায়, এই বিশ্বে কার এমন শক্তি আছে তাকে পরাজিত করে? অতএব নিজের মঙ্গল যদি চাও,তবে, পতির কাছে ফিরে যাও।

ভাইয়ের মুখে একথা শুনে নিরুপায় জনা গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প নিয়ে গঙ্গাবক্ষে দাঁড়িয়ে আত্মবিসর্জন দেওয়ার পূর্বে গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—মা গঙ্গে, আজ পুত্রশোকাতুরা জনা জননী হৃদয়ের কোন মূল্য না পেয়ে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হল। মা, মর্তের মানব তো অর্জুনের বিরুদ্ধে লড়তে অক্ষম, কিন্তু তুমি এর বিচার কর। —এই কথা বলে জনা পুত্রের শোকে কাতর হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

জনার মৃত্যুতে গঙ্গাদেবী অতিশয় ক্রুদ্ধা হয়ে অর্জুনের উদ্দেশে বললেন—অর্জুন, কৃষ্ণসখা হয়ে তোমার গর্ব সীমা লঙ্ঘন করেছে। তুমি কপট যুদ্ধে পিতামহকে বধ করেও ক্ষান্ত হও নি। আজ তোমার জন্য সতী জনার অকাল মৃত্যুহল। আজ যেমন পুত্রশোকে সতী জনাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল, তেমনি তোমাকেও তোমার পুত্রের হাতে প্রাণ দিতে হবে।

বীরাঙ্গনা চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন এক ক্ষত্রিয়ের গোধন উদ্ধারের জন্য নিয়ম ভঙ্গের অপরাধে স্বেচ্ছায় বনবাসী হয়েছিলেন। নিয়মটি ছিল তাদের ভার্য্যা দ্রৌপদীর বিলাস কক্ষে পঞ্চ ভাইয়ের যে কোন একজন যখন থাকবেন, তখন অন্য ভাই সেখানে গেলে তাকে বনে গিয়ে বনবাসীর জীবন যাপন করতে হবে।

বনবাসে গিয়ে বনবাসীর জীবন যাপনের সময় তাঁর সংগে পুরুষ বেশী মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার দেখা হয় এবং তার পাণি গ্রহণ করে সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি চলে আসেন।

এরপর কেটে গেছে বহু বছর।

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বাধা পেলেন মণিপুরে। তার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভসম্ভূত সন্তান রাজা বভ্রুবাহন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধরে গৃহে নিয়ে গেলে তার মাতা চিত্রাঙ্গদা সে অশ্ব ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিলে বভ্রুবাহন বললেন—মা, আমার পিতা বীর ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় সন্তান বিনা যুদ্ধে কখনও অশ্ব ফেরৎ দেয় না। আমি যদি তা করি, পিতা আমাকে কাপুরুষ ভেবে ধিক্কার দেবেন। তার চেয়ে আমি যুদ্ধ করে—আমার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে তার উপযুক্ত পুত্রের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখব।

—না বাবা, তা হয় না। পিতা পুত্রের যুদ্ধ কি করে সম্ভব? লোকে কি বলবে। তিনি তোর জন্মদাতা পিতা। যা ভাববার ভাবুক। তুই তাকে প্রণাম করে আমার পরিচয় দিয়ে অশ্ব ফেরৎ দিবি। দেখবি তিনি তোকে পুত্রের মর্যাদা দেবেন।

অতঃপর মায়ের কথায় বভ্রুবাহন যজ্ঞাশ্ব ও নানান উপঢৌকন নিয়ে অর্জুনকে তোষণ করতে গেলেন।

গলেবস্ত্র দিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে অর্জুনকে প্রণাম করে বভ্রুবাহন বললেন—মহারাজ আমি আপনার অধম সন্তান বভ্রুবাহন। না জেনে যজ্ঞাশ্ব ধরে তা ফিরিয়ে দিতে এসেছি। আপনার পুত্রের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।

—তুমি কার তনয়? আমার? আমার তো মনে পড়ে না আমি এর আগে কখনও এ রাজ্যে এসেছি।

—মনে করে দেখুন, আপনি যখন প্রায়শ্চিত্ত করতে তীর্থ পর্যটন করছিলেন, তখন এই রাজ্যে আমার মাতা চিত্রাঙ্গদার পাণি গ্রহণ করে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। আমি সেই চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন।

—কে তোর পিতা, কাকে তুই পিতা বলছিস? তোর মা গন্ধর্ব কন্যা নটী চিত্রাঙ্গদার নাম শুনেছি বটে—কিন্তু তার সংগে আমার পরিণয় অসম্ভব। তুই কার পুত্র? অশ্ব ধরে যুদ্ধভয়ে তা ফেরৎ দিতে এসেছিস দে। কিন্তু নিজেকে আমার পুত্র বলিস কোন স্পর্ধায়! দূর হয়ে যা নটীর পুত্র। —এই কথা বলে পদাঘাতে দূরে সরিয়ে দিলেন বভ্রুবাহনকে।

হংসধবজ ও নীলধবজ রাজা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা অর্জুনের এ আচরণের নিন্দা করে বললেন—ধনঞ্জয়! বভ্রুবাহন রাজা। তাকে এভাবে পদাঘাত করা তোমার অনুচিত। তা ছাড়া যে নিজে এসে বলছে সে তোমার তনয়—তখন তো সংশয় থাকে না।

—দেখুন, আমার পুত্র যদি হোত, তবে ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে ও যে অশ্ব ধরেছে তা বিনাযুদ্ধে ফিরিয়ে দিতে আসত না।

পিতার কাছে পরিচয় দিতে গিয়ে পুরস্কার স্বরূপ পদাঘাত পেয়ে চিত্রাঙ্গদাকে সব কথা জ্ঞাত করালে চিত্রাঙ্গদা বললেন—বাবা বভ্রু, যুদ্ধে কাজ নেই। তুই বাবা যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দিয়ে ওর বশ্যতা স্বীকার করে নে। তুই কি জানিস না তাঁর প্রতাপের কথা? বিশ্বে

আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়নি। আর তা ছাড়া তার সখা যে স্বয়ং নারায়ণ।

—মা, তুমি যার মা, তার জীবনে পরাজয় নেই। মাগো, যখন সভা মাঝে অর্জুনকে পিতা বলে সম্বোধন করে তার পা ধরেছিলাম তখন সভামাঝে তিনি আমাকে পদাঘাত করলেন, তখন আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয়নি। কিন্তু মাতা নটী চিত্রাঙ্গদা, এ শব্দ আমার কর্ণে বিষ ঢেলে দিয়েছে। সতী চিত্রাঙ্গদার সম্মান রাখতে তাঁর পুত্র অস্ত্রের জবাব অস্ত্রে দিয়ে মাতা ও পিতার মান রাখবে।

পিতা পুত্রের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং তাঁর ও তাঁর পুত্রের অস্তিত্ব রাখতে এর প্রয়োজন, এটা ভেবে চিত্রাঙ্গদা তাঁর পুত্রকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

এরপর কর্ণপুত্র বৃষকেতু, শাল্ব রাজ বভ্রুবাহনের বানে অচৈতন্য হয়ে পড়লে স্বয়ং অর্জুন এলেন এবং পিতা পুত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হল। অবশেষে বভ্রুবাহন গঙ্গাঅস্ত্র নিক্ষেপ করলেন এবং গঙ্গাবানে অর্জুনের মস্তক কেটে ভূতলে পতিত হল। চূর্ণ হল অর্জুনের গর্ব। সার্থক হল সতী জনার দেহ ত্যাগ সফল হল গঙ্গার অভিশাপ।

এরপর পাতালে অনন্ত নাগের কাছে রক্ষিত মণি এনে বভ্রুবাহন তার পিতাকে বাঁচালে পিতা সর্ব সমক্ষে তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন।

নাগকন্যা উলুপী

প্রতিশ্রুত ধর্মপালনার্থে স্বেচ্ছায় বনবাস নিয়ে অর্জুন যখন বনে বনে ঘুরছিলেন এবং দৈব দুর্বিপাকে চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেছিলেন সেই সময় একদিন গঙ্গায় অবতীর্ণ হয়ে অর্জুন পিতৃ তর্পণ সেরে যখন উঠছিলেন, তখন নাগরাজ দুহিতা উলুপী তাঁকে জলের মধ্যে আকর্ষণ করলেন। হঠাৎ তিনি জলের তলায় তলিয়ে গেলেন এবং নাগরাজ ভবনে উপস্থিত হয়ে সামনে পরমা সুন্দরী এক কন্যাকে দেখে বুঝতে পারলেন এই মনোরমা মনোলোভা কন্যাই কৌশলে তাকে এখানে এনেছে। তিনি বিস্মাবিভূত হয়ে ঐ রূপসীকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? কোন সাহসে তুমি আমাকে এখানে আনলে? এ রাজ্যের নামই বা কি?

—মহারাজ! ঐরাবত কুলে কৌরব্য নামে এক নাগ আছেন। আমি তার কন্যা উলুপী।

—তা তুমি কি কারণে আমাকে এখানে আনলে?

—আমি আপনাকে দেখা মাত্রই আপনাতে আসক্তা হয়েছি। আপনার সঙ্গ কামনায় কাতর হয়ে এই দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হয়েছি।

—সুন্দরি! আমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করে তীর্থে ভ্রমণ করছি। যদিও তোমার মত সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, তথাপি আমি যে জন্যে বনবাসী হয়েছি তাকে লঙ্ঘন করতে পারি না।

—ধনঞ্জয়! আপনি যে জন্য বনবাসী হয়েছেন তা আমি জানি। দেখুন, শাস্ত্রে এরূপ কথিত আছে যে আর্তব্যক্তিকে

পরিত্রাণ করলে কোনরূপ অধর্ম হয় না। আপনি যদি আমাকে পরিত্রাণ না করেন, আমার পানিগ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, তবে আমি এখনি প্রাণ ত্যাগ করব। একজন মৃত্যুপথ যাত্রিণীকে রক্ষা করার চেয়ে মহৎ ধর্ম আর কি হতে পারে?

উলুপী এরূপ বার বার অনুরোধ করতে থাকলে অর্জুনের পক্ষে সে অনুরোধ উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। ফলে তিনি তার পাণি গ্রহণে বাধ্য হলেন।

সে রাতে উলুপীর মনোরথ পূরণার্থে সেখানে বাস করে পরদিন আবার তিনি উলুপীর সংগে গঙ্গার তীরে উপস্থিত হয়ে বিদায় চাইলে পতিব্রতা উলুপী সাশ্রুনয়নে অর্জুনকে প্রণাম করে বললেন—মহারাজ! তুমি আজ থেকে সমস্ত জলচরকে জয় করতে পারবে। আর তোমার কার্যসিদ্ধির পর অবশ্যই একবার আমায় দেখা দেবে।

পতিব্রতা সতী উলুপী সারা জীবন সেই এক রাতের স্মৃতিকে নিয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন। কিন্তু অর্জুন তার প্রতিশ্রুতি রাখতে সেখানে আসেননি '

বীর প্রসবিনী পুলোমা ঃ—পুলোমা রাক্ষস তার পূর্ব প্রণয়ীঋষিকন্যা পুলোমাকে অন্তঃসত্তা অবস্থায় যখন হরণ করেছিলেন, তখন তিনি ভৃগুর পত্নী রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। যখন পুলোমা রাক্ষস ভৃগুপত্নীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর গর্ভস্থিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে পুলোমা রাক্ষসের দিকে তাকাতেই সে ভস্ম হয়ে যায়। ইনিই মহর্ষি চ্যবন নামে বিখ্যাত হন।

অপ্সরা কন্যা প্রমদ্বারা ঃ—গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু গোপনে স্বর্গের অপ্সরা মেনকাতে উপরত হন—তার ফলে জন্ম হয় প্রমদ্বারার। মহর্ষি স্থূলকেশের আশ্রমের এক নির্জন প্রান্তে তিনি গর্ভমোচন করে স্বর্গে যান। স্থূলকেশ সেই কন্যাকে নিজ কন্যার স্নেহে মানুষ করেন। পরিশেষে চ্যবনের দৌহিত্র রুরুর সঙ্গে তার পরিণয় হয়। পিতৃগৃহে সর্পাঘাতে প্রমদ্বারার মৃত্যু হয়। সাবিত্রী যেমন যমের কাছ থেকে সত্যবানকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, রুরুও তেমনি তার পরমায়ুর অর্ধেক দান করে তাঁর পত্নীকে বাঁচিয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

কাশ্যপ জায়া বিনতা কদ্রু :—কাশ্যপ মুনির পত্নী বিনতাকে একদিন কদ্রু জিজ্ঞেস করেন, উচ্চৈশ্রবা অশ্বের রং কিরূপ ? বিনতা বলেন, সাদা। কদ্রু বলেন, কালো। শেষ পর্যন্ত সর্প পুত্রদের সহায়তায় সাদা ঘোড়াকে কালো করে কদ্রু পণে জেতেন। তাদের পণ ছিল, যে জিতবে সে অপরের দাসত্ব করবে। এরপর বিনতার পুত্র গরুড় স্বর্গ থেকে অমৃত এনে মাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন।

বাসুদেব ভগ্নি সুভদ্রা :—স্বেচ্ছায় বনবাস গ্রহণ করে অর্জুন যখন ঘুরছিলেন, তখন তার সঙ্গে দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুত্ব হয় এবং তার ভগ্নি সুভদ্রাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং হরণ করে এনে বিবাহ করেন। সুভদ্রার দ্বারাই কুরুবংশ রক্ষা পায়। সুভদ্রার পুত্র বীর অভিমন্যু। তার পুত্র পরিক্ষীৎ. তার পুত্র জন্মেজয়।

সেবাপরায়ণা পদ্মাবতী :—কর্ণ দানবীর ছিলেন, কর্মবীর ছিলেন একথা তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তাঁর এই কৃতিত্বের নেপথ্যে যার ভূমিকা ছিল মুখ্য, তিনি হলেন পদ্মাবতী। তিনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চাহিদা পুরণার্থে নিজ পুত্র বৃষকেতুর মাংস নিজ হস্তে রন্ধন করেছিলেন। ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন স্বয়ং বিষ্ণু। তিনি তার সেবায় মুগ্ধ হয়ে ঐ পুত্রকে আবার ফিরিয়ে দেন।

বিঃ দ্রঃ—মহাভারতের অসংখ্য চরিত্রের মধ্য থেকে যে কটি চরিত্র বেছে নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে শেষের পাঁচটি চরিত্র অতি সংক্ষেপে দিতে হল। এর জন্ম আমরা গভীর ভাবে দুঃখিত। কারণ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করলে মূল্যও বৃদ্ধি করতে হয়। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ মার্জনা করে আমাদের সঙ্গে মার্জনা করে সহযোগিতা করবেন।
